গীতা-প্রবচন

বিনোবা

সুপ্রকাশন

গীতা-প্রবচন

বিনোবা

অনুবাদক
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

সুপ্রকাশন

প্রকাশক ঃ
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ,
সুপ্রকাশন, ৩, সার্কাস রেঞ্জ,
কলিকাতা—১৯

মুদ্রণ—অক্টোবর, ১৯৫৪—৩,৩০০
মূল্য—এক টাকা

বাঁধাই ঃ
ইউনিভার্সাল বুক বাইণ্ডার্স
১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা—১৪

মুদ্রক ঃ
শ্রীসুখলাল চট্টোপাধ্যায়
লোক-সেবক প্রেস
৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা—১৪

প্রস্তাবনা

গীতা-প্রবচনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে আমি নিরতিশয় আনন্দিত। বাল্যকালে বাংলার প্রতি আমার অসাধারণ আকর্ষণ ছিল। রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ ইঁহারা ছিলেন আমার পঞ্চদেবতা সদৃশ। বাংলায় একবার যাইব এই সাধও অন্তরে ছিল।

১৯১৬ সালে ঘর ছাড়ি, ব্রহ্মের খোঁজে বাহির হইয়া পড়ি। কাশী যাই। তথা হইতে হিমালয় যাইব এই ছিল মুখ্য আকাঙ্ক্ষা। বাংলা ঘুরিয়া আসার কথাও মনের অন্তস্তলে ছিল। কিন্তু দৈবগতিকে দুইটির একটিও ঘটিল না। গেলাম গান্ধীজীর কাছে। সেখানে দেখিলাম হিমালয়ের শান্তি আর বঙ্গদেশ হইতে উৎসারিত ক্রান্তির সংগম। আর মনে মনে বলিলাম দুই বাসনাই আমার পূর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মের খোঁজ তো আজও চলিতেছে।

ইতিমধ্যে বাংলার উপর বহু আপদ্ আসিয়াছে। আর আজও তার রেশ চলিতেছে। আমার বিশ্বাস বাংলার লোকমানস যদি বেদান্তের সহিত অহিংসার সমন্বয় সাধন করে তবে এই সব বিপত্তি সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইবে। গীতা-প্রবচনের অধ্যয়ন হইতে বাংলা এই পথের কিছুটা সন্ধান পাইবে, বাংলার চিন্তায় আকুল আমার মন একথাই বলিতেছে। অতএব, শেষ পর্যন্ত এক প্রকৃষ্টতররূপ বাংলার সেবায় যাইতেছি একথা ভাবিয়া সন্তোষ লাভ করিতেছি। তখনকার বাসনাবশে যদি বাংলায় যাইতাম তবে কে জানে আমার দ্বারা বাংলার সেবা হইত কি অসেবা হইত। কিন্তু আজ এইরূপে কেবল শুদ্ধ সেবাই হইবে।

অধিক আর কি লিখিব? লেখা-পড়া জানা এমন একজনও লোক যেন না থাকেন যিনি গীতা-প্রবচন পড়েন নাই, ইহাই আমার কামনা। লেখা-পড়া জানেন না এমন লোকের কানেও গীতা-প্রবচন প্রবেশ করা চাই। এখানে আমার বলিতে কিছু নাই। ভগবানের বস্তু ভগবানকে সমর্পণ করিতেছি।

বিনোবা

নিবেদন

গীতা-প্রবচন বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি। মূল মারাঠী অনুসরণ করিয়াছি। হিন্দী অনুবাদ হইতে সহায়তা পাইয়াছি। সংশোধন কামনায় অনুবাদের ত্রুটি প্রদর্শন করিলে পাঠকেরা বন্ধুর কাজ করিবেন। তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।

এখন প্রিয় কার্য করি। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় প্রুফ্ দেখিয়া দিয়াছেন। তাহাই নয়। ভাষা সংশোধন করিয়াছেন, অসঙ্গতি দূর করিয়াছেন। ত্রুটি আছে। তাঁহার সহায়তা না পাইলে আরও অধিক থাকিত। একাজ তিনি দেবপূজার নিষ্ঠায় করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের প্রশ্ন তাই এখানে নাই। আর একজনের অকুণ্ঠ সহায়তা পাইয়াছি। স্নেহাস্পদ শ্রীসত্যেন মাইতি পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি করিয়াছেন, মূলের সহিত অনুবাদ মিলাইয়া দেখিতে সহায়তা করিয়াছেন ও আনুসঙ্গিক সকল কাজে সাহায্য করিয়াছেন। তিনিও দেবপূজা জ্ঞানে একার্য করিয়াছেন।

গীতা-প্রবচনের দ্বিতীয়, নবম ও অষ্টাদশ অধ্যায় প্রবাসী-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া প্রবাসী-সম্পাদক আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অনুবাদক

অনুক্রমণিকা

গীতা-প্রবচন

প্রথম অধ্যায়

(১)

বন্ধুগণ,

আজ হইতে আমি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার আলোচনা আরম্ভ করিব। গীতা ও আমার সম্বন্ধ তর্কের অতীত। আমার দেহ মার দুধে যতটা বর্ধিত হইয়াছে, আমার হৃদয় ও বুদ্ধি গীতার দুধে তাহা অপেক্ষা অধিক পুষ্ট হইয়াছে। সম্বন্ধ যেখানে হৃদয়ের সেখানে তর্কের স্থান নাই। তর্কে না যাইয়া শ্রদ্ধা ও আচরণ এই দুই পাখায় ভর করিয়া গীতা-গগনে আমি যথা-শক্তি বিচরণ করি। অধিকাংশ সময় আমি গীতার আবহাওয়ায় থাকি। গীতা আমার প্রাণতত্ত্ব। কাহারও সহিত যখন গীতার আলোচনা করি তখন আমি গীতা-সাগরে সাঁতার কাটি, আর যখন একলা থাকি তখন অমৃতসাগরে গভীর ডুব মারিয়া বসিয়া যাই। স্থির হইয়াছে এই গীতা-মাতার কথা রবিবার রবিবার আপনাদের শুনাইব।

মহাভারতে গীতার অবতারণা করা হইয়াছে। মহাভারতের মধ্যভাগে, এক উঁচু দীপের মত অবস্থিত থাকিয়া গীতা সমস্ত মহাভারতে আলোকপাত করিতেছে। একদিকে ছয় পর্ব অপর দিকে বার পর্ব ইহার মধ্যভাগে যেমন, তেমন একদিকে সাত অক্ষৌহিণী অপর দিকে এগার অক্ষৌহিণী সেনার মধ্য-ভাগে গীতার উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের জাতীয় গ্রন্থ। উহাতে বর্ণিত ব্যক্তি আমাদের জীবনে এক-রূপ হইয়া গিয়াছে। রাম, সীতা, ধর্ম, দ্রৌপদী, ভীষ্ম, হনুমান প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রের সহিত সর্বভারতীয় জীবন হাজারো বছর হইতে যেন অভিমন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর অপর কোন মহাকাব্যের পাত্রসমূহ লোকজীবনে এমন বেমালুম মিলিয়া গিয়াছে এরূপ দেখা যায় না। এই দিক হইতে রামায়ণ ও মহাভারত

নিঃসন্দেহে অদ্ভুত গ্রন্থ। রামায়ণ যদি মধুর নীতিকাব্য হয় তবে মহাভারত হইতেছে ব্যাপক সমাজশাস্ত্র। ব্যাসদেব এক লাখ সংহিতায় অতি নিপুণ-ভাবে অসংখ্য চিত্র, চরিত্র, চারিত্রের যথাযথ চিত্রণ করিয়াছেন। এক পরমেশ্বর ব্যতীত পূর্ণ নির্দোষ কেহ নাই, তেমন কেবল দোষযুক্তও এই পৃথিবীতে কেহ নাই, একথা মহাভারতে অতি স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের দোষ যেমন দেখান হইয়াছে, আর একদিকে তেমনি কর্ণ দুর্যোধনের গুণরাজির উপরও আলোকসম্পাত করা হইয়াছে, মানবজীবন সাদা ও কালো তন্তুতে বোনা পট একথাই মহাভারত বলিতেছে। অলিপ্ত থাকিয়া ভগবান ব্যাস জগতরূপ বিরাট সংসারের আলো-অন্ধকারময় চিত্র দেখাইতেছেন। ব্যাসদেবের এই নিরতিশয় অলিপ্ত ও উদাত্ত গ্রন্থন-কৌশল হেতু মহাভারত গ্রন্থ যেন এক অতি বৃহৎ খনিতে পরিণত হইয়াছে। শোধন করিয়া যত খুশি সোনা লুণ্ঠন করা যায়।

ব্যাসদেব এত বড় মহাভারত লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের কিছু বলার ছিল কি? নিজের কোন বিশেষ-বার্তা তিনি কোথাও দিয়াছেন কি? কোথাও ব্যাসদেব সমাধিস্থ হইয়াছেন কি? মহাভারতে স্থানে স্থানে তত্ত্বজ্ঞান ও উপদেশের বনানী রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল তত্ত্বজ্ঞান, উপদেশ ও গ্রন্থের সারভূত রহস্যও কি তিনি কোথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? হাঁ, নিশ্চয়ই লিখিয়াছেন। সমগ্র মহাভারতের নবনীত মন্থন করিয়া ব্যাসদেব ভগবদ্গীতায় রাখিয়া দিয়াছেন। গীতা ব্যাসদেবের মুখ্য শিক্ষা ও তাঁহার চিন্তার সার সঞ্চয়। এই সূত্রাবলম্বনে 'মুনির মধ্যে মুনি আমি ব্যাস' এই বিভূতির (উক্তির) সার্থকতা খুঁজিতে হইবে। প্রাচীনকাল হইতে গীতা উপনিষদের মর্যাদা পাইয়া আসিয়াছে। গীতা উপনিষদেরও উপনিষদ। সকল উপনিষদ দোহন করিয়া গীতারূপী এই দুগ্ধ ভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়া পৃথিবীকে দিয়াছেন। জীবন বিকাশের পক্ষে আবশ্যক প্রায় সমস্ত ভাব গীতায় স্থান পাইয়াছে। অতএব গীতাকে সিদ্ধপুরুষেরা যে ধর্মজ্ঞানের অভিধান বলিয়াছেন তাহা ঠিকই হইয়াছে। গীতা আকারে ছোট। তবু গীতা হিন্দুধর্মের মুখ্য গ্রন্থ।

গীতা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন একথা সকলেই জানে। এই মহান শিক্ষার

শ্রোতা ভক্ত অর্জুন। এই শিক্ষায় তিনি এমনই সমরস হইলেন যে তিনিও কৃষ্ণ' সংজ্ঞা পাইলেন। ভগবান ও ভক্তের হৃদ্‌গত ব্যক্ত করিতে যাইয়া ব্যাসদেব এরূপ একরস হইলেন যে লোকে তাঁহাকেও 'কৃষ্ণ' আখ্যা দিয়াছে। বক্তা কৃষ্ণ' শ্রোতা কৃষ্ণ, রচয়িতা কৃষ্ণ—এভাবে তিনে যেন অদ্বৈতের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনজনই যেন সমাধিমগ্ন। গীতা অধ্যয়নকালে এরূপই একাগ্রতা চাই।

(২)

কেহ কেহ মনে করেন গীতার আরম্ভ দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে প্রত্যক্ষ উপদেশের আরম্ভ হইয়াছে। অতএব সেখান হইতে আরম্ভ ধরিলে ক্ষতি কি? কোন ব্যক্তি আমাকে একথাও বলিয়াছেন, "অক্ষরের মধ্যে অ-কারকে ভগবান ঈশ্বরীয় বিভূতি বলেছেন। 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'এর আরম্ভে সহজভাবেই অকার এসে গেছে। অতএব সেখান থেকেই আরম্ভ ধরতে হবে।" এ যুক্তি অগ্রাহ্য করিলেও, এখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে একথা ধরিয়া লওয়া অনেক দিক হইতে উচিত হইবে। তাহা সত্ত্বেও তৎপূর্ববর্তী প্রস্তাবনা ভাগের গুরুত্ব ত রহিয়াছেই। অর্জুন কোন্ ভূমিকায় অবস্থিত, কোন্ কথা প্রতিপাদনের জন্য গীতার প্রবৃত্তি (উদ্ভব) তাহা এই প্রাস্তাবিক কথা-ভাগ ছাড়া ভাল বুঝা যায় না।

কেহ কেহ বলেন যে, অর্জুনের ক্লৈব্য দূর করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার নিমিত্ত গীতা কথিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে গীতা কেবল কর্ম-যোগের কথাই বলে না, যুদ্ধযোগও প্রতিপাদন করে। কিন্তু একথা যে ভুল একটু বিচার করিলেই তাহা আমাদের কাছে ধরা পড়িবে। আঠার অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। একথা কি বলিতে হইবে যে সমস্ত গীতা শুনাইয়া অর্জুনকে ঐ সেনার যোগ্য করিয়া লইয়াছিলেন? বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন অর্জুন। সেনা বিভ্রান্ত হয় নাই। তাহারা কি অর্জুন অপেক্ষা অধিক যোগ্য ছিল? একথা কল্পনাতেও স্থান দেওয়া যায় না। অর্জুন যে যুদ্ধ হইতে পরাবৃত্ত হইতেছিলেন সে ভয়ের কারণে নয়। শত যুদ্ধ

তিনি করিয়াছিলেন। যুদ্ধ নয় ত খেলা, এমনি মহাবীর তিনি ছিলেন। উত্তর-গো-গ্রহণের সময় একা তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে হতবল করিয়াছিলেন। সদা বিজয়ী ও সকল মনুষ্যের মধ্যে একমাত্র খাঁটি মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বীরবৃত্তি ছিল তাঁহার প্রতি রোমকূপে। অর্জুনকে উত্তেজিত করার জন্য ক্লৈব্যের আরোপ স্বয়ং কৃষ্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই শর ব্যর্থ গেল বলিয়া, অপর বিষয় অবলম্বন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। অতএব ক্লৈব্য নিরসনরূপ সহজ তাৎপর্য যে গীতার নয়, ইহা সুনিশ্চিত।

অপর কেহ কেহ বলেন যে অর্জুনের অহিংসাবৃত্তি দূর করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য গীতা কথিত হইয়াছিল। আমার মতে একথাও ঠিক নয়। একথা বিচার-বিবেচনা করার পূর্বে অর্জুনের পট-ভূমিকা দেখিতে হইবে। ইহার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংযোগ-সূত্র হইতে খুব সহায়তা পাওয়া যাইবে।

অর্জুন রণাঙ্গনে দাঁড়াইয়াছিলেন ত কৃত-নিশ্চয় হইয়া, কর্তব্য ভাব হইতে দাঁড়াইয়াছিলেন। ক্ষাত্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাবে ছিল। যুদ্ধ এড়াইবার যথাসম্ভব প্রযত্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু এড়ান যায় নাই। সর্বনিম্ন দাবির প্রস্তাব ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির মধ্যস্থতা উভয়ই বিফল হইয়াছিল। এ অবস্থায় দেশ-বিদেশের রাজ-রাজড়াদের একত্র করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে রাজী করাইয়া তিনি রণাঙ্গনে দণ্ডায়মান এবং বীর-বৃত্তির যোগ্য উৎসাহে বলিতেছেন, "উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ সংস্থাপন করুন। যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে তাদের মূর্তি যেন আমি একবার দেখে নিতে পারি।" শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলেন, এবং অর্জুন চারিদিকে একবার তাকাইতেছেন। তিনি কি দেখিতেছেন? উভয় দিকে নিজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বিরাট সমাবেশ। তিনি দেখিতেছেন ঠাকুরদা, বাবা, ছেলে, নাতি চারি পুরুষ আত্মীয়-স্বজন মারণ-মরণের অন্তিম প্রতিজ্ঞায় সমবেত হইয়াছে। এরূপ যে হইবে সেকথা তার আগে তিনি যে অনুমান করেন নাই তাহা নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রভাব কিছুটা অন্যরূপ। ঐ সব স্বজনদের দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে এক আলোড়ন উপস্থিত হইতেছে। তিনি

একান্ত খিন্ন বোধ করিতেছেন। এ যাবৎ অনেক যুদ্ধে অসংখ্য বীরকে তিনি সংহার করিয়াছেন। তখন তিনি খিন্ন হন নাই, তাঁহার হাত হইতে গান্ডীব খসিয়া পড়ে নাই, শরীর কাঁপে নাই, চোখে জল আসে নাই। তবে এখন কেন এরূপ হইল? ভাল, অশোকের মত তাঁহার মনে কি অহিংসা বৃত্তির উদয় হইয়াছিল? তা নয়। উহা ছিল নিছক স্বজনাসক্তি। যদি গুরু বন্ধু-বান্ধব সামনে না থাকিত তবে শত্রুর মুন্ড তিনি হেলায় পাত করিতেন। কিন্তু আসক্তিজনিত মোহ তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা গ্রাস করিয়াছিল, আর তাই তাঁহার মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ মোহগ্রস্ত হইলেও সরাসরিভাবে কিছুতেই কর্তব্যচ্যুত হইতে চাহে না। তাহার কাছে উহা অসহ্য। সে উহাকে কোনও সদ্বিচারের আবরণে ঢাকে। অর্জুনের তাহাই হইয়াছিল। তিনি এখন প্রতিপাদন করিতে লাগিয়া গেলেন যুদ্ধই আসলে এক পাপ। যুদ্ধে কুলক্ষয় হইবে, ধর্ম লোপ পাইবে, স্বৈরাচার দেখা দিবে, ব্যভিচারবাদের প্রসার হইবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, সমাজে নানা-বিধ সংকট উপস্থিত হইবে। এরূপ বহু যুক্তি দিয়া তিনি কৃষ্ণকে বুঝাইতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আমার মনে পড়িতেছে। এক বিচারপতি ছিল। সে শত শত অপরাধীকে ফাঁসির সাজা দিয়াছিল। কিন্তু একদিন তাহারই ছেলেকে খুনের অভিযোগে তাহার সামনে হাজির করা হইল। প্রমাণ হইল সে খুন করিয়াছে। নিজ পুত্রকে ফাঁসির সাজা দেওয়ার পালা উপস্থিত হইল। কিন্তু ন্যায়াধীশ তাহা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইল। সে বুদ্ধির কসরৎ আরম্ভ করিল, "ফাঁসির সাজা অমানুষিক। এরূপ সাজা দেওয়া মানুষের শোভা পায় না। এতে মানুষের সংশোধনের আশা নষ্ট হয়ে যায়। হত্যাকারী উত্তেজনার আবেগে খুন করে ফেলেছে। কিন্তু খুনের নেশা যখন কেটে গেছে তখন তাকে নির্বিকারচিত্তে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে মারা মনুষ্যত্বের দিক থেকে সমাজের পক্ষে বড়ই লজ্জার ও কলঙ্কের কথা," ইত্যাদি যুক্তি এই ন্যায়াধীশ করিতে লাগিল। নিজ ছেলে যদি সামনে না আসিত ত বিনা দ্বিধায় ন্যায়াধীশ জীবনভর ফাঁসি দিয়া চলিত। কিন্তু নিজপুত্রের মমতাবশে ন্যায়াধীশ ঐরূপ কথা বলিতে লাগিল। ঐ কথা আন্তরিক ছিল

না। তাহা আসক্তিজনিত ছিল। 'এ আমার ছেলে' এই মমতা হইতে এই বাক্যজালের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অর্জুনের দশাও এই ন্যায়াধীশের মত হইয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের পরিণাম যে ঠিক ইহাই হইয়াছিল জগৎ তাহা দেখিয়াছে। কিন্তু বিচার্য-কথা এই যে উহা অর্জুনের তত্ত্বজ্ঞান নহে, উহা ছিল প্রজ্ঞাবাদ। কৃষ্ণ উহা জানিতেন। তাই তিনি উহার প্রতি আদৌ দৃক্‌পাত না করিয়া সোজা তাঁহার মোহনাশের চেষ্টা দেখিলেন। অর্জুন যদি সত্যই অহিংসাবাদী হইয়া যাইতেন তবে অবান্তর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তাঁহাকে যিনিই বলুন না কেন, আসল কথার জবাব না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার সমাধান হইত না। গীতার কোথাও এই বিষয়ের উত্তর নাই, অথচ অর্জুনের সমাধান হইয়াছে। এই সকলের ভাবার্থ এই যে অর্জুনের অহিংসাবৃত্তি ছিল না, যুদ্ধেই ছিল তাঁহার প্রবৃত্তি। তাঁহার দৃষ্টিতে যুদ্ধ তাঁহার পক্ষে স্বভাব-প্রাপ্ত ও অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। মোহবশে তিনি তাহা এড়াইতে চাহিয়াছিলেন। আর মুখ্যত এই মোহের উপরেই গীতার গদাঘাত।

(৩)

কেবল অহিংসার কথাই কি, সন্ন্যাসের ভাষা পর্যন্ত অর্জুন বলিতে-ছিলেন। তিনি বলিতেছেন, এই রক্ত-লাঞ্ছিত ক্ষাত্রধর্ম অপেক্ষা সন্ন্যাস ভাল। কিন্তু ঐ বৃত্তি আসিত কিরূপে? সন্ন্যাসের নামে তিনি যদি বনে যাইতেন ত সেখানে তিনি হরিণ মারিতে লাগিয়া যাইতেন। তাই ভগবান সাফ্ বলিলেন, "অর্জুন, একথা যে বলছ আমি যুদ্ধ করব না সে তোমার ভ্রম। এ পর্যন্ত তোমার যে স্বভাব বনে গেছে তা তোমাকে যুদ্ধ না করিয়ে ছাড়বে না।"

অর্জুনের কাছে স্বধর্ম বিগুণ মনে হইতেছিল। কিন্তু স্বধর্ম যতই বিগুণ হউক, তাহাতে থাকিয়াই নিজের বিকাশ হইতে পারে। এখানে অভিমানের অবসর নাই। বিকাশের ইহা সূত্র। বড় বলিয়া স্বধর্ম গ্রহণ করা যায় না, ছোট বলিয়াও বর্জন করা যায় না। উহা বড়ও নয়, ছোটও নয়। উহা আমাদের প্রয়োজনের অনুরূপ। 'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ'

এই গীতা-বচনে ধর্ম শব্দের অর্থ হিন্দুধর্ম, ইস্‌লাম, খৃস্টধর্ম ইত্যাদি নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম পৃথক পৃথক। আমার সামনে যে দুইশত লোক রহিয়াছেন তাঁহাদের দুইশত ধর্ম রহিয়াছে। আমারও দশ বছর আগে যে ধর্ম ছিল, আজ তাহা নাই। আজিকারটা দশ বছর পরে থাকিবে না। ভাবনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা বৃত্তি বদলাইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার ধর্ম খসিয়া পড়িতে ও নূতন ধর্ম লাভ হইতে থাকে। জেদ করিয়া কিছুই করা উচিত নয়।

অপরের ধর্ম যদি শ্রেষ্ঠও মনে হয়, উহা গ্রহণে আমার কল্যাণ নাই। সূর্যের আলো আমার প্রিয়। ঐ আলোর দ্বারা আমি বৃদ্ধিলাভ করিতেছি। সূর্য আমার বন্দনীয়। কিন্তু সেই হেতু ভূতলে না থাকিয়া তাহার কাছে যদি যাইতে চাই তবে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইব। উল্টা পৃথিবীতে থাকা যদি বিগুণও হয়, সূর্যের তুলনায় পৃথিবী যদ্যপি একান্ত তুচ্ছও হয়, তার যদি নিজ আলো নাও থাকে, তথাপি যতদিন সূর্যের তেজ সহ্য করার শক্তি আমাতে না জন্মে ততদিন সূর্য হইতে দূরে পৃথিবীতে থাকিয়াই আমাকে আমার নিজ বিকাশ করিয়া লইতে হইবে। মাছকে বলুন, "জল থেকে দুধ দামী, চল দুধে থাকবে।" মাছ তাহাতে রাজী হইবে কি? মাছ জলেই বাঁচে, দুধে মরে।

অপরের ধর্ম সহজ মনে হইলেও, তাহা গ্রহণ করা উচিত নয়। অনেক স্থলে ঐ সুলভতা ধোকা মাত্র। সংসারে স্ত্রী-পুত্রাদিকে ঠিক পরিচালনা করা যায় না বলিয়া কেহ যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে ত তাহা ভণ্ডামি হইবে, বোঝাস্বরূপ হইবে। সুযোগ পাইলেই তাহার বাসনাসমূহ প্রবল হইবে। সংসারের বোঝা বহন করিতে অশক্ত বলিয়া যে বনে যায় সে প্রথমে কুড়ে বাঁধিবে। পরে উহা রক্ষার নিমিত্ত বেড়া দিবে। অবস্থা হইবে এই যে, এইরূপ করিতে করিতে সেখানেও সে সারা সংসার খাড়া করিবে। বৈরাগ্য-বৃত্তির উদয় হইলে সন্ন্যাসে কঠিনতা কোথায়? সন্ন্যাস সহজ একথা বলার মত স্মৃতি-বচন ত রহিয়াছেই। কিন্তু মুখ্য কথা হইতেছে বৃত্তি। যাহার বৃত্তি বস্তুতপক্ষে যেরূপ তাহার ধর্মও তদ্রূপ হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট,

সরল, কঠিন এই প্রশ্ন নহে। খাঁটি বিকাশ হওয়া চাই, সত্যকার পরিবর্তন হওয়া চাই।

কিন্তু কিছু ভাবুক লোক জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, "যুদ্ধধর্ম হতে সন্ন্যাস যদি সব সময়েই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ তবে ভগবান অর্জুনকে খাঁটি সন্ন্যাসী বানাইলেন না কেন? তাঁহার পক্ষে ত অসম্ভব কিছুই ছিল না।" কিন্তু সে ক্ষেত্রে অর্জুনের পুরুষার্থ থাকিত কি? পরমেশ্বর স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেকে নিজের মত প্রযত্ন করিতে থাকিবে। এইখানেই ত মাধুর্য। শিশু নিজ হাতে ছবি আঁকিতে আনন্দ পায়। কেহ তাহাদের হাত ধরিয়া আঁকায় ইহা তাহাদের ভাল লাগে না। ছেলেদের আঁক যদি শিক্ষক বরাবর করিয়া দেন, তবে বুদ্ধির বিকাশ হইবে কি ভাবে? মা-বাপ ও গুরুর কাজ হইতেছে কেবল পথ দেখানো। পরমেশ্বর ভিতর হইতে আমাদের পথ দেখাইয়া থাকেন। ইহার অধিক তিনি কিছু করেন না। কুমারের মত ঠুকিয়া পিটিয়া, অথবা থাবড়াইয়া যদি প্রত্যেকের মূর্তি গড়েন ত তার মূল্য কি? আমরা মাটির হাঁড়ি নহি। আমরা চিন্ময়।

এই সব বিশ্লেষণ হইতে একথা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া থাকিবে যে, স্বধর্মের অন্তরায়-স্বরূপ যে মোহ তাহার নিরাকরণার্থই গীতার জন্ম। অর্জুন ধর্ম-সংমূঢ় হইয়াছিলেন। স্বধর্মের বিষয়ে তাঁহার মনে মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ দোষ প্রদর্শন করা মাত্র অর্জুন নিজেই তাহা স্বীকার করিতেছেন। ঐ মোহ, ঐ মমত্ব, ঐ আসক্তি দূর করাই গীতার মুখ্য কাজ। আদ্যন্ত গীতা শোনানর পরে ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে অর্জুন, তোমার মোহ দূর হল?" আর অর্জুন বলিতেছেন, "হাঁ, ভগবান, মোহ দূর হয়েছে।" এইভাবে গীতার উপক্রম ও উপসংহারে মিলাইয়া দেখিলে মোহ নিরসনই যে গীতার ফলিত ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কেবল গীতাই নহে সারা মহাভারতের ইহাই উদ্দেশ্য। মহাভারতের প্রারম্ভেই ব্যাসদেব কহিয়াছেন যে, লোকহৃদয়ের মোহাবরণ দূর করার নিমিত্তেই আমি এই ইতিহাস-প্রদীপ জ্বালাইতেছি।

(৪)

পরবর্তী সমগ্র গীতা বুঝার পক্ষে অর্জুনের এই পটভূমিকা আমাদের খুব কাজে আসিবে। তজ্জন্য আমরা ইহার নিকট ঋণী। তাহা ছাড়াও আর এক উপকার ইহা করিয়াছে। অর্জুনের এই ভূমিকা হইতে তাঁহার মনের একান্ত ঋজুতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'অর্জুন' শব্দের অর্থই 'ঋজু' কিম্বা 'সরল স্বভাবের'। তাঁহার মনে যে সব বিকার অথবা বিচার উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তিনি খোলামনে ভগবানের কাছে ধরিয়াছিলেন। গোপন তিনি কিছুই করেন নাই; আর অন্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি আগে হইতেই কৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন। কৃষ্ণকে সারথি করিয়া যখন তিনি নিজ ঘোড়ার লাগাম তাঁহার হাতে দিয়াছিলেন, তখনই তিনি নিজ মনোবৃত্তিরও লাগাম তাঁহার হাতে সমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আসুন আমরাও তাহা করি। অর্জুনের কাছে কৃষ্ণ ছিলেন। কৃষ্ণকে আমরা কোথায় পাইব?—একথা যেন আমরা না বলি। কৃষ্ণ নামধারী কোন ব্যক্তি আছেন, এইরূপ ঐতিহাসিক বা ব্যর্থ তর্কে যেন আমরা না পড়ি। অন্তর্যামীরূপে প্রতি হৃদয়ে কৃষ্ণ বিরাজমান। তিনি নিকট হইতেও নিকটতম। আসুন আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত ছল-চাতুরী তাঁহার সামনে ধরি, আর তাঁহাকে বলি, "ভগবান, আমি তোমার শরণ নিচ্ছি। তুমি আমার অনন্য গুরু, তুমি আমাকে যে কোন পথ দেখাও। যে পথ দেখাবে সে পথে আমি চলব।" তাহা করিলে সেই পার্থসারথি আমাদেরও সারথ্য করিবেন। নিজ শ্রীমুখে তিনি আমাদের গীতা শুনাইবেন আর আমাদের বিজয় লাভ করাইবেন।

রবিবার, ২১-২-৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

(৫)

বন্ধুগণ,

প্রথম অধ্যায়ে আমরা অর্জুনের বিষাদ-যোগ দেখিয়াছি। যখন অর্জুনের মত ঋজুতা ও হরিশরণতা আসে তখন তাহাতে বিষাদেরও যোগ হয়। ইহাকে হৃদয়-মন্থন বলে। সংকল্পকার গীতার ভূমিকাকে অর্জুন-বিষাদ-যোগ রূপ বিশেষ নাম দিয়াছেন। আমি তাহাকে বিষাদ-যোগ রূপ সাধারণ নাম দিতেছি। কারণ গীতার পক্ষে অর্জুন এক নিমিত্ত মাত্র। পন্ঢরপুরের পান্ডুরঙ্গ কেবল পুন্ডলীকের জন্য অবতার গ্রহণ করিয়া-ছিলেন তাহা নহে। জড়জীব আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আজ হাজারো বৎসর ধরিয়া তিনি দন্ডায়মান। তদ্রূপ গীতার কৃপা অর্জুনের নিমিত্ত হইলেও আমাদের সকলের জন্যই তাহা হইয়াছে। তাই গীতার প্রথম অধ্যায়কে বিষাদ-যোগ এই সাধারণ নাম দেওয়াই শোভন হইবে। গীতাবৃক্ষ এখান হইতে বাড়িতে বাড়িতে শেষ অধ্যায়ে প্রসাদযোগরূপ ফলধারণ করিবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় হইলে এই কারাবাসকালে আমরাও সে পর্যন্ত পোঁছিয়া যাইব।

গীতার শিক্ষার সুরু দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে। আর আরম্ভেই ভগবান জীবনের মহাসিদ্ধান্ত বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, যে সব মুখ্য তত্ত্বের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুরুতেই তাহা যদি অন্তরে গাঁথিয়া যায় তবে পরবর্তী পথ সুগম হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সাংখ্যবুদ্ধি' শব্দের অর্থ আমার মতে জীবনের মূলীভূত সিদ্ধান্ত। এই সকল মূল সিদ্ধান্ত এখন আমাদের বিচার করিতে হইবে। তার আগে এই সাংখ্য শব্দের প্রসঙ্গে গীতার পারিভাষিক শব্দের অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া লওয়া ভাল।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় শব্দসমূহকে গীতা হামেশা নূতন অর্থে ব্যবহার করিয়াছে। পুরাতন শব্দসমূহে নূতন অর্থের কলম বসানো বিচার-বিপ্লবের

অহিংস প্রক্রিয়া। ব্যাসদেব এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধহস্ত। তাই গীতার শব্দসমূহ ব্যাপক সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছে অথচ সরল ও চির সতেজ রহিয়া গিয়াছে। আর তাই জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ নিজ নিজ প্রয়োজন ও উপলব্ধি অনুসারে তাহাদের বিভিন্ন অর্থ করিতে পারিয়াছেন। নিজ নিজ দৃষ্টি হইতে ঐ সব অর্থই ঠিক হইতে পারে। আর আমি মনে করি, উহাদের বিরোধ না করিয়া স্বতন্ত্র অর্থও আমরা করিতে পারি।

এই প্রসঙ্গে উপনিষদে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক সময়ে দেব, দানব ও মানব এই তিনে উপদেশের জন্য প্রজাপতির কাছে গিয়াছিল। প্রজাপতি সকলকে 'দ' অক্ষরটি দেন। দেবেরা বলিল, "দেবতা আমরা কামী, বিষয়ভোগে আমাদের আসক্তি জন্মেছে। তাই ব্রহ্মা 'দ' অক্ষর দ্বারা দমন করার শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন।" দানবেরা বলিল, "আমরা দানবেরা ক্রোধী, দয়াহীন হয়ে গেছি। 'দ' অক্ষর দ্বারা 'দয়া কর' এই শিক্ষা প্রজাপতি আমাদের দিয়েছেন।" মানবেরা বলিল, "মানব আমরা লোভী, সঞ্চয়ের জন্য পাগল হয়েছি। 'দ' অক্ষর দ্বারা 'দান কর' এই শিক্ষা প্রজাপতি আমাদের দিয়েছেন।" প্রজাপতি বলিলেন, সকলের অর্থই ঠিক। কারণ সকলেই আত্মানুভূতি হইতে নিজের নিজের অর্থ পাইয়াছে। গীতার পরিভাষার অর্থ করার সময় উপনিষদের এই কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

(৬)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবনের তিন মহাসিদ্ধান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে—(১) আত্মার অমরতা ও অখণ্ডতা, (২) দেহের ক্ষুদ্রতা, এবং (৩) স্বধর্মের অবাধ্যতা। উহার মধ্যে স্বধর্মের সিদ্ধান্ত কর্তব্যরূপ এবং অপর দুইটি জ্ঞাতব্য। পূর্ব অধ্যায়ে স্বধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। প্রকৃতি-ধর্মে এই স্বধর্ম আমরা পাইয়া থাকি। স্বধর্ম খুঁজিয়া লইতে হয় না। আকাশ হইতে পড়িয়া আমরা চলিতে-ফিরিতে থাকি, তাহা নয়। আমাদের জন্ম হইবার পূর্বেই এই সমাজ ছিল, মা-বাপ ছিলেন, পাড়াপ্রতিবেশী ছিলেন। এই প্রবাহে আমরা জন্ম গ্রহণ করি। যে মা-বাপের ঘরে আমাদের জন্ম, তাঁহাদের সেবা করার ধর্ম জন্ম হইতেই আমরা প্রাপ্ত হই। আর যে সমাজে

জন্মিয়াছি তাহার সেবা করার ধর্মও ঐভাবেই আমাদের কাছে আসিয়া যায়। আমাদের জন্মের সঙ্গেই আমাদের স্বধর্মের জন্ম হইয়া থাকে। একথাও বলা যাইতে পারে যে, আমাদের জন্মের পূর্ব হইতেই তাহা আমাদের জন্য তৈরি ছিল। কারণ তাহাই আমাদের জন্মের হেতু। তাহা সম্পন্ন করার জন্যই আমাদের জন্ম। পত্নীর সহিত স্বধর্মের তুলনা করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, পত্নীর সম্বন্ধ যেমন অচ্ছেদ্য স্বধর্মও তদ্রূপ অচ্ছেদ্য। কিন্তু এই উপমাও আমার কাছে গৌণ মনে হয়। আমি স্বধর্মের তুলনা করি মায়ের সহিত। আমার মা কে হইবেন সে নির্বাচন আমার অপেক্ষায় ছিল না। আগে হইতেই তাহা নির্দিষ্ট ছিল। যেরূপই হউক তাহা এখন আমার ফেলিবার উপায় নাই। স্বধর্ম সম্বন্ধেও সেই কথা, স্বধর্ম ছাড়া এ জগতে অপর কোন অবলম্বন আমাদের নাই। স্বধর্মকে অস্বীকার করা 'স্ব'-কে অস্বীকার করার মতই আত্মঘাতী। অগ্রসর হইতে চাই ত স্বধর্মের সহায়তায়ই অগ্রসর হইতে হইবে। অতএব এই স্বধর্মের আশ্রয় কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নহে—জীবনের ইহা অন্যতম মূল সিদ্ধান্ত।

স্বধর্ম এরূপ সহজপ্রাপ্ত যে তার আচরণ অনায়াসসাধ্য হওয়া উচিত। কিন্তু নানা মোহের দরুন তাহা হয় না। অথবা অতি কষ্টে হয়। আর হইলেও তাহাতে নানা বিষ মিশিয়া যায়। স্বধর্মের পথে বিঘ্নসৃষ্টিকারী মোহের বাহ্যরূপ অনেক। সীমাসংখ্যা তার নাই। বিচার-বিশ্লেষণ করিলে ঐ সকলের মূলে একটি মুখ্য বস্তু দেখা যায়—সে হইতেছে সংকীর্ণ ও হাল্কা দেহবুদ্ধি। আমি ও আমার শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি ও বস্তু, বস্, এই পর্যন্তই আমার ব্যাপ্তি, প্রসারের সীমা। যাহারা এই গণ্ডির বাহিরে তাহারা সকলে পর, শত্রু—ভেদের এই প্রাচীর দেহ-বুদ্ধি খাড়া করিয়া দেয়। আর 'আমি' ও 'আমাদের' বলিয়া যাহাদের গণনা করি তাহাদের শরীরটাই মাত্র তাহা দেখে। দেহ-বুদ্ধির এই দ্বিবিধ প্যাঁচে পড়িয়া আমরা নানাবিধ ডোবা—বেষ্টনী সৃষ্টি করিতে থাকি। প্রায় সকলের পক্ষেই একথা খাটে। কাহারও ডোবা ছোট, কাহারও বা বড়, এই মাত্র। কিন্তু আসলে তাহা ডোবাই—গণ্ডি। উহার গভীরতা এই শরীরের চর্মের গভীরতারই সমান। কেহ সৃষ্টি করে আত্মীয়-স্বজনের গণ্ডি, কেহ বা দেশাভিমানের।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণেতর নামক এক ডোবা বা গণ্ডি, মুসলমান-অমুসলমান নামক আর এক ডোবা বা গণ্ডি, এরূপ দুই-একটি নহে অসংখ্য ডোবা—গণ্ডি রহিয়াছে। যেদিকে তাকান ডোবা আর ডোবা। আমাদের এই জেলেও রাজনৈতিক কয়েদী ও অন্যবিধ কয়েদী—এইরূপ গণ্ডি রহিয়াছে, তাহা ছাড়া আমাদের জীবন যেন চলে না। কিন্তু পরিণাম ইহার কি? পরিণাম একই। হীন বিকারের জীবাণুর প্রসার আর স্বধর্মরূপী স্বাস্থ্যের নাশ।

(৭)

এই অবস্থায় কেবল স্বধর্মনিষ্ঠা পর্যাপ্ত নহে। তার জন্য অপর দুইটি সিদ্ধান্ত জাগ্রত রাখা চাই। এক—আমি মরণশীল দেহ নহি, দেহ উপরের ক্ষুদ্র পাপড়ি মাত্র। দুই—আমি মৃত্যুহীন অখণ্ড ব্যাপক আত্মা। এই দুই মিলিয়া এক পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হয়।

এই তত্ত্বজ্ঞান গীতার দৃষ্টিতে এত আবশ্যক মনে হইয়াছে যে, গীতা তাহার আবাহন প্রথমে করিয়াছে, আর স্বধর্মের অবতারণা করিয়াছে পরে। কেহ কেহ বলেন, "প্রারম্ভেই এই সব তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক শ্লোকের অবতারণা কেন?" কিন্তু আমি মনে করি, গীতায় যদি এমন কোন শ্লোক থাকে যাহা মোটেই স্থানান্তরিত করা যায় না তবে তাহা হইতেছে এই সব শ্লোক।

এইটুকু তত্ত্বজ্ঞান মনে অঙ্কিত হইয়া গেলে স্বধর্ম আদৌ কঠিন মনে হইবে না। তাহাই নহে, স্বধর্মের বাহিরে অন্য কিছু করাই কঠিন মনে হইবে। আত্মতত্ত্বের অখণ্ডতা ও দেহের ক্ষুদ্রতার কথা বুঝা কঠিন নহে। কারণ এই দুই-ই সত্য বস্তু। কিন্তু তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। মনে তাহা বার বার মন্থন করিতে হইবে। এই চর্মের গুরুত্ব কমাইয়া আত্মাকে গুরুত্ব দেওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

পলে পলে এই দেহ বদলাইতেছে। বাল্যকাল, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা এই চক্রের অভিজ্ঞতা কাহার না আছে? আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌দের মতে সাত বৎসরে শরীর একেবারে বদলাইয়া যায়, পুরাতন রক্তের একবিন্দুও অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের পূর্বজগণ মনে করিতেন যে, বার বৎসরে পুরাতন শরীর মরিয়া যায়। তাই প্রায়শ্চিত্তের, তপশ্চর্যার, অধ্যয়ন আদির

অবধি বার বার বৎসরের ছিল। বহু বৎসর ছাড়াছাড়ির পর ছেলের সহিত মায়ের মিলন হইয়াছে; মা ছেলেকে চিনিতে পারেন নাই এরূপ গল্প আমরা শুনিতে পাই। যে দেহ এইভাবে প্রতিক্ষণ বদলাইতেছে, প্রতিক্ষণ মরিতেছে তাহাই কি তোমার রূপ? দিন-রাত যেখানে মলমূত্রের প্রবাহ বহিতেছে, আর তোমার মত উত্তম সেবক তাহা ধৌত করিতে সদা প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও যাহার অপরিচ্ছন্নতার ব্রত ভঙ্গ হয় না, তুমিই কি সে? সে অপরিচ্ছন্ন, তুমি তাহার পরিচ্ছন্নতা-বিধানকারী; সে রোগী, তুমি তাহার শুশ্রূষাকারী, সে সাড়ে তিন হাত পরিমিত, তুমি ত্রিভুবনবিহারী, সে নিত্যপরিবর্তনশীল, তুমি তাহার পরিবর্তনের সাক্ষী, সে মরণশীল, আর তুমি তাহার মৃত্যুর ব্যবস্থাকারী। তোমার ও উহার পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তুমি এমন সঙ্কুচিত হইয়া থাক কেন? এই দেহের সহিত যত সম্বন্ধ তাহা আমারই এ কথা কেন মনে কর? আর এই দেহের মৃত্যুতে এত শোকই বা কেন? ভগবান বলেন, "আরে, দেহের বিনাশ কি শোক করার মত ব্যাপার?"

দেহ ত কাপড়ের মত। পুরাতন ছিঁড়িয়া যায়, তাই নূতন ধারণ করা হয়। একই শরীর যদি আত্মাকে সদা আঁকড়াইয়া থাকে ত আত্মার নিকৃষ্ট গতি হয়। সমস্ত বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আনন্দ অদৃশ্য হয়, আর জ্ঞানপ্রভা ম্লান হয়। অতএব দেহের বিনাশ পরিতাপের হইতে পারে না। হাঁ, আত্মার বিনাশ যদি সম্ভব হইত তবে তাহা অবশ্যই শোচনীয় হইত, কিন্তু আত্মা অবিনাশী—যেন অখণ্ড বহমানা ঝরণা। অনেক কলেবর তাহাতে আসে যায়। অতএব দেহ-সম্বন্ধের পাকে পড়িয়া শোক করা এবং ইহা আমার, উহা অপরের, এই ভেদাবিভেদ করা একান্তই অনুচিত। মনে কর, এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন সুন্দর বোনা একখানি চাদর। ছোট শিশু হাতে কাঁচি লইয়া যেমন চাদর টুকরা করিয়া ফেলে, তেমনি এই দেহরূপ কাঁচি দ্বারা যদি এই বিশ্বাত্মাকে টুকরা করা হয় ত তাহা কতই না ছেলেমানুষি হইবে—হিংসা হইবে!

যে ভারতভূমে ব্রহ্মবিদ্যার জন্ম হইয়াছে, সেখানে এরূপ অগণিত ছোট বড় দল, সম্প্রদায় ও জাতি দেখা যায় ইহা সত্য সত্যই নেহাত দুঃখের কথা। আর আমাদের মনে মৃত্যুভয় এরূপ বাসা বাঁধিয়াছে যে, তেমনটা আর কোথাও

বড় দেখা যায় না। ইহা দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ফল, সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার ইহাই যে পরাধীনতার অন্যতম কারণ একথা ভুলিলেও চলিবে না।

মৃত্যু শব্দটাই আমাদের কাছে অসহ্য। মৃত্যু এই নামটাই অমংগলের মনে হয়। বড় দুঃখে জ্ঞানদেব বলিয়াছেন ঃ

"মৃত্যু শব্দ নাহি সহে, মরে গেলে কাঁদে।"

লোক মরিলে কান্নার মহা রোল পড়িয়া যায়। তাহা যেন এক কর্তব্য! ব্যাপার এতটা গড়াইয়াছে যে কাঁদার জন্য লোক ভাড়া করা হয়। মৃত্যু আসন্ন। তবু রোগীকে সেকথা বলা হয় না। রোগী বাঁচিবে না, একথা ডাক্তার বলিলেও মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়। ডাক্তার নিজেও স্পষ্ট করিয়া বলে না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মুখে ঔষধ ঢালিতে থাকে। তার পরিবর্তে সত্য বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া ঈশ্বর-স্মরণের দিকে যদি তাহার মন ঘুরানো যায় তবে কতই না ভাল হয়। কিন্তু লোকের ভয় ঐ ধাক্কায় ভান্ড যদি আগেই ভাঙিয়া যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগে কি এই ভান্ড ভাঙিবার? আর যে ভান্ড দুই ঘণ্টা পরে ভাঙিবেই তাহা যদি দুই ঘণ্টা আগে ভাঙে ত কি আসে যায়। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা কঠোর ও প্রেমহীন হইয়া গেলাম। দেহাসক্তি প্রেম নহে বরং দেহাসক্তি দূর না হইলে যথার্থ প্রেমের উদয় হয় না।

দেহাসক্তি চলিয়া গেলে বুঝা যাইবে যে দেহ সেবার সাধন হইয়াছে। আর তখন দেহ তার যোগ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। কিন্তু আজ দেহপূজাকে আমরা সাধ্য মনে করিতেছি। স্বধর্মাচরণ যে সাধ্য সেকথা ভুলিয়াই গিয়াছি। দেহ ধারণ করা, তাকে পান-আহার দেওয়া সে ত স্বধর্ম আচরণের নিমিত্ত। কেবল বাসনাতৃপ্তির জন্য তার দরকার নাই। চামচ দিয়া হালুয়া অথবা ভাত-ডাল পরিবেশন কর তাহাতে চামচের কোন সুখ-দুঃখ নাই। জিহ্বার অবস্থাও অনুরূপ হওয়া চাই—রসবোধ থাকিবে, সুখ-দুঃখ নহে। শরীরের খাজানা শরীরকে মিটাইয়া দিয়াছি; ভাল, আর কি চাই। সুতাকাটার জন্য চরকায় তৈল দিতে হয়। তেমনি শরীর হইতে কাজ আদায় করিতে হয় বলিয়া তাহাতে কয়লা দিতে হয়। এইভাবে যদি আমরা দেহের ব্যবহার করি তবে মূলত ক্ষুদ্র হইলেও উহার মূল্য বাড়িয়া যাইতে পারে, আর তাহা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে।

কিন্তু সাধনরূপে ব্যবহার না করিয়া আমরা দেহে ডুবিয়া যাই, আত্ম-সঙ্কোচ করিয়া ফেলি। তার ফলে মূলেই যে দেহ ক্ষুদ্র তাহা আরও ক্ষুদ্র হইয়া যায়। তাই সাধুপুরুষেরা দৃঢ়ভাবে বলেন, "'দেহ ও দেহ-সম্বন্ধ নিন্দ্য। কুকুর শূকর আদির বন্দ্য'—ওরে, দেহের ও দেহের সহিত যার সম্বন্ধ, দিনরাত তার পূজা তুই করিস নে। অপরকে চিনতে শেখ।" এই-ভাবে সাধুপুরুষেরা আমাদের আত্মপ্রসারের শিক্ষা দিয়া থাকেন। আপন আত্ম-ইষ্ট-মিত্র ব্যতীত অপরের কাছে নিজ আত্মা এতটুকুও আমরা লইয়া যাই কি? জীবে জীবের সমাবেশ, আত্মায় আত্মার মিলন, এইরূপ আমরা করি কি? নিজ আত্ম-হংসকে এই পিঞ্জরের বাহিরের হাওয়া খাওয়াই কি? যাকে নিজ গণ্ডি বলিয়া জানি সেই গণ্ডি ভেদ করিয়া আগামী কাল নূতন দশজন বন্ধু বানাইব একথা কখনও মনে হয় কি? আজ পনর, কাল পঁচিশ হইবে। আর পরিধি এরূপ বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত বিশ্বই আমার ও আমি সমস্ত বিশ্বের এই অনুভব করিতে থাকিব। জেল হইতে আমরা আত্মীয়-স্বজনকে পত্র দিই, ইহাতে বিশেষত্ব কোথায়? জেল হইতে বাহির হইয়া কোন নূতন বন্ধুকে—রাজনৈতিক কয়েদী নহে—চোর কয়েদী-বন্ধুকে পত্র লিখিবেন কি?

আমাদের আত্মা ব্যাপক হওয়ার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে। সমস্ত জগতকে সে নিজ করিয়া লইতে চাহে, কিন্তু আমরা দিই তাহাকে কামরায় বন্ধ করিয়া। আত্মাকে আমরা কয়েদী বানাইয়া ছাড়িয়াছি। আত্মার কথা মনেও হয় না। সকাল হইতে সন্ধ্যা দেহের সেবাতেই আমরা মত্ত—এই দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট হইল কি দুর্বল হইল ইহাই অনুক্ষণের চিন্তা। যেন সংসারে অপর কোন আনন্দ নাই। ভোগের ও স্বাদের আনন্দ পশুরাও উপভোগ করিয়া থাকে। এখন ত্যাগ ও স্বাদভঙ্গের আনন্দের খোঁজ করিবে কি করিবে না? নিজে ক্ষুধা-পীড়িত হওয়া সত্ত্বেও বাড়া ভাত আর কোন ক্ষুধাতুরকে দেওয়ার আনন্দ যে কি তাহা অনুভব কর। সেই স্বাদ চাখ। মা যখন ছেলের জন্য কষ্টভোগ করেন তখন তিনি এই সুখের কিছু আস্বাদ পান। মানুষ নিজের বলিয়া যে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি সৃষ্টি করে, অগোচরে সেখানেও আত্মবিকাশের মাধুর্য আস্বাদের বাসনা তাহার থাকে; কারণ দেহবন্ধ আত্মা স্বল্পমাত্রায় আর

খানিকের জন্য হইলেও উহার বাহিরে আসে, কিন্তু এই বাহিরে আসা কীদৃশ? কারাপ্রাচীরের মধ্যে কয়েদী যেমন ওয়ার্ডের বা কামরার বাহিরে আসে তাদৃশ। কিন্তু আত্মার কাজ ততটুকুতে চলে না। আত্মার চাই মুক্তানন্দ।

সারাংশ, (১) অধর্ম ও পরধর্মের বাঁকা রাস্তা ছাড়িয়া সাধকের স্বধর্ম-রূপ সহজ সরল রাস্তা ধরা চাই। স্বধর্মের আঁচল কখনও ছাড়িতে নাই। (২) দেহ ক্ষণভঙ্গুর একথা উপলব্ধি করিয়া স্বধর্মের নিমিত্ত উহার ব্যবহার করা চাই, আর দরকার হইলে স্বধর্মের নিমিত্ত উহার শেষ করা চাই। (৩) আত্মার অখণ্ডতা ও ব্যাপকতার বোধ সদা জাগ্রত রাখিয়া মন হইতে আত্মপর ভেদভাব দূর করা চাই। জীবনের এই মুখ্য সিদ্ধান্ত ভগবান সামনে ধরিয়াছেন। যে মানুষ তদ্রূপ আচরণ করিবে, সে একদিন-না-একদিন নিঃসন্দেহে এই নরদেহ দ্বারাই 'সচ্চিদানন্দ পদধারা' অনুভব করিবে।

(৮)

ভগবান জীবনের সিদ্ধান্তসমূহের নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কেবল সিদ্ধান্ত নির্দেশ করিলে কাজ পূর্ণ হয় না। গীতায় বর্ণিত এই সব সিদ্ধান্ত উপনিষদ ও স্মৃতিসমূহে পূর্ব হইতেই ছিল। গীতা এই সব পুনরায় উপস্থিত করিয়াছে,—এখানে গীতার অপূর্বতা নহে, এই সকল সিদ্ধান্ত কি ভাবে আচরণ করা যায় সেই পথ গীতা দেখাইয়াছে, আর এই-খানেই গীতার অপূর্বতা। এই মহাপ্রশ্নের সমাধানেই গীতার নৈপুণ্য।

জীবনের সিদ্ধান্তসমূহকে আচরণ করার কলা বা উপায়কে যোগ কহে। সাংখ্যের অর্থ সিদ্ধান্ত বা শাস্ত্র। আর যোগ মানে কলা। তাই ত জ্ঞানদেব সাক্ষ্য দিতেছেন, "যোগীদের জীবনে রূপ পেয়েছে জীবনকলা।" সাংখ্য ও যোগ, শাস্ত্র ও কলা এই দুইয়ে গীতা পরিপূর্ণ। শাস্ত্র ও কলার মিলনে জীবন-সৌন্দর্য বিকশিত হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রের জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত ব্যক্ত করার কলা যদি না সাধিয়া থাক ত নাদব্রহ্মের ব্যঞ্জনা হইবে না। তাই ভগবান সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিনিয়োগ করার কলাও দেখাইয়াছেন। ভাল, সে কলা কিরূপ? দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া

আত্মার অমরতা ও অখণ্ডতার উপর নজর রাখিয়া স্বধর্মাচরণের ঐ কলা কি প্রকার?

লোকে দ্বিবিধ ভাবনা হইতে কর্ম করে। এক—নিজ কর্মের ফল অবশ্য ভোগ করিব। তাহাতে আমার অধিকার, আর ইহার বিপরীত আর এক ভাব এই, ফল ভোগ করিতেই যদি না পাইলাম তবে কর্ম করিতে যাই কেন? এই দুইটি ছাড়া গীতা তৃতীয় এক ভাব বা বৃত্তির কথা বলিয়াছে। গীতা বলে, "কর্ম অবশ্যই করবে, কিন্তু ফলে তোমার অধিকার একথা মনে করো না। কর্ম যে করে ফলে অবশ্যই তার অধিকার আছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় সেই অধিকার তুমি ছেড়ে দাও।" রজোগুণ বলে, "নিতে হয় ত ফলসহিত নেব।" আর তমোগুণ বলে, "ছাড়তে হয় ত কর্মসহিত ছাড়ব।" এই দুই একে অন্যের সোদর। অতএব এই দুইয়ের ঊর্ধ্বে উঠিয়া তুমি শুদ্ধ সত্ত্ব-গুণী হও—অর্থাৎ কর্ম কর, কিন্তু ফল ছাড়। আর ফল ছাড়িয়া কর্ম কর। আগে বা পাছে ফলের আশা রাখিও না।

ফলের আশা করিও না—একথার সঙ্গে সঙ্গে গীতা একথাও বলে যে, কর্ম উত্তমরূপে ও দক্ষতাসহকারে করিতে হইবে। সকাম পুরুষের কর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম পুরুষের কর্ম অধিকতর ভাল হওয়া চাই। আর এই প্রত্যাশা উচিতও বটে; কারণ সকাম পুরুষ ফলাসক্ত। তাই ফলের স্বপ্ন-চিন্তায় তাহার সময় ও শক্তি অল্পাধিক অবশ্যই ব্যয় হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ফলেচ্ছারহিত লোকের প্রতি মুহূর্ত আর সমগ্র শক্তি কাজে নিয়োজিত হয়। নদীর ছুটি নাই, হাওয়া বিশ্রাম জানে না, সূর্য অনুক্ষণ জ্বলিতেছে। তদ্রূপ নিষ্কাম কর্মী নিরন্তর সেবাকর্ম ছাড়া আর কিছু জানে না। অতএব এরূপ নিরন্তর কর্মরত পুরুষের কর্ম যদি উৎকৃষ্ট না হয় তবে হইবে কাহার? তা ছাড়া চিত্তের সমতা এক বড় নিপুণ গুণ। নিষ্কাম পুরুষের তাহা পৈতৃক সম্পত্তি। যে কোন হস্তশিল্প লক্ষ্য করুন। হস্তশিল্পের সহিত চিত্তের সমত্বের সংযোগ যদি হইয়া থাকে তবে পরিষ্কার দেখা যাইবে যে, সে কর্ম আরও সুন্দর হইয়াছে। তাহা ছাড়া সকাম ও নিষ্কাম পুরুষের কর্ম-দৃষ্টিতে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহাও নিষ্কাম পুরুষের কর্মের পক্ষে অধিকতর অনুকূল। সকাম পুরুষ

কর্মের দিকে স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখে। "আমার কাজ, আর ফল আমারই প্রাপ্য"—এই দৃষ্টির দরুন কর্ম হইতে তাহার মনঃসংযোগ কতকটা সরিয়া যায়। আর উহাতে সে কোন নৈতিক দোষও দেখিতে পায় না। খুব দেখে ত দেখে ব্যবহারদোষ মাত্র। কিন্তু নিষ্কাম পুরুষের নিজ কর্ম সম্বন্ধে নৈতিক কর্তব্যবুদ্ধি থাকে। তাই নিজ কার্যে ত্রুটির লেশমাত্র যাহাতে না থাকে সেদিকে তাহার তীক্ষ্ম দৃষ্টি। এই কারণেও তাহার কার্য অধিকতর নির্দোষ হইবে। যে দিক হইতেই দেখুন, ফলত্যাগ যে একান্ত নিপুণ ও ফলপ্রদ তত্ত্ব তাহা সপ্রমাণ হইবে। অতএব ফলত্যাগকে যোগ বা জীবনের কলা বলা উচিত হইবে।

নিষ্কাম কর্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কাজের নিজেরই যে আনন্দ রহিয়াছে সে আনন্দ উহার ফলে নাই। নিজ কর্ম করিতে করিতে এক প্রকারের তন্ময়তা জন্মে। তাহা আনন্দেরই এক ধারা। চিত্রকরকে বলুন, "ছবি আঁকতে হবে না, কত পয়সা চাই নাও।" সেকথায় সে কান দিবে না। কৃষককে বলুন, "ক্ষেতে যেয়ো না, গাই চরাতে হবে না, সেচ দিয়ো না, ধান-চাল যতটা চাও দিব।" সত্যিকার চাষীর সে কথা ভাল লাগিবে না। ভোরে উঠিয়া চাষী ক্ষেতে যায়। সূর্যনারায়ণ তাহার অভ্যর্থনা করে, পক্ষী তাহার জন্য তান ধরে। গরু-বলদ তাহার আশেপাশে চলাফেরা করে। প্রেমভরে সে তাহাদের পিঠে হাত বুলায়। যে ফসল বুনিয়াছে, অপলক নেত্রে সে তাহা দেখে। এই সকল কাজে এক প্রকারের সাত্ত্বিক আনন্দ রহিয়াছে। এই আনন্দই ঐ কার্যের মুখ্য ও খাঁটি ফল। সে তুলনায় উহার বাহ্য ফল নেহাতই তুচ্ছ।

কর্মফল হইতে গীতা যখন মানুষের দৃষ্টি সরাইয়া দেয় তখন গীতা ঐ উপায়ে তাহার কর্মতন্ময়তা শতগুণ বাড়াইয়া দেয়। ফল-নিরপেক্ষ লোকের কর্মবিষয়ক তন্ময়তা সমাধির তুল্য। এই হেতু তার আনন্দ অন্য আনন্দ হইতে শতগুণ অধিক। এ দিক হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, নিষ্কাম কর্ম নিজেই এক মহান ফল। জ্ঞানদেব ঠিকই বলিয়াছেন, "বৃক্ষে ধরেছে ফল, ফলে আর ধরবে কি ফল?" এই দেহরূপ বৃক্ষে নিষ্কাম স্বধর্মাচরণ-রূপ সুন্দর ফল ধরার পরে এখন আর কোন্ ফল চাই? কৃষক ক্ষেতে গম বোনে,

গম বেচিয়া জোয়ারের রুটি কেন খায়? সুস্বাদু ফল সে ফলায়, তাহা বেচিয়া সে লঙ্কা খায় কেন? ওরে ভাই, কলাই খাও না? কিন্তু লোকের সেকথা রুচে না, কলা খাওয়ার ভাগ্য থাকিতেও লঙ্কার জন্য পাগল হয়। গীতা বলে, "এরূপ তুমি করো না, কর্মই খাও, কর্মই পান করো, আর কর্মই পরিপাক করো।" ব্যস্, সবকিছু কর্ম করাতে আসিয়া যায়। খেলার আনন্দে শিশু খেলে, তাহা হইতে আপনাআপনি সে ব্যায়ামের ফল পাইয়া থাকে। কিন্তু সেই ফলের দিকে তার নজর থাকে না। তার সকল আনন্দ ঐ খেলাতে।

(৯)

সাধু লোকেরা নিজ নিজ জীবনদ্বারা একথা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তুকারামের ভক্তিভাব দেখিয়া শিবাজী মহারাজের মনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। একবার তিনি তুকারামের বাড়ী পাল্কী পাঠাইলেন, তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। তুকারাম অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "এই কি আমার ভক্তির ফল? এই জন্যই কি আমার ভক্তি?" তাঁহার মনে হইল মানসম্মানের এই ফল তাঁহার হাতে দিয়া ভগবান তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছেন। তিনি বলিলেন :

"জানিস অন্তর, তবু সৃষ্টি করিস ঝঞ্ঝাট।
এই ত তোর দোষ, পাণ্ডুরঙ্গ মহা খোট।"

ভগবান তোমার এই অভ্যাস ভাল নহে। এই ঘুঙ্গুরদানা দিয়া তুমি আমায় ভুলাইতে চাও। ভাবিতেছ এই আপদকে দূর করিয়া দিই। কিন্তু আমিও কাঁচা গুরুর চেলা নহি। তোমার পা শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিয়া যাইব। ভক্তি ভক্তের স্বধর্ম, আর ভক্তিতে ফলরূপ অবান্তর কণ্টক সৃষ্টি হইতে না দেওয়াই তাহার জীবনকলা। ফলত্যাগের ইহা অপেক্ষা গভীর আদর্শ, পুণ্ডলীকের চরিত্র আমাদের সামনে ধরিতেছে। পুণ্ডলীক নিজ মা-বাপের সেবা করিতেছিলেন। তাঁহার সেবায় তুষ্ট হইয়া পাণ্ডুরঙ্গ তাঁহাকে দর্শন দিতে আসিলেন। কিন্তু পুণ্ডলীক পাণ্ডুরঙ্গের ফাঁদে পড়িলেন না। সেবাকার্য হইতে বিরত হইলেন না। নিজ মা-বাপের এই সেবা

তাঁহার কাছে হৃদ্‌গত ঈশ্বরভক্তি ছিল। অপরকে লুঠপাট করিয়া কোন ছেলে যদি মা-বাপের সুখবিধান করে বা অপর দেশকে দ্রোহ করিয়া কোন দেশসেবক যদি নিজ দেশের উৎকর্ষ চাহে ত এই দুইজনের এই দুই বস্তুকে ভক্তি বলা যাইবে না, তাহা আসক্তি মাত্র। পুণ্ডলীক এই আসক্তির ফাঁদে পা দিলেন না। তিনি বলিলেন, পরমাত্মা আমার সামনে যে মূর্তিতে দাঁড়াইয়াছেন, তিনি কি তাহাই মাত্র? এইরূপে দেখা দেওয়ার আগে কি সৃষ্টি প্রেতবৎ ছিল? ভগবানকে তিনি বলিলেন, "হে ভগবান, তুমি স্বয়ং আমাকে দর্শন দিতে এসেছ তা দেখছি। কিন্তু আমি 'ও-সিদ্ধান্ত' মান্যকারী—একলা তুমিই ভগবান একথা আমি মানি না। আমার কাছে তুমিও ভগবান, মা-বাপও ভগবান। তাঁদের সেবায় নিযুক্ত আছি বলে তোমার দিকে মন দিতে পারছি না। তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো।" এই বলিয়া দাঁড়াইয়া থাকার জন্য ভগবানকে একখানা ইট বাড়াইয়া দিলেন এবং স্বীয় সেবাকার্যে নিমগ্ন হইলেন। এই প্রসঙ্গে তুকারাম বড়ই কৌতুক পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন :

"কেমন রে তুই পাগল প্রেমী,
রেখেছিস দাঁড় করে বিঠ্‌ঠলকে।
সাবাস তোর সাহসে,
পেতে দিলি ইট বিঠ্‌ঠলকে॥"

পুণ্ডলীক-আচরিত এই 'ও-সিদ্ধান্ত' ফলত্যাগ যুক্তির এক অঙ্গ। ফলত্যাগী পুরুষের কর্মসমাধি যেমন গভীর, তাহার বৃত্তিও তেমন ব্যাপক, উদার ও সমভাবাপন্ন। তাই সে দ্বিবিধ তত্ত্বজ্ঞানের ঝামেলায় পড়ে না আর নিজ সিদ্ধান্তও ছাড়ে না। 'নান্যদস্তীতিবাদিনঃ'—ইহাই, অপর কিছু নাই, এরূপ তর্ক সে তুলে না। ইহাও ঠিক আর উহাও ঠিক, কিন্তু আমার পক্ষে ত ইহাই ঠিক—এইরূপই তাহার বিনম্র দৃঢ় বৃত্তি। এক গৃহস্থ কোন এক সময়ে এক সাধুর কাছে গেল ও জিজ্ঞাসা করিল, "মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ঘর-সংসার ছাড়া দরকার কি?" সাধু বলিলেন, "নয় ত, দেখ, জনকের মত ব্যক্তি রাজমহলে থেকেও মোক্ষলাভ করে গেছেন। তখন তোমার ঘর ছাড়ার আবশ্যকতা

কোথায়?" পরে অপর একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামীজী, গৃহ-ত্যাগ না করলেও মোক্ষলাভ হতে পারে কি?" সাধু বলিলেন, "কে বলেছে? ঘরদোর না ছেড়ে অমনি যদি মোক্ষ মিলত তা হলে শুকের ন্যায় যাঁরা ঘর ছেড়েছিলেন তাঁরা কি মূর্খ ছিলেন?" পরে সেই দুইজনে দেখা হইলে মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল। একজন বলিল, "সাধু ঘর-সংসার ছাড়তে বলেছেন।" অপরে বলিল, "না, সাধু বলেছেন, ঘরদোর ছাড়ার দরকার নেই।" তাহারা তখন সাধুর কাছে গেল। সাধু বলিলেন, "দুইয়ের কথাই ঠিক। যার যেমন ভাব তার তেমন পথ। যার যেমন প্রশ্ন, উত্তরও তার তেমন। ঘর ছাড়া দরকার ইহা যেমন সত্য, আর ঘর ছাড়া নিষ্প্রয়োজন, ইহাও তেমন সত্য।" ইহাকেই বলে 'ও-সিদ্ধান্ত'।

পুণ্ডলীকের ফলত্যাগের উদাহরণ হইতে দেখা যায়, ফলত্যাগ কোন্ পর্যন্ত যাইতে পারে। ভগবান তুকারামকে যে প্রলোভনে ভুলাইতে চাহিয়া-ছিলেন, পুণ্ডলীকের কাছে উপস্থিত লোভ তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু তাহাতেও তিনি মোহিত হইলেন না। হইতেন ত যাইতেন। অতএব সাধন একবার নিশ্চিত হইয়া গেলে শেষ পর্যন্ত তাহার আচরণ করা চাই। মাঝপথে ভগবৎ-দর্শনরূপ বাধা উপস্থিত হইলেও সাধন ছাড়িতে নাই। ভগবানের দর্শন আর যাইতেছে কোথায়? তাহা ত হাতের মুঠেই।

"সর্বাত্মভাব মোর, আর কে নেবে কেড়ে!
তোমার ভক্তিরসে মন রঙিগয়ে গেছে যবে।"

এই ভক্তিলাভের নিমিত্তই আমাদের জন্ম। 'মা তে সংগোঽস্ত্বকর্মণি' এই গীতাবচনের অর্থ নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে অকর্মের অর্থাৎ অন্তিম কর্মমুক্তির তথা মোক্ষের বাসনা পর্যন্ত ত্যাগ করা। এতদূরই ইহার অর্থ প্রসারিত। মোক্ষ মানে বাসনা হইতে মুক্তি। বাসনার কাছ হইতে মোক্ষের কি পাওয়ার আছে? ফলত্যাগ যখনই এই স্তরে পৌঁছিয়া যায়, তখন জীবন-কলা ষোল কলায় পূর্ণ হয়।

(১০)

শাস্ত্র পথ দেখাইয়াছে, কলা দিক নির্দেশ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই গোটা চিত্র চোখের সামনে খাড়া হয় না। শাস্ত্র নির্গুণ। কলা সগুণ। কিন্তু সগুণও আকার ছাড়া ব্যক্ত হয় না। নিছক নির্গুণ যেমন শূন্যে থাকে, নিরাকার সগুণের অবস্থাও তদ্রূপ হইতে পারে। উপায় হইতেছে, যে গুণীতে গুণ মূর্তিমান হইয়াছে তাহার দর্শন। তাই ত অর্জুন বলিতেছেন, "হে ভগবান, আপনি মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। সে সকল সিদ্ধান্ত কিরূপে আচরণ করতে হয় সেই কলার সন্ধানও দিয়েছেন, তথাপি এর সুস্পষ্ট চিত্র আমার কাছে ধরা পড়ছে না। অতএব এখন আমাকে এর উদাহরণ দিন। যাঁর বুদ্ধিতে সাংখ্যনিষ্ঠা স্থির হয়েছে এবং ফলত্যাগরূপ যোগ যাঁর প্রতি রোমকূপে পরিব্যাপ্ত, এরূপ পুরুষের লক্ষণ বলুন। যাঁদের স্থিতপ্রজ্ঞ বলে, ফলত্যাগের পূর্ণতা যাঁদের মধ্যে দৃষ্ট হয়, কর্ম-সমাধিতে যাঁরা মগ্ন এবং মহামেরুসদৃশ দৃঢ়নিশ্চয়, তাঁরা কি ভাবে বলেন, কি ভাবে বসেন, কি ভাবে চলেন সে সব আমাকে বলুন। তাঁর আকৃতি কিরূপ? তাঁকে চেনার উপায় কি? ভগবন, সে সব বলুন।"

তাই ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তিম অষ্টাদশ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের গম্ভীর ও উদাত্ত চিত্র আঁকিয়াছেন। মনে হয় এই আঠার শ্লোকে গীতার আঠার অধ্যায়ের সার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ গীতার আদর্শ-মূর্তি। এই শব্দটিও গীতার নিজস্ব। পরে পঞ্চম অধ্যায়ে জীবন্মুক্তের, দ্বাদশে ভক্তের, চতুর্দশে গুণাতীতের এবং অষ্টাদশে জ্ঞান-নিষ্ঠার এরূপ বর্ণনাই রহিয়াছে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা এ সকল হইতে অধিক বিস্তৃত ও খোলাখুলিভাবে করা হইয়াছে। ইহাতে সিদ্ধ-লক্ষণের সহিত সাধক-লক্ষণও বলা হইয়াছে। সহস্র সহস্র সত্যাগ্রহী, স্ত্রী-পুরুষ সান্ধ্য-প্রার্থনায় এই সব শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে। প্রতি গ্রামে, প্রতি ঘরে, ঐ সব যদি পৌঁছাইয়া দিতে পারা যাইত তবে তাহা কতই-না আনন্দের হইত। কিন্তু আগে তাহা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করা চাই। তখন আপনা-আপনি তাহা বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবে। নিত্যপঠনীয় যন্ত্রবৎ হইলে তাহা চিত্তে রেখাপাত ত করেই না, উল্টা লয় পায়। কিন্তু এই দোষ নিত্য পাঠের নহে, মনন না

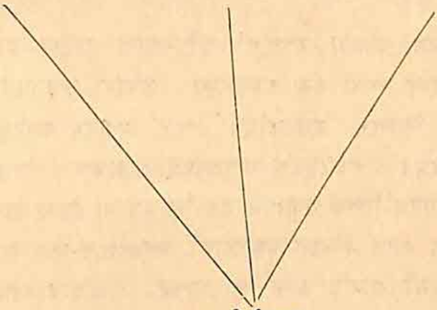
করার। নিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-মনন ও নিত্য-আত্মনিরীক্ষণ দরকার।

স্থিতপ্রজ্ঞ বলিতে স্থিরবুদ্ধি লোক বুঝায়। নামেই তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু সংযম ব্যতীত বুদ্ধি স্থির হইবে কিরূপে? তাই স্থিতপ্রজ্ঞকে সংযমমূর্তি বলা হইয়াছে। বুদ্ধির ত আত্মনিষ্ঠ হইতেই হইবে, আর অন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে বুদ্ধির অধীন হইতেই হইবে। ইহাই সংযমের অর্থ। ইন্দ্রিয়-সকলকে লাগাম দ্বারা বদ্ধ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ কর্মযোগে জুড়িয়া দেন। ইন্দ্রিয়রূপী বলদ দ্বারা তিনি নিষ্কাম স্বধর্মাচরণের ক্ষেত সুন্দররূপে আবাদ করিয়া লন। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তিনি পরমার্থে ব্যয় করেন।

এই ইন্দ্রিয়-সংযম সহজ নহে। ইন্দ্রিয় হইতে একেবারে কাজ না লওয়া সহজ হইতে পারে। মৌন, নিরাহারাদি ব্যাপার কঠিন নহে। ইহার বিপরীত, ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরঙ্কুশ ছাড়িয়া দেওয়া, সে ত যে-কেহই পারে। কিন্তু কচ্ছপ যেমন ভয়ের ক্ষেত্রে নিজের সমস্ত অঙ্গ ভিতরে গুটাইয়া লয় এবং নিরাপদ স্থানে উহাদের কাছ হইতে কাজ আদায় করে, তদ্রূপ বিষয়ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে গুটাইয়া লওয়া ও পরমার্থের কাজে উহাদের সমুচিত ব্যবহার করা—এই সংযম কঠিন। এই জন্য মহান্ প্রযত্ন আবশ্যক। জ্ঞানও চাই। তাহা হইলেও সব সময় যে উহা উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইবে তাহা নয়। তবে কি আশা ছাড়িব? হাল ছাড়িব? না, সাধকের কখনও নিরাশ হইতে নাই। সাধক নিজের সকল কর্মনৈপুণ্য কর্মে নিয়োগ করিবে। তাহা সত্ত্বেও যদি ত্রুটি থাকে ত ভক্তি জুড়িয়া দিবে। এই মহামূল্যবান নির্দেশ ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে দিয়াছেন, দিয়াছেন তাহা অবশ্য গুটিকয়েক শব্দে। কিন্তু গাড়ীবোঝাই বক্তৃতা অপেক্ষা তাহা অধিক মূল্যবান। কারণ যেখানে ভক্তির অভ্রান্ত প্রয়োজন সেখানেই তাহা উপস্থিত করা হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণসমূহের বিস্তৃত বিবরণ আজ এখানে দেওয়ার নহে। কিন্তু আমাদের এই সাধনায় ভক্তির নিজস্ব স্থানের কথা পাছে আমরা ভুলিয়া যাই তাই তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল। পূর্ণ স্থিতপ্রজ্ঞ এ জগতে কে হইয়াছিলেন তাহা এক ভগবানই জানেন। কিন্তু সেবাপরায়ণ স্থিতপ্রজ্ঞের দৃষ্টান্ত পুণ্ডলীকের মূর্তি সদা আমার চক্ষুর সামনে ভাসে, আর সেকথা আমি আপনাদের বলিয়াছিও।

এখানে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ পূর্ণ হইয়াছে। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ও শেষ হইয়াছে।

(নির্গুণ) সাংখ্য-বুদ্ধি+(সগুণ) যোগ-বুদ্ধি+(সাকার) স্থিতপ্রজ্ঞ



মিলিয়া

সম্পূর্ণ জীবন-শাস্ত্র

ইহা হইতে ব্রহ্মনির্বাণ তথা মোক্ষ ছাড়া আর কি ফলিত হইতে পারে?

রবিবার, ২৮-২-৩২

তৃতীয় অধ্যায়

(১১)

বন্ধুগণ,

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা সম্পূর্ণ জীবনশাস্ত্র দেখিয়াছি। তৃতীয় অধ্যায়ে এই জীবনশাস্ত্র স্পষ্ট করা হইয়াছে। প্রথমে তত্ত্বসমূহের বিচার করিয়াছি। এখন বিবরণে যাইতেছি। পূর্ব অধ্যায়ে কর্মযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইয়াছে। কর্মযোগে ফলত্যাগই গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। কর্ম-যোগে ফলত্যাগ রহিয়াছে কিন্তু ফললাভ হয় কি হয় না ইহাই প্রশ্ন। তৃতীয় অধ্যায় বলে, কর্মফল ত্যাগ করিলে কর্মযোগী অনন্তগুণ ফল পায়।

লক্ষ্মীর কাহিনী আমার মনে পড়িতেছে। তাঁহার স্বয়ম্বর ছিল। সমস্ত দেব-দানব বুকে আশা বাঁধিয়া আসিয়াছিল। তাঁহার পণের কথা লক্ষ্মী তখনও বলেন নাই। সভামণ্ডপে আসিয়া তিনি বলিলেন, "যে আমাকে চায় না তাকে মাল্যদান করব।" তাহারা সকলে আশালোলুপ ছিল। তবুও লক্ষ্মী নিস্পৃহ বর খুঁজিতে লাগিলেন। শেষনাগের উপর শান্তভাবে শায়িত বিষ্ণুর মূর্তির পর তাঁহার নজর পড়িল। তাঁহার গলায় মালা দিয়া আজ অবধি তিনি তাঁহার চরণসেবা করিতেছেন। 'যে চাহে না, রমা হয় তারই দাসী।' বিশেষত্ব এখানেই।

সাধারণ লোকে আপন ফলের চারিদিকে কণ্টক বেড়া লাগায়। অনন্ত-রূপে লভ্য ফল সে এভাবে খোয়ায়। সাংসারিক লোক অপার কর্ম করিয়া অল্প ফল পায়, আর কর্মযোগী সামান্যমাত্র করিয়া অনন্তগুণ পায়। এই পার্থক্য হয় ভাবনার পার্থক্য হেতু। টলস্টয় এক জায়গায় বলিয়াছেন, "লোকে যীশুখৃস্টের ত্যাগের প্রশংসা করে। কিন্তু এই যে সাংসারিক জীব এরা প্রত্যহ কত যে রক্ত শুকায়, কত যে কঠোর শ্রম করে তা কে বলবে! দু' দুটা গাধার বোঝা পিঠে নিয়ে সংসারী জীব চক্কর কাটছে; যীশুখৃস্ট অপেক্ষা তাদের কষ্ট বহুগুণ বেশী, আর বহুগুণ বেশী দুর্গতি। তার অর্ধেক কষ্টও যদি তারা ভগবানের জন্য করে তবে সত্যসত্যই তারা যীশু অপেক্ষা বড় হয়ে যাবে।"

সংসারী মানুষের তপস্যা যথার্থই বড়। কিন্তু সে তপস্যা করে তাহারা ক্ষুদ্র ফলের নিমিত্তে। যেমন ভাব তেমন লাভ। সুদামা চিঁড়া লইয়া ভগবানের কাছে গেলেন। মুষ্টিপ্রমাণ চিঁড়া। তার দাম খুব সম্ভব এক আধলাও নয়। কিন্তু সুদামার কাছে তাহা ছিল অমূল্য। তাহা অভিমন্ত্রিত ছিল। তাহার কণায় কণায় ভাব ভরতি ছিল। হইল-ই বা জিনিষ ক্ষুদ্র, মন্ত্রে উহার মূল্য, উহার সামর্থ্য বাড়িয়া যায়। ভাল, নোটের ওজন আর কতটুকু? নোট জ্বালাইলে এক ফোঁটা জল গরম হয় কিনা সন্দেহ। উহাতে মোহর অঙ্কিত থাকে। উহাতেই উহার দাম।

কর্মযোগেও এই সমস্ত বিশেষত্ব বর্তমান। কর্মকে নোট মনে করুন। মূল্য ভাবনারূপ মোহরের, কর্মরূপ কাগজের নয়। প্রকারান্তরে মূর্তিপূজার রহস্যের কথাই আমি এখানে বলিতেছি। মূর্তিপূজার কল্পনায় অশেষ সৌন্দর্য নিহিত। কার সাধ্য এই মূর্তি ভাঙে-চুরে। প্রথমে এই মূর্তি একটা টুকরাই ছিল। আমি তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলাম, আমার ভাবনা আরোপ করিলাম। ভাল, এই ভাবনাকে কেহ ভাঙিতে-চুরিতে পারে কি? পাথর ভাঙা-চুরা যায়, ভাবনা ভাঙা-চুরা যায় না। মূর্তি হইতে আমি যখন নিজ ভাবনা সরাইয়া লইব, কেবল তখনই তাহা পাথরে পর্যবসিত হইবে, আর তখনই কেবল তাহা ভাঙা-চুরা যাইবে।

কর্ম মানে পাথর বা কাগজের টুকরা। কাগজের টুকরায় মা আঁকা-বাঁকা দুই চারিটি ছত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। আর অপর কেহ সাজাইয়া-গুজাইয়া পঞ্চাশ লাইন লিখিয়া পাঠাইল। ওজন কোন্‌টির অধিক? মায়ের ঐ চার লাইনে যে ভাব রহিয়াছে, তাহা অমূল্য, পবিত্র। ঐ আজেবাজে তার তুল্য নয়। কর্মে আর্দ্রতা চাই। ভাব থাকা চাই। মজুরের কাজের আমরা হিসাব করি। আর বলি, "এত পয়সা হয়েছে, নাও।" কিন্তু দক্ষিণার বেলায় তাহা নয়। দক্ষিণা আর্দ্র হৃদয়ে দিতে হয়। দক্ষিণা কত দেওয়া হইল প্রশ্ন তাহা নয়। দক্ষিণা ভাবরসে সিক্ত কিনা, গুরুত্ব এখানেই। মনুস্মৃতিতে একটি মজার কথা আছে। এক শিষ্য গুরুগৃহে থাকিয়া পশু হইতে মানুষ হইয়াছিল। গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তখনকার দিনে আগেই কিছু লওয়া হইত না। বার বছরের শিক্ষাশেষে শিষ্যেরা যাহা ভাল লাগিত দিত।

মনু বলিয়াছেন, "দাও, গুরুকে দু'একটি ফুল, এক-আধখানা পাখা, এক জোড়া খড়ম বা জলভরা একটি কলস।" ইহা কিছু পরিহাস নহে। যাহা দেওয়ার, শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে দেওয়া চাই। ফুলের ওজন আর কত? কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডপ্রমাণ ভক্তির ওজন বিদ্যমান।

'একটি তুলসীদলে
তুললেন রুক্মিণী প্রভু গিরিধরে।'

সত্যভামার মনভর গহনায় সে কাজ হইল না। কিন্তু রুক্মিণীমাতা ভাব-ভক্তিভরা একটি তুলসীপত্র পাল্লায় নিক্ষেপ করিলেন ত সব কর্ম নিষ্পন্ন হইল। সে তুলসীপত্র অভিমন্ত্রিত ছিল। তখন আর তাহা সাধারণ ছিল না। কর্মযোগীর কর্মও তদ্রূপ।

মনে করুন, দুই ব্যক্তি গঙ্গাস্নানে গিয়াছে। তাহাদের একজন বলে, "লোকে গঙ্গা গঙ্গা বলে। তাতে আছে কি? দুইভাগ হাইড্রোজেন, এক ভাগ অক্সিজেন, এই দুই মিলাও ত হল গঙ্গা।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, "ভগবান বিষ্ণুর পদকমল হতে এ বের হয়েছে, শঙ্করের জটাজুটে এ বাস করছে, হাজারো ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি এর তীরে তপস্যা করেছে, অনন্ত পুণ্য কর্ম এর তীরে হয়েছে,—এমনি পবিত্র এই গঙ্গামাতা।" এইভাবে অভিভূত হইয়া সে স্নান করে। অক্সিজেন-হাইড্রোজেন মান্যকারী লোকও স্নান করে। দেহশুদ্ধিরূপ ফল উভয়েই পায়। কিন্তু ভক্ত দেহশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধিরূপ ফলও লাভ করে। গঙ্গাস্নানে গরুরও দেহশুদ্ধি হয়। গায়ের ময়লা দূর হয়। কিন্তু মনের ময়লা যাইবে কিরূপে? একের লাভ হইল দেহশুদ্ধিরূপ তুচ্ছ ফল। অপরে তদতিরিক্ত চিত্তশুদ্ধিরূপ অমূল্য ফলও পাইল।

স্নানের পরে যে সূর্যনমস্কার করে ব্যায়ামের ফল ত সে পায়ই। কিন্তু সে স্বাস্থ্যের জন্য নমস্কার করে না, করে উপাসনার জন্য। তাহাতে স্বাস্থ্য-লাভ ত তাহার হয়ই, অধিকন্তু বুদ্ধির প্রভাও বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্যের সাথে সাথেই সূর্যনারায়ণের কাছ হইতে সে স্ফূর্তি এবং প্রতিভাও লাভ করে।

একই কর্ম। কিন্তু ভাবনাভেদহেতু ব্যবধান হইয়া থাকে। পরমার্থী মানুষের কর্ম আত্ম-বিকাশক। সংসারী মানুষের কর্ম আত্ম-বন্ধক। কর্ম-

যোগী যদি কৃষক হয় তবে সে স্বধর্ম মনে করিয়া চাষ-বাস করিবে। তাহাতে তাহার উদর-পূর্তি অবশ্যই হইবে। কিন্তু পেটে খাইতে পাইবে বলিয়াই যে সে কাজ করে তাহা নয়। চাষ-আবাদ করিতে হইবে বলিয়া আহারকে সে সাধন জ্ঞান করে। স্বধর্ম তাহার সাধ্য, আর আহার তাহার সাধন। কিন্তু অপর কোন কৃষকের কাছে উদর-পূর্তি করা হইতেছে সাধ্য, আর ক্ষেতিরূপ স্বধর্ম হইতেছে সাধন। এইরূপই উল্টাপাল্টা ব্যাপার।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতে গিয়া রহস্য করিয়া বলা হইয়াছে—অন্য লোক যখন জাগ্রত থাকে, কর্মযোগী তখন নিদ্রা যায়॥ অন্য লোক যখন নিদ্রা যায়, তখন কর্মযোগী জাগ্রত থাকে। আমরা জাগিয়া থাকি পেটের অন্ন আহরণের নিমিত্তে। আর এক মুহূর্ত বিনা কাজে না যায় তার জন্য কর্মযোগী জাগিয়া থাকে। না খাইলে নয় তাই সে খায়। না দিলে চলে না তাই সে উদর গহবরে নিক্ষেপ করে। আহারে সংসারীদের আনন্দ, যোগীদের নিরানন্দ। তাই রসনা তৃপ্তির জন্য আহার করে না। সংযমে চলে। একের রাত্রি, অপরের দিন। একের দিন, অপরের রাত্রি। অর্থাৎ একের কাছে যাহা দুঃখ অপরের কাছে তাহা সুখ। সংসারী ও কর্মযোগী উভয়েই সেই কর্ম করে। কিন্তু কর্মযোগী ফলাসক্তি ছাড়িয়া কর্মেতেই আনন্দ পায়। যোগী সংসারীর মতই খায় ও ঘুমায়। কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাহার ভাবনা পৃথক। তাই গীতার ষোল অধ্যায় সামনে পড়িয়া থাকিলেও প্রারম্ভেই স্থিতপ্রজ্ঞের সংযম মূর্তি খাড়া করা হইয়াছে। সংসারী মানুষ ও কর্মযোগী এই দুইয়ের কর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে। ধরুন, কর্মযোগী গো-রক্ষার কাজ করিতেছে। কোন্ দৃষ্টিতে তাহা সে করিবে? গো-সেবা করিলে সমাজ প্রচুর দুধ পাইবে। গাইকে উপলক্ষ করিয়া মনুষ্যেতর পশুজগতের সহিত তাহার প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, এই ভাব হইতে সে সেবা করিবে। বেতন পাইবে বলিয়া নয়। বেতন ত পাইবেই। কিন্তু আনন্দ এই দিব্য ভাবনাতে।

কর্মযোগীর কর্ম তাহাকে এই বিশ্বের সহিত সমরস করিয়া দেয়। তুলসীতে জল না দিয়া খাইব না। ইহা বনস্পতি জগতের সহিত প্রেম-সম্বন্ধ সৃষ্টি করা। তুলসীকে অনাহারে রাখিয়া আমি আগে খাই কি করিয়া?

এইরূপে গো-জাতির সহিত একরূপতা, বনস্পতির সহিত একরূপতা সাধিতে সাধিতে সমস্ত বিশ্বের সহিত আমাদের একরূপতা অনুভব করিতে হইবে। ভারতযুদ্ধে সন্ধ্যা হইতেই সকলে সায়ং-সন্ধ্যা ইত্যাদি করিতে যাইত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথের ঘোড়া খুলিতেন, জল খাওয়াইতেন, গা দলাইমলাই করিয়া দিতেন, শল্য তুলিয়া ফেলিতেন। সে সেবায় ভগবানের কতই না আনন্দ! উহার বর্ণনায় কবির ক্লান্তি নাই। নিজ পীতাম্বরে দানা-ভূষি লইয়া ঘোড়াকে দিতেছেন এতাদৃশ পার্থসারথির চিত্র চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করুন আর কর্মযোগের আনন্দের কল্পনা করুন। প্রত্যেক কর্ম যেন আধ্যাত্মিক, উচ্চতর পারমার্থিক কর্ম। খাদি কর্মের কথা ধরুন। কাঁধে গাঁট লইয়া খাদি ফেরি করিতে বিরক্তি লাগে না কি? না, লাগে না। আধ পেট খাইতে পায় না এরূপ কোটি কোটি ভাইবোন যাহারা দেশে রহিয়াছে তাহাদের এক মুঠো অন্ন দিতেছি এইভাবে সে মশগুল থাকে। একগজ প্রমাণ খাদি বিক্রয়রূপ কার্য দ্বারা সে সমস্ত দরিদ্রনারায়ণের সহিত যুক্ত হইয়া যায়।

(১২)

নিষ্কাম কর্মযোগের সামর্থ্য অদ্ভুত। এইরূপ কর্ম হইতে ব্যক্তি ও সমাজের অশেষ কল্যাণ হয়। স্বধর্মপরায়ণ কর্মযোগীর শরীর-যাত্রা ত নির্বাহ হয়ই। অধিকন্তু নিরন্তর কর্মরত থাকে বলিয়া তাহার শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকে। ফলে, যে সমাজে সে বাস করে সে সমাজের যোগ-ক্ষেম সুন্দররূপে চলে। বেশী পয়সা পাওয়া যাইবে বলিয়া কর্মযোগী চাষী আফিং-এর বা তামাকের চাষ করে না। স্বভাবতই তাহার সব কর্ম সমাজের পক্ষে হিতকর হইবে। আমি যে ব্যবসায় করি তাহা সমাজের হিতার্থে—যে ব্যাপারী এরূপ মনে করে সে বিদেশী কাপড় বিক্রয় করিবে না। তাহার ব্যবসায় সমাজোপকারক হইবে। আপন ভুলিয়া আশপাশের সমাজের সহিত সমরস হইতে প্রযত্নশীল কর্মযোগী যে সমাজে জন্মে সে সমাজে সুব্যবস্থা, সমৃদ্ধি ও প্রসন্নতা বিরাজ করে।

কর্মযোগীর কর্মহেতু তাহার শরীর-যাত্রা নির্বাহ হয়, তাহার দেহ ও বুদ্ধি সতেজ থাকে। সমাজেরও তাহাতে কল্যাণ হয়। এই দুই ফল

ছাড়া, চিত্তশুদ্ধিরূপ মহান ফল তাহার লাভ হয়। বলা হইয়াছে, 'কর্মণা শুদ্ধিঃ।' কর্ম চিত্তশুদ্ধির সাধন। কিন্তু তাহা সকলে যাহা করে সে মামুলী কর্ম নহে। কর্মযোগী অভিমন্ত্রিত কর্ম করে। আর তাহা হইতে তাহার চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। মহাভারতে তুলাধার বৈশ্যের কথা আছে। জাজলি নামক এক ব্রাহ্মণ জ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য তুলাধারের কাছে যায়। তাহাকে দেখিয়া তুলাধার বলে, "ভাই, এ পাল্লার দাঁড়ি সব সময় ঠিক রাখতে হয়।" এই বাহ্য কর্ম করিতে করিতে তুলাধারের মনও সরল হইয়া গিয়াছিল। শিশু আসে, জোয়ান আসে, দাঁড়ি একরূপই থাকে। উঁচু নীচু তাহা হয় না। কর্মের প্রভাব মনের উপর পড়ে। কর্মযোগীর কর্ম একরূপ জপ। উহা হইতে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয়। আর তখন নির্মলচিত্তে জ্ঞানের প্রতিবিম্ব পড়ে। নিজের বিভিন্ন কর্ম হইতে কর্মযোগী অন্তে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। পাল্লার দাঁড়ি হইতে তুলাধার সমবৃত্তি লাভ করিয়াছিল। সেনা নাপিত চুল কাটিত। অন্যের মাথার ময়লা দূর করিতে করিতে সেনা নাপিতের জ্ঞানের উদয় হইল, "অন্যের মাথার ময়লা দূর করি। কিন্তু নিজ মাথার নিজ বুদ্ধির ময়লা দূর করি কি?" ঐ কর্ম হইতে তাহার মনে এরূপ আধ্যাত্মিক ভাষার বিকাশ হয়। ক্ষেতের আগাছা তুলিতে তুলিতে কর্মযোগীর মনে বাসনা-বিকার-রূপ আগাছা তোলার বুদ্ধির উদ্রেক হয়। মাটি দলিয়া গোরা কুমার সমাজকে পাকা হাঁড়ি দেয়। এই ক্রিয়া হইতে আপন জীবন-হাঁড়ি পাকা করিয়া লওয়ার সঙ্কেত সে পায়। থাবড় দিয়া 'মটকা কাঁচা কি পাকা' পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি সাধুদের পরীক্ষক বনিয়া যান। কর্মযোগী যে কর্ম করে সে কর্মের ভাষা হইতে সে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। কর্ম নয় ত তাহা তাহাদের অধ্যাত্মশালা। তাহাদের সেই কর্ম উপাসনাময় সেবাময় হইয়া থাকে। বাহ্যত ব্যবহারিক, কিন্তু মূলত তাহা আধ্যাত্মিক।

কর্মযোগীর কর্ম হইতে আর এক উত্তম ফল লাভ হয় : তাহা হইতে সমাজ আদর্শ লাভ করে। সমাজে কেহ জন্মে আগে, কেহ জন্মে পরে। এই ব্যবধান ত আছেই। আগে যে জন্মে তাহার দায় হইতেছে পরে যে জন্মে তাহার সম্মুখে উদাহরণ সংস্থাপন করা। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে, মা-বাপ ছেলেমেয়ের কাছে, নেতা অনুযায়ীর কাছে, গুরু শিষ্যের কাছে নিজ

আচরণ দ্বারা আদর্শ স্থাপন করিবে। ইহা তাহাদের কর্তব্য। কর্মযোগী ছাড়া আর কে এইরূপ উদাহরণ উপস্থিত করিতে পারে?

কর্মেই কর্মযোগীর আনন্দ। তাই সে সতত কর্ম করে। তার ফলে সমাজে ছল-চাতুরী বাড়িতে পায় না। কর্মযোগী স্বয়ং-তৃপ্ত। তবু কর্ম না করিয়া তাহার নিস্তার নাই। তুকারাম বলেন, "ভজনে ভগবান মিলেছে বলে কি ভজন ছাড়ব? ভজন ত এখন আমার সহজ ধর্ম হয়ে গেছে।"

গোড়ায় মিলেছে সাধুসঙ্গ। তুকা হয়েছে পান্ডুরঙ্গ।
ভজনের নেশা টুট্‌বে কেন? মূল স্বভাব ছুটবে কেন?

কর্মের সিঁড়ি আরোহণ করিয়া শিখরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া কর্মযোগী কর্ম ছাড়ে না। তাহা ছাড়িতে পারে না। তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ ঐ সব কর্মে এমনিই অভ্যস্ত হইয়া যায়। এইরূপে সে স্বধর্মকর্মরূপ সেবার সিঁড়ির গুরুত্ব সমাজের কাছে প্রতিপাদন করিতে থাকে।

সমাজ হইতে ছল দূর করাই এক মস্ত কাজ। ছলে সমাজ ডুবে। জ্ঞানী যদি নিশ্চিন্ত বসিয়া যায়, তবে তাহার দেখাদেখি অপরেও হাতের উপর হাত রাখিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া যাইবে। জ্ঞানী নিত্যতৃপ্ত বলিয়া আভ্যন্তরীণ সুখে তন্ময় হইয়া শান্ত থাকিবে, কিন্তু অপরে মনে মনে দুঃখী হইয়াও কর্মহীন হইবে। এক অন্তরে তৃপ্ত বলিয়া শান্ত অপরে মনে মনে হাহাকার করিয়াও নিশ্চেষ্ট। এই অবস্থা ভয়ানক। ইহাতে কপটতা বৃদ্ধি পায়। অতএব সাধুপুরুষ মাত্রেই শিখরে পৌঁছিয়াও সাধনার পাল্লা বড় সতর্কতার সহিত ধরিয়া থাকেন, আমরণ স্বকর্ম করিতে থাকেন। শিশুর খেলায় মা রস পান। তাহাও সৃজন এই ভাব হইতে তাহাদের খেলায় যোগ দিয়া তাহাতে তিনি তাহাদের রুচি জন্মান। মা যোগ না দিলে শিশুরা তাহাতে মজা পায় না। কর্মযোগী তৃপ্ত হইয়া কর্ম ত্যাগ করে ত অন্যে অতৃপ্ত হইয়াও কর্মত্যাগ করিবে। কিন্তু মনে মনে থাকিবে উপাসী ও অসুখী।

অতএব কর্মযোগী সাধারণ লোকের মতই কর্ম করিয়া যায়। সে একথা মনে করে না যে, আমি কিছু বিশেষ মানুষ। অন্যের অপেক্ষা অনন্ত-গুণ বাহিরের পরিশ্রম সে করে। অমুক কর্ম পারমার্থিক এরূপ মার্কা মারার দরকার নাই। কর্ম জাহির করা নিষ্প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারী

হও ত নিজ কর্মে অপর অপেক্ষা শতগুণ উৎসাহ প্রদর্শন কর। আহার কম মিলিলেও তিনগুণ কাম দাও। তোমার হাত সমাজের অধিক কাজ করুক। তোমার ব্রহ্মচর্য কাজে ফুটিয়া উঠুক। চন্দনের সুবাস ছড়াইয়া পড়ুক।

সারাংশ, কর্মযোগী ফলের বাসনা ছাড়িলে অনন্ত ফল পাইবে। তাহার শরীর-যাত্রা নির্বাহ হইবে। শরীর ও বুদ্ধি সতেজ হইবে। যে সমাজে সে বিচরণ করে সে সমাজ সুখী হইবে, চিত্তশুদ্ধি হইয়া তাহার জ্ঞানলাভ হইবে এবং সমাজের ছলচাতুরি দূর হইয়া জীবনের পবিত্র আদর্শ দেখা দিবে। এইরূপই কর্মযোগের অনুভবসিদ্ধ মহিমা।

(১৩)

অন্যের তুলনায় কর্মযোগী উৎকৃষ্ট রীতিতে কর্ম করিবে। কর্মই উপাসনা। কর্মই পূজা-বিধান। ভগবানের আমি পূজা করিলাম। পূজার নৈবেদ্য প্রসাদরূপে পাইলাম। কিন্তু ঐ নৈবেদ্য কি সেই পূজার ফল? নৈবেদ্যের জন্য যে পূজা করিবে প্রসাদের ভাগ ত সে আঁচরে পাইবেই। কিন্তু কর্মযোগী পূজা-কর্ম হইতে পরমেশ্বরদর্শনরূপ ফল আকাঙ্ক্ষা করে। নৈবেদ্য পাওয়া যাইবে এরূপ তুচ্ছ মূল্য সে নিজ কর্মের ধার্য করে না। নিজের কর্মের মূল্য কম ধরিতে সে রাজী নহে। সে নিজ কাজ স্থূল মাপে ওজন করে না। স্থূলে যাহার দৃষ্টি তাহার স্থূল ফল লাভ হয়। চাষ-বাসের একটি প্রবাদে বলে, "গভীরে বোন, কিন্তু ভিজা বোন।" কেবল গভীরে বুনিলে চলিবে না, নীচে আর্দ্রতা থাকা চাই। গভীরতার সহিত আর্দ্রতার সংযোগ হইলে শস্যের দানা গুটির মত বড় হইবে। অতএব কর্ম গভীর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। তাহা ছাড়া ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরার্পণরূপ সিক্ততা থাকা চাই। কর্মযোগী নিবিষ্ট কর্ম করিয়া ঈশ্বরার্পণ করে।

পরমার্থ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এক ভ্রান্তভাব জন্মিয়াছে। লোকে মনে করে পরমার্থী লোকের হাত-পা নাড়ার, কাজকর্ম করার দরকার নাই। বলা হয়, যে লোক চাষ করে, খাদি বোনে সে আবার কিরূপ পরমার্থী? একথা কিন্তু লোকে বলে না, যে খায় সে আবার কিরূপ পরমার্থী। কর্ম-

যোগীর পরমেশ্বর ঘোড়া দলাইমলাই করিতে এক পায়ে খাড়া। রাজসূয় যজ্ঞে গোবরজল দিয়া উচ্ছিষ্ট পরিস্কার করিতে রত। সে বনে গাই চরায়। দ্বারকার রাজা কখনও গোকুলে যায় ত ঠুমক ঠুমক চলিতে চলিতে বাঁশী বাজায়, গাই চরায়। সাধুরা এরূপ অশ্ব-পরিচর্যাকারী, গো-চারণ-কারী, রথ-পরিচালনকারী, গোময়ে উচ্ছিষ্ট লেপনকারী পরমেশ্বর খাড়া করিয়াছেন। আর তাঁহারা নিজেরা, কেহ দরজীর কাজ করিয়া ত কেহ কুমারের, কেহ তাঁতির ত কেহ মালীর, কেহ ধান-ভানুনীর ত কেহ বেনের, কেহ নাপিতের ত কেহ মরা জন্তুর চর্ম উন্মোচনকারী চামারের কাজ করিতে করিতে মুক্ত পদবী প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

এইরূপ যে দিব্য কর্মযোগের ব্রত, তাহা হইতে মানুষে দুই কারণে চ্যুত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের বিশেষ স্বভাবের কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। "ইহা চাই, উহা চাই না" এই দ্বন্দ্বের ফেরে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ অনুক্ষণ আবদ্ধ। যাহা কাম্য তার জন্য মনে রাগ, আর যাহা কাম্য নয় তার প্রতি মনে দ্বেষ জন্মে। রাগদ্বেষ এইভাবে মানুষকে কুরিয়া কুরিয়া খায়। কর্মযোগ কতই না সুন্দর, রমণীয় আর অনন্ত ফলদায়ী! কিন্তু এই সব কাম ক্রোধ, "ইহা লও, উহা ছাড়" এই দ্বন্দ্ব আমাদের পেছনে লাগিয়া থাকে, দিনরাত আমাদের অনুসরণ করে। ইহাদের সংস্রব ত্যাগ কর—সতর্কতার এই ঘণ্টা এই অধ্যায়ের অন্তে ভগবান বাজাইতেছেন। কর্মযোগীকে স্থিত-প্রজ্ঞের মত সংযমের মূর্তি হইতে হইবে।

রবিবার, ৬-৩-৩২

চতুর্থ অধ্যায়

(১৪)

বন্ধুগণ,

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা নিষ্কাম কর্মযোগের বিবেচনা করিয়াছি। স্বধর্ম ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা যদি অবান্তর ধর্ম আশ্রয় করি তবে নিষ্কামতারূপ ফল যে অসাধ্য একথা যেন না ভুলি। ব্যাপারীর স্বধর্ম স্বদেশী মাল বিক্রয় করা। কিন্তু এই স্বধর্ম ছাড়িয়া সে যখন সাত সমুদ্র পারের বিদেশী মাল বিক্রয় করে তখন তাহার মনে অধিক লাভের কথাই থাকে। তবে সেই কর্মে নিষ্কামতা কোথা হইতে আসিবে? অতএব কর্মকে নিষ্কাম করার জন্য স্বধর্মাচরণের একান্ত আবশ্যকতা রহিয়াছে। পরন্তু এই স্বধর্মাচরণও 'সকাম' হইতে পারে। অহিংসার কথাই ধরিতেছি। অহিংসার উপাসকের কাছে হিংসা বর্জনীয়, কিন্তু ইহা সম্ভব যে বাহ্যত অহিংসক হইয়াও বস্তুত সে হিংসাময়; কারণ হিংসা মনের এক ধর্ম। বাহ্য হিংসা-কর্ম না করিলেই যে মন অহিংস হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। তলোয়ার হাতে লইলে হিংসাবৃত্তির প্রকাশ অবশ্যই হয়। কিন্তু তলোয়ার ত্যাগ করিলে মানুষ অহিংসাময় হইল তাহা নয়। স্বধর্মাচরণের বেলায়ও ঠিক তাই। নিষ্কামতার জন্য পরধর্ম হইতে ত বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু তাহা নিষ্কামতার আরম্ভ মাত্র। ততটুকুতেই সাধ্য মিলিল তাহা নহে।

নিষ্কামতা মনের ধর্ম। মনের এই ধর্মের উৎপত্তির পক্ষে কেবল স্বধর্মাচরণরূপ সাধনই পর্যাপ্ত নহে। অন্য সাধনের আশ্রয়ও লইতে হয়। কেবল তেল্‌-পলিতায় আলো জ্বলে না। তার জন্য জ্যোতির দরকার। জ্যোতি হইলেই না অন্ধকার দূর হইবে। সেই জ্যোতি প্রজ্বালনের উপায়? তার জন্য মানসিক সংশোধন আবশ্যক। আত্ম-পরীক্ষার দ্বারা চিত্তের মলিনতা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তে ভগবান এই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। তাহা হইতে চতুর্থ অধ্যায়ের উৎপত্তি। গীতায় কর্ম শব্দ স্বধর্ম অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। আমরা আহার করি, পান করি,

নিদ্রা যাই, এই সবই কর্ম। কিন্তু গীতার কর্ম শব্দে এই সব ক্রিয়া সূচিত হয় না। কর্ম অর্থে স্বধর্মাচরণ বুঝায়। কিন্তু এই স্বধর্মাচরণরূপ কর্ম করার পরেও নিষ্কামতা প্রাপ্তির জন্য আরও এক গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর সহায়তা আবশ্যক। তাহা হইতেছে কাম ক্রোধ জয় করা। চিত্ত গঙ্গাজলের মত নির্মল ও প্রশান্ত না হইলে নিষ্কামতা লাভ হয় না। এইরূপ চিত্ত-সংশোধনের নিমিত্ত যে সব কর্ম করা হয় গীতা তাহাকে বিকর্ম সংজ্ঞা দিয়াছে। কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম এই তিন শব্দের গুরুত্ব এই চতুর্থ অধ্যায়ে খুব বেশী। কর্ম হইতেছে স্বধর্মাচরণের বাহ্য স্থূল ক্রিয়া। এই বাহ্য কর্মে চিত্তসংযোগ করাকে বিকর্ম কহে। বাহ্যত আমি কাহাকেও নমস্কার করি। কিন্তু ঐ বাহ্য শির-নত-করারূপ ক্রিয়ার সহিত যদি মনও নত না হয় তবে বাহ্য ক্রিয়া নিরর্থক। ভিতর বাহির এক হওয়া চাই। অনুক্ষণ জলধারা দিয়া আমি শিবলিঙ্গের অভিষেক করিতে পারি। ইহা বাহ্য ক্রিয়া। পরন্তু এই জলধারার সহিত যদি মানসিক চিন্তার ধারা অখণ্ড বহিতে না থাকে তবে ঐ অভিষেকের মূল্য কি? সে স্থলে সম্মুখের ঐ শিবলিঙ্গও পাথর আর আমিও পাথর। পাথরের সামনে পাথর উপবিষ্ট—এই হইবে তার অর্থ। নিষ্কাম কর্ম তখনই সিদ্ধ হয় যখন বাহ্য কর্মের সহিত চিত্তশুদ্ধিরূপ আন্তরিক কর্ম যুক্ত হয়।

'নিষ্কাম কর্ম' এই শব্দ প্রয়োগে 'কর্ম' এই পদ অপেক্ষা 'নিষ্কাম' এই পদের গুরুত্ব অধিক। 'অহিংস-অসহযোগ' শব্দ যোজনায় যেমন 'অসহযোগ' অপেক্ষা 'অহিংস' বিশেষণেরই অধিক মহত্ত্ব, ইহাও তদ্রূপ। অহিংসা বাদ দিয়া যদি কেবল অসহযোগ কর তবে তাহা ভয়ঙ্কর জিনিষ হইতে পারে, তদ্রূপ স্বধর্মাচরণরূপ কর্ম করিতে করিতে মনের বিকর্ম যদি তাহাতে যুক্ত না হয় তবে বুঝিতে হইবে তাহা মিথ্যাচার।

আজ যাহারা সার্বজনিক সেবা করিতেছে তাহারা স্বধর্মাচরণ করিতেছে। লোক যেখানে গরীব ও বিপন্ন সেখানে সেবা করিয়া তাহাদের সুখী করাই প্রবাহ-প্রাপ্ত ধর্ম, কিন্তু সার্বজনিক সেবকদের সকলেই কর্মযোগী এরূপ যেন মনে না করা হয়। লোকসেবা করিতে গিয়া মনে যদি শুদ্ধ ভাবনা না থাকে তবে সে লোকসেবা ভয়ঙ্কর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিজ

আত্মীয়-স্বজনের সেবা করিতে গিয়া আমরা যতটা অহঙ্কার, যতটা দ্বেষ-মৎসর, যতটা স্বার্থ আদি বিকার সৃষ্টি করি লোকসেবাতেও আমরা ততটাই করি। তার উদাহরণ আজিকার লোকসেবা প্রতিষ্ঠানের বাহুল্য হইতে মিলে।

(১৫)

কর্মের সহিত মনের মিলন হওয়া চাই। কর্মের সহিত মনের এই যে সহযোগ ইহাকেই গীতা বিকর্ম বলে। বাহিরের কর্ম সাধারণ কর্ম। আর আন্তরিক এই কর্ম বিশেষ কর্ম। এই বিশেষ কর্ম নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। চতুর্থ অধ্যায়ে উদাহরণ স্বরূপ বিকর্মের এরূপ অনেক রূপের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে উহার বিস্তার করা হইয়াছে। এই বিশেষ কর্ম—এই মানসিক অনুসন্ধান—যখন আমরা যোগ করিব তখনই কেবল উহাতে নিষ্কামতার জ্যোতি ফুটিবে। কর্মের সহিত যখন বিকর্মের মিলন হয় তখন আস্তে আস্তে নিষ্কামতা রোমে রোমে পরিব্যাপ্ত হয়। শরীর ও মন এই দুই যদি পৃথক পৃথক বস্তু হয় তবে এই দুইয়ের সাধনও পৃথক পৃথক হইবে। এই দুইয়ের মিলনে সাধ্য আমাদের করায়ত্ত হয়। মন এক দিকে আর শরীর আর এক দিকে যাহাতে না যায় তাই শাস্ত্রকারেরা দ্বিবিধ মার্গের কথা বলিয়াছেন। ভক্তিযোগে বাহিরে তপ ও অন্তরে জপের নির্দেশ আছে। উপবাসাদি বাহ্য তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে যদি ভিতরে মানসিক জপ না চলে তবে সে তপ বৃথা। যে ভাবনা হইতে তপ করিতেছি সে ভাবনা অন্তরে জ্বলিতে থাকা চাই। বস্তুত উপবাস শব্দের অর্থই ভগবানের পাশে উপবেশন। চিত্ত পরমেশ্বরের কাছে থাকুক এই উদ্দেশ্যে বাহ্য ভোগের দরজা বন্ধ করা চাই। কিন্তু বাহিরের ভোগ বর্জন করিয়া মনে যদি ভগবানের চিন্তা না আসে তবে সেই বাহ্য উপবাসের মূল্য কি? ঈশ্বর চিন্তা না করিয়া যদি আহার-পানের কথাই চিন্তা করিলাম তবে তাহা আরও অধিক ভয়ঙ্কর ভোজন হইল। মনে মনে এই যে ভোজন, বিষয় চিন্তন, ইহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর বস্তু আর নাই। তন্ত্রের সহিত মন্ত্র থাকা চাই। কেবল বাহ্য তন্ত্রের কোন মূল্য নাই। কেবল কর্মহীন মন্ত্রেরও মূল্য নাই। হাত

দিয়া যেমন হৃদয় দিয়াও তেমন সেবা করা চাই। তবেই না হাতের কাছ হইতে খাঁটি সেবা পাওয়া যাইবে।

বাহ্যকর্মে হৃদয়ের আর্দ্রতা যদি না থাকে তবে সেই স্বধর্মাচরণ শুষ্ক থাকিয়া যাইবে। তাহাতে নিষ্কামতার ফুল ফল ধরিবে না। ধরুন, কোন রোগীর শুশ্রূষা আরম্ভ করিয়াছি। ঐ সেবা কার্যের সহিত যদি কোমল দয়াভাব যুক্ত না হয় তবে ঐ রোগী-সেবা নিরস ও বিরক্তিকর মনে হইবে। তাহা এক বোঝাস্বরূপ হইবে। রোগীর কাছেও সেই সেবা ভারি মনে হইবে। ঐ শুশ্রূষায় যদি মনের সহযোগ না থাকে তবে সেই সেবা হইতে অহঙ্কার জন্মিবে। আজ তাহার কাজ করিলাম, প্রয়োজনমত সে আমার কাজ করিবে; লোকে আমার গৌরব করিবে ইত্যাদি ভাব মনে জন্মিবে। অথবা অতিষ্ঠ হইয়া বলিব এত সেবা করিতেছি তবুও সে খিটখিট করে। এমনিই রোগী খিটখিটে হয়। তাহার এই খিটখিটে স্বভাবে সেবাভাবরহিত সেবক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে।

কর্মের সহিত আন্তরিক ভাবের যখন মিলন হয় তখন তাহা আর কিছু হইয়া যায়। তেল ও পলিতার সহিত জ্যোতির মিলনে আলোর উৎপত্তি হয়। কর্মের সহিত বিকর্মের মিলনে নিষ্কামতা আসে। বারুদে বাতির সংযোগ হইয়াছে কি বিস্ফোরণ। ঐ বারুদ হইতে শক্তি উৎপন্ন হয়। কর্ম বস্তুটা যেন বন্দুকে বারুদের মত। উহাতে বিকর্মের বাতি বা আগুন লাগিয়াছে কি কর্ম ফতে। তাহাতে যতক্ষণ বিকর্মের মিলন না হয় ততক্ষণ তাহা জড়। তাহা চেতনা-হীন। বিকর্মের ফুল্‌কি পড়া মাত্রই তাহাতে বর্ণনাতীত সামর্থ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। পকেটে এক চিমটি বারুদ নিস্তেজ পড়িয়া আছে বা হাতে তাহা নাচাইতেছেন। কিন্তু উহাতে আগুনের সংযোগ হইয়াছে কি শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বধর্মের অনন্ত শক্তিও তেমন গুপ্ত থাকে। তাহাতে বিকর্মের সংযোগ করুন, দেখিবেন উহাতে কিদৃশ ভাঙ্গাগড়া সুরু হইয়া গিয়াছে। তাহার স্ফুরণে অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ আদি ভস্ম হইয়া যাইবে আর তার ফলে সেই পরমজ্ঞানের উদয় হইবে।

কর্ম ঐ জ্ঞানের পলিতা। কাঠের বড় একটা কুঁদো পড়িয়া আছে। তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিন। তাহা জ্বলন্ত অঙ্গার হইয়া যাইবে। ঐ

কাঠ আর ঐ আগুন দুইয়ে কত ব্যবধান। কিন্তু ঐ কাঠেরই ত আগুন। কর্মে বিকর্ম ঢালিলে কর্ম দিব্য হইতে থাকে। সন্তানের পিঠে মা হাত বুলান। একই পিঠ। মা যেমন তেমন ভাবে একবার হাত ফিরাইলেন। কিন্তু ঐ তুচ্ছ ক্রিয়াতে মা ও সন্তানের মনে যে ভাব খেলিয়া গেল তার বর্ণনা করিবে কে? এতটা লম্বা-চওড়া পিঠে এত ওজনের কোমল হাত বুলাইলে অতটা আনন্দ সৃষ্টি হইবে এই হিসাব যদি কেহ করিতে বসে ত তাহা হইবে পরিহাস। হাত-বুলানরূপ ঐ কাজ নেহাত তুচ্ছ। কিন্তু তাহাতে ঢালা হইয়াছে মায়ের হৃদয়। বিকর্ম ঢালা হইয়াছে বলিয়াই না ঐ আনন্দ! তুলসী-রামায়ণে একটি প্রসঙ্গ আছে। বানরেরা রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তাহারা জখম হইয়াছে। গা হইতে রক্ত ঝরিতেছে। কিন্তু প্রভু রামচন্দ্রের একটি মাত্র দৃষ্টিপাতে বানরদের যাতনা কোথায় দূর হইয়া গেল! ধরুন, কোন লোক রামের সেই সময়কার চোখের ও চাউনির ফটো লইয়াছে। আর ততটা চক্ষু বিস্তার করিয়া কাহারও দিকে তাকাইয়াছে। ভাল, তাহার প্রভাব কি তাদৃশ হইবে? এইরূপ চেষ্টা হাস্যাস্পদ।

কর্মের সহিত যখন বিকর্মের জুড়ি মিলে তখন শক্তির স্ফুরণ হয়। আর তাহা হইতে অকর্ম আসে। কাঠ পুড়িয়া ছাই হয়। প্রথমে ছিল এত বড় একখণ্ড কাঠ, কিন্তু হইয়াছে তাহা নিস্তেজ ছাই! যেমন ইচ্ছা হাতে লউন, আর গায়ে মাখুন। কর্মে বিকর্মের জ্যোতি স্পর্শ হইলে অকর্ম হয়। কোথায় কাঠ আর কোথায় ছাই! কঃ কেন সম্বন্ধঃ! উহাদের গুণ-ধর্মে এখন আদৌ সমতা নাই। কিন্তু সেই কাঠেরই যে এই ছাই তাহাতে সংশয় নাই।

কর্মে বিকর্ম জুড়িলে অকর্ম হয়, একথার অর্থ কি? অর্থ এই যে, কর্ম যে করিয়াছি তাহা মনেই হয় না। ঐ কর্মের বোঝা অনুভব হয় না। করিয়াও অকর্তা। গীতা বলে, মারিয়াও তুমি মার না। মা পুত্রকে মারেন। ভাল, তুমি মারিয়া দেখ ত। ছেলে তোমার মারধর সহিবে না। মা মারেন, তবুও তাঁহার আঁচলেই সে মুখ লুকায়; কারণ মার বাহ্য কর্মে চিত্তশুদ্ধি আছে। মায়ের প্রহার নিষ্কাম। ঐ কর্মে তাঁহার স্বার্থ নাই। বিকর্মের দরুন, চিত্তশুদ্ধি হেতু কর্মের কর্মত্ব উবিয়া যায়। রামের সেই চাউনি

আন্তরিক বিকর্মের দরুন নিছক প্রেম-সুধা-সাগর হইয়া গিয়াছিল। ঐ কর্মে রামের কোন শ্রম হয় নাই। চিত্তশুদ্ধি হইতে কৃত কর্ম নির্লেপ হয়। তার পাপ-পুণ্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

অন্যথায় কর্মের কতই না বোঝা আমাদের বুদ্ধির উপর হৃদয়ের উপর চাপিত। কাল সব রাজনৈতিক বন্দীদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এই কথা যদি আজ দুইটায় রটে ত দেখিতে পাইবেন কেমন হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে, চারিদিকে কেমন শোরগোল আরম্ভ হইয়াছে। কর্মের ভালমন্দের জন্য আমরা ব্যগ্র থাকি। কর্ম চারিদিক হইতে আমাদের ঘিরিয়া ধরে। কর্ম যেন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। সমুদ্রের প্রবাহ সজোরে ভূমিতে প্রবেশ করিয়া যেমন খাড়ি সৃষ্টি করে, কর্মের জোয়ার চিত্তে প্রবেশ করিয়া তেমনি ক্ষোভ সৃষ্টি করে। সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব জন্মে। সকল শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। কর্ম হইয়াছে আর চলিয়াও গিয়াছে। তাহা হইলেও উহার রেশ থাকিয়া যায়। কর্ম চিত্তের উপর আসর জমাইয়া বসে। আর তার নিদ্রা লোপ পায়।

কিন্তু কর্মে বিকর্ম জুড়িয়া দিন। দেখিবেন যত কর্মই করুন না কেন ক্লান্তি নাই। মন তখন ধ্রুবের মত শান্ত, স্থির আর তেজোময়। কর্মে বিকর্ম ঢালিলে উহা অকর্ম হইয়া যায়। কর্ম করিয়া যেন তাহা পুছিয়া ফেলা হইয়াছে।

(১৬)

এই কর্মের অকর্ম কিরূপে হয়? এই কলা কাহার কাছে পাওয়া যাইবে? সাধুদের কাছে। এই অধ্যায়ের অন্তে ভগবান বলিতেছেন, "সাধুদের কাছে গিয়ে বস ও শিক্ষা গ্রহণ কর।" কর্ম কিরূপে অকর্ম হয় তাহা বর্ণনা করিতে ভাষা নিঃশেষ হইয়া যায়। ইহার ঠিক ধারণা করিতে হইলে সাধুদের কাছে যাইতে হইবে। পরমেশ্বরের বর্ণনা এই নয় কি :

"শান্তাকারং ভুজগশয়নম্।"

পরমেশ্বর সহস্র-ফণা শেষনাগে শায়িত হইয়াও শান্ত। তদ্রূপ সাধুরা সহস্র কর্ম করিলেও মানস সরোবরে রতিভর ক্ষোভতরঙ্গ উঠিতে দেন না। সাধু সংসর্গ বিনা এই বিশেষত্ব বুঝার উপায় নাই।

বর্তমান কালে বহি সস্তা হইয়া গিয়াছে। আনা-দুই আনায় গীতা, মনাচে শ্লোক* পাওয়া যায়। গুরুর অভাব নাই। শিক্ষা উদার ও সুলভ। বিদ্যাপীঠ জ্ঞানের প্রসাদ বিতরণ করিতেছে। কিন্তু জ্ঞানামৃত ভোজনের উদ্গার ত কেহ তুলে না। পুস্তকের এই পর্বত দেখিয়া সাধুসেবার আবশ্যকতা দিন দিন সমধিক অনুভূত হইতেছে। পুস্তকের মজবুত কাপড়ের বাইণ্ডিংএর বাহিরে জ্ঞান ত আসে না। এই প্রসঙ্গে একটি 'অভঙ্গ' অনুক্ষণ আমার মনে পড়ে।

"দাঁড়িয়ে কাম ক্রোধের পাহাড়।
অনন্ত আছে আড়ালে তাহার।"

কাম ক্রোধের পাহাড়ের পরপারে নারায়ণ রহিয়াছেন। জ্ঞানরাজাও তদ্রূপ ঐ পুস্তকরাশির অন্তরালে লুকাইয়া আছেন। পুস্তকালয়ে ও গ্রন্থাগারে চারিদিক ছাইয়া গেলেও, দেখা যাইতেছে, মানুষ সর্বত্র সেই সংস্কারবিহীন, জ্ঞানবিহীন বানরই রহিয়া গিয়াছে। বরোদায় প্রকাণ্ড লাইব্রেরী আছে। এক ভদ্রলোক যাইতেছিলেন। হাতে তাঁহার একখানি বেশ বড় বহি। বহি-খানিতে ছবি ছিল। ভদ্রলোক মনে করিয়াছিলেন বহিখানি ইংরেজী। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বই ওখানি?" বহিখানি আগাইয়া ধরিলেন। বলিলাম, "এ যে ফ্রেন্স্।" ভদ্রলোক বলিলেন, "আচ্ছা, ফ্রেন্স্ এসে গেছে?" পরম পবিত্র রোমান লিপি, সুন্দর ছবি, উত্তম বাইন্ডিং। জ্ঞানের আর তবে কমতি কোথায়!

বছরে হাজার দশেক ইংরেজী বহি ছাপা হয়। অন্য ভাষা সম্পর্কেও ঐ কথা খাটে। জ্ঞানের এতাদৃশ প্রসার সত্ত্বেও মানুষের মগজ এতাদৃশ শূন্য কেন? কেহ বলে স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। কেহ বা বলে অভিনিবেশের অভাব। অন্য কেহ বলে, লোকে যাহা কিছু পড়ে সত্য মনে করে। বিচার করার অবসর কোথায়?—একথাও শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "অর্জুন, অনেক শুনতে শুনতে তোমার বুদ্ধি পাক খাচ্ছে। তা যতক্ষণ স্থির না হচ্ছে ততক্ষণ তোমার যোগপ্রাপ্তি হবে না। পড়া-শোনা বন্ধ করে, সাধুর

---

*সমর্থ রামদাসকৃত মারাঠী গ্রন্থ।

শরণ লও। সেখানে জীবনগ্রন্থ পড়তে পাবে। 'মৌন ব্যাখ্যান' শুনে তুমি ছিন্ন-সংশয় হবে। সেখানে গেলে দেখতে পাবে নিরন্তর সেবাকার্য করেও মন কিভাবে পূর্ণ শান্ত থাকে, কর্মের আবর্তের মধ্যেও হৃদয়ে সেতারের তান কেমন অখণ্ড ঝঙ্কৃত হতে থাকে।"

রবিবার, ১৩-৩-৩২

পঞ্চম অধ্যায়

(১৭)

বন্ধুগণ,

সংসার বড় ভয়ানক জিনিষ। অনেক সময় সমুদ্রের সহিত উহার তুলনা করা হয়। সমুদ্রের যে দিকে তাকান জল আর জল। সংসারও তেমন। সংসার সর্বত্র জুড়িয়া আছে। ঘর-দোর ছাড়িয়া কেহ দেশের কাজে লাগিয়াছে ত সেখানেও সংসার তাহার মনে আড্ডা গাড়ে। পর্বত গুহায় গিয়াছে ত সেখানেও বিঘত-প্রমাণ নেংটিতে সংসার তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে। নেংটিতেই তখন তাহার সমস্ত আসক্তি জমাট বাঁধে। এইটুকু নোটে যেমন হাজার টাকা থাকে, ঐ ছোট নেংটি তেমন অপার আসক্তির আধার হয়। ঘর-সংসার ভাঙিলাম, ঝঞ্ঝাট কমাইলাম, সংসার যে তাহাতে কমিল তাহা নয়। দশের পঁচিশই বলুন আর দুইয়ের পাঁচই বলুন, কথা একই। ঘরেই থাকুন কি বনে, আসক্তি পাশেই খাড়া। সংসার এক কণাও কমে না। দুইজন যোগী হিমালয়ের গুহায় গিয়া বসিল। সেখানেও তাহারা পরস্পরের যশের কথা কাণে আসিলে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরে। সার্বজনীন ক্ষেত্রেও এই দৃশ্য।

এমনই নাছোড়বান্দা এই সংসার। পেছনে তাহা লাগিয়া থাকে। তাই স্বধর্মাচরণের পরিধি নিজেরা নির্ধারণ করিয়া লইলেও সংসারের হাত হইতে আমাদের অব্যাহতি নাই। হুটোপাটি কমাইয়াছি, কর্মের বিস্তার ছোট করিয়াছি, সংসারপ্রপঞ্চ নামমাত্র রাখিয়াছি তবু তাহাতেই সমস্ত আসক্তি দানা বাঁধে। রাক্ষস ছোট হয়, বড় হয়। এই সংসারও তেমন। ছোটই হোক বা বড়, রাক্ষস রাক্ষসই। দুর্নিবারত্ব প্রাসাদে বা কুড়েতে একই রূপ। স্বধর্মের রেখা টানিয়া সংসারকে যদি সীমাবদ্ধ কর তথাপি সেখানে বহু ঝগড়ার সৃষ্টি হইবে, জীবন তোমার অতিষ্ঠ হইবে। অনেক সংস্থা ও বহু লোকের সহিত সেখানেও তোমার সম্বন্ধ সৃষ্টি হইবে আর তুমি হাঁপাইয়া উঠিবে। মনে হইবে কেন এই ঝঞ্ঝাটে পড়িতে গেলাম। এই সবও তোমার মন যাচাইয়ের কষ্টিপাথর। স্বধর্মাচরণ করিতে থাকিলাম আর

অলিপ্ততা আসিল তাহা নহে। কর্মের ব্যাপ্তি কম করা মানে অলিপ্ত হওয়া নয়।

তবে অলিপ্ততা লাভের উপায় কি? তার জন্য মনোময় প্রযত্ন চাই। মনের সহযোগ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হয় না। মা-বাপ ছেলেকে কোন প্রতিষ্ঠানে রাখিয়াছে। সেখানে সে ভোরে ওঠে, সূর্য নমস্কার করে; চা খায় না। কিন্তু দেখা যায় ঘরে আসিতেই দুই দিনে সব পাল্টাইয়া যায়। মানুষ মাটির তাল নহে। যে আকার তার মনকে দিতে চাই তাহা তার মনে যদি বসে তবে না। মন যদি সে আকারে না আসে ত বাহিরের সব চেষ্টাই বৃথা। তাই সাধনায় মানসিক সহযোগের আবশ্যকতা খুব বেশী।

সাধন হিসাবে বাহ্য স্বধর্মাচরণ আর অন্তর হইতে মনের বিকর্ম, দুই বস্তুই চাই। বাহ্য কর্মেরও আবশ্যকতা আছে। কর্ম বিনা মনের পরীক্ষা হয় না। সকালবেলার প্রশান্ত সময়ে মনে হয় আমাদের মন শান্ত। কিন্তু শিশু একটু কাঁদিয়াছে ত সেই মনের শান্তির মূল্য যে কি তাহা ধরা পড়ে। বাহ্য কর্মত্যাগ কাজের কথা নহে। বাহ্য কর্মে আমাদের মনের স্বরূপ প্রকাশ হয়। জলের উপরিভাগ দেখিতে পরিষ্কার। কিন্তু জলে ঢিল ফেলুন, সঙ্গে সঙ্গে তলাকার গলদ উপরে উঠিবে। আমাদের মনের দশাও ঐ। মনের অন্তঃসরোবরে হাঁটুভর ময়লা জমিয়া থাকে। বাহ্য বস্তুর সহিত সংস্পর্শ মাত্র তাহা উপরে ভাসিয়া উঠে। আমরা বলি সে চটিয়াছে। ক্রোধ কি বাহির হইতে আসিয়াছে? অন্তরেই তাহা ছিল। মনে যদি না থাকিত তবে দেখাও যাইত না।

লোকে বলে, "সাদা খাদি চাই না। ময়লা হয়ে যায়। রঙগীন খাদি ময়লা হয় না।" তাহাও ময়লা হয়, কেবল দেখা যায় না। সাদা খাদি ময়লা হইলে বোঝা যায়। তাহা বলে, "ময়লা হয়ে গেছি, কেচে নাও।" এরূপ বলে বলিয়া লোকে তাহা চায় না। আমাদের কর্মও ঐরূপ বলে। তুমি রাগী কিনা, স্বার্থপর কিনা বা আর কিছু কিনা তাহা কর্ম দেখাইয়া দেয়। কর্ম হইতেছে দর্পণ। ঐ দর্পণে আমাদের স্বরূপ দেখা যায়। তাই কর্মের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা চাই। আয়নায় মুখ কুৎসিত দেখায় বলিয়া কি আয়না ভাঙ্গিয়া ফেলিব? না। উল্টো কৃতজ্ঞ হইব। মুখ

পরিষ্কার করিয়া পুনরায় দেখিব। তদ্রূপ, কর্মের দ্বারা আমাদের মনের ত্রুটি-মলিনতা বাহিরে ধরা পড়ে বলিয়া কি কর্ম হইতে দূরে থাকিব? ঐ কর্ম ত্যাগ করিলে কি মন নির্মল হইবে? অতএব কর্ম করিতে হইবে আর নির্মল হওয়ার জন্য উত্তরোত্তর অধিক চেষ্টা করিতে হইবে।

কোন লোক গহ্বরে গিয়া বসিয়াছে। কাহারও সম্পর্কে তথায় তার আসিতে হয় না। তার মনে হয় এখন আমি পুরাপুরি শান্তবুদ্ধি হইয়াছি। কিন্তু গুহা ছাড়িয়া অন্নের জন্য কোন গৃহস্থের বাড়ী সে যাক। খেলায় মত্ত বালক দরজার শিকলটা খটখট করিয়া বাজাইতেছে। ঐ বালব্রহ্ম নাদব্রহ্মে বিভোর। কিন্তু ঐ নিষ্পাপ শিশুর শিকল-বাজান-রূপ ক্রিয়া ঐ যোগীর কাছে অসহ্য। সে বলে বসে, "আঃ কি খটখট করছে ছেলেটা!" গুহায় থাকিয়া মনকে সে এত দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে যে যৎসামান্য ধাক্কাতেও অধীর হইয়া ওঠে। এইটুকু খটখট শব্দ হইল কি তার শান্তি উবিয়া গেল। এইরূপ দুর্বল ভাব আদৌ ভাল নহে।

তাৎপর্য এই যে নিজ মনের স্বরূপ বুঝার পক্ষে কর্মের একান্ত আবশ্যকতা আছে। দোষ ধরা পড়িলে দোষ দূর করা যায়। দোষ ধরা না পড়িলে প্রগতি বন্ধ হয়, বিকাশ থামিয়া যায়। কর্ম করিলেই না দোষ ধরা পড়িবে। তাহা দূর করার জন্য বিকর্মের ব্যবস্থা করিতে হয়। অন্তরে যখন রাতদিন এইরূপ বিকর্মের প্রযত্ন চলিতে থাকে তখন স্বধর্মের আচরণ করিয়াও কিরূপে অলিপ্ত থাকা যায়, কাম-ক্রোধের, লোভের অতীত হওয়া যায় তাহা একদিন বুঝা যাইবে। কর্মকে নির্মল করার জন্য যখন অবিরাম চেষ্টা সুরু হয়, তখন আপনা হইতেই কর্ম নির্মল হইতে থাকে। নির্বিকার কর্ম যখন সহজভাবে পর পর হইতে থাকে তখন কর্ম কখন যে হইয়া গিয়াছে তাহা সহসা টের পাওয়া যায় না। কর্ম সহজ হইয়াছে মানে কর্ম অকর্ম হইয়াছে। সহজ কর্মকে যে অকর্ম বলা হয় তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি। কর্মের অকর্ম কিরূপে হয় তাহা সাধুপুরুষের চরণপ্রান্তে গেলে বুঝা যাইবে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষাশেষি ভগবান একথা বলিয়াছেন। এই অকর্ম স্থিতির বর্ণনা করিতে বাণী অসমর্থ।

(১৮)

সহজ কর্মের একটি পরিচিত উদাহরণ লইতেছি। শিশু চলিতে শিখে। প্রথমে কতই না অসুবিধা হয়। তার এই লীলা আমাদের আনন্দ দেয়। আমরা বলি, "দেখ, বাচ্চা চলতে শিখেছে।" কিন্তু পরে ঐ চলা সহজ হইয়া যায়। চলে আর কথাও বলে। চলার দিকে লক্ষই থাকে না। খাওয়া সম্বন্ধেও এই কথা। শিশুর অন্নপ্রাশন আমরা করি। খাওয়া যেন মহা ব্যাপার। কিন্তু পরে খাওয়া সহজ কর্ম হইয়া যায়। লোকে যখন সাঁতার কাটিতে শিখে তখন খুব কষ্ট হয়। দম ফুরাইয়া যায়। কিন্তু পরে হয় উল্টা। অন্য কাজ করিয়া ক্লান্ত হইলে আমরা বলি, "চল, একটু সাঁতার কাটা যাক। ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।" সাঁতার কাটা আর তখন কষ্টের থাকে না। শরীর সহজভাবে জলের উপর চলে ফিরে। ক্লান্ত হওয়া মনের ধর্ম। মন কর্মে ত্যক্ত-বিরক্ত হইলে ক্লান্তি আসে। কিন্তু কর্ম যখন সহজ হইতে থাকে তখন আর ভারি বোধ হয় না। কর্ম যেন অকর্ম হয়। কর্ম আনন্দময় হয়।

কর্মকে অকর্ম করা আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য স্বধর্মাচরণরূপ কর্ম করিতে হয়। তাহা করিতে করিতে দোষ ধরা পড়িবে। তাহা দূর করার জন্য বিকর্মের আশ্রয় লইতে হইবে। এবং এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে মন এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে কর্মের কষ্টবোধ আদৌ থাকে না। হাতে হাজার কর্ম হইতে থাকে অথচ মন শুদ্ধ শান্ত থাকে। আকাশকে জিজ্ঞাসা করুন, "ভাই আকাশ, গরমে তুমি ঝল্‌সে যাও না, বর্ষায় ভিজে যাও না, শীতে কাঁপ না?" আকাশ কি বলিবে? বলিবে, "আমার কি হয় আর হয় না তা তুমি ঠিক কর। আমি কিছু জানি নে।"

পাগল নেংটা কি ঢাকা।
দেখেই লোকের জানা॥

পাগল উলঙ্গ কি তার পরনে কিছু আছে তাহা নির্ণয় করিবে লোকে। পাগলের সে বোধ নাই।

ভাবার্থ এই যে, বিকর্মের সহায়তায় নির্বিকার করার বারংবার চেষ্টার ফলে স্বধর্মাচরণরূপ কর্ম স্বাভাবিক হইয়া যায়। বড় বড় বিকট ব্যাপারও

আর তখন কঠিন মনে হয় না। কর্মযোগের ইহা এমনই চাবি। চাবি ছাড়া তালা খুলিতে গেলে হাতে ফোস্কা পড়ে। কিন্তু চাবি পাইলে মুহূর্তে খুলিয়া যায়। কর্মযোগের এই চাবির সহায়তায় সকল কর্ম নির্ঝঞ্ঝাট মনে হয়। মনোজয় হইতে এই চাবি মিলে। অতএব মনোজয়ের নিরন্তর চেষ্টা করা চাই। কর্ম করিতে গিয়া যে মনোমল দেখা যাইবে তাহা ধুইয়া ফেলার প্রযত্ন করা চাই। তাহা হইলে বাহ্য কর্মের ঝামেলা মনে হয় না। কর্মের অহংকারও মিটিয়া যায়। কাম-ক্রোধের বেগ নষ্ট হয়। ক্লেশ অনুভব হয় না। কর্মেরও বোধ আর থাকে না।

কোন এক ব্যক্তি এক সময়ে আমাকে লিখে, "এত বার নাম জপ করা হবে। তুমি এতে যোগ দিবে। জানাবে কতবার জপ করবে।" নিজ বুদ্ধি অনুসারে সে ব্যক্তি ব্যবস্থা করিতেছিল। তাকে দোষ দেওয়ার জন্য একথা বলিতেছি না। কিন্তু রামনাম মাপ-জোকের বস্তু নয়। মা সন্তানের সেবা করেন। তিনি কি উহার রিপোর্ট ছাপেন? যদি ছাপিতেন তবে 'থ্যাঙ্ক্ ক্যু' বলিয়া আমরা ঋণমুক্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু মা রিপোর্ট লিখেন না। তিনি বলেন, "কি করেছি, কিছুই করি নি। তা কি আমার কাছে বোঝা!" বিকর্মের সাহায্যে মন নিবিষ্ট করিয়া, হৃদয় ঢালিয়া দিয়া মানুষ যখন কর্ম করে, তখন তাহা কর্ম থাকে না। তাহা অকর্ম হইয়া যায়। তখন ক্লেশ, কষ্ট, কঠিনতা—কিছুই থাকে না।

এই অবস্থার বর্ণনা করা যায় না। অস্পষ্ট একটা কল্পনা করা যায় মাত্র। সূর্য ওঠে। একথা কি সে ভাবে যে আমি এখন আঁধার দূর করিব, পাখিদের উড়িতে প্রেরণা দিব, লোকদের কর্মে প্রবৃত্ত করিব। সূর্য উদিত হয় আর সেখানেই খাড়া থাকে। তাহার অস্তিত্ব মাত্রই বিশ্বকে গতি দেয়। কিন্তু সে বোধ সূর্যের নাই। "সূর্যদেব, অশেষ তোমার অনুগ্রহ। কত আঁধার তুমি দূর করে দিলে" একথা তাকে আপনি বলেন ত সে ধাঁধায় পড়িবে। সে বলিবে, "এতটুকু আঁধার এনে আমায় দেখাও ত। তা যদি আমি দূর করতে পারি তখন বলব যে তা আমার কর্ম।" সূর্যের কাছে কি অন্ধকার লইয়া যাওয়া যায়? সূর্যের অস্তিত্বে অন্ধকার দূর হইয়া যায়। কেহ তার আলোতে সদ্‌গ্রন্থ পড়ে, কেহ অসদ্‌গ্রন্থ। কেহ তার আলো

দিয়া আগুন লাগায়, কেহ ভাল কাজ করে। কিন্তু এই পাপ-পুণ্যের জবাবদিহি সূর্যের নহে। সূর্য বলে, "আলো আমার সহজ ধর্ম। আমার কাছে আলো থাকবে না ত থাকবে কি? আমি যে আলো দিচ্ছি তা আমি জানি নে। আমার অস্তিত্বই আলো। আলো দেওয়া-রূপ ক্রিয়ার কষ্ট আমার নেই। আমি কি করছি সে বোধ আমার নেই।"

সূর্যের আলোক দানের মতই সাধুদের অবস্থা স্বাভাবিক। তাঁদের থাকা মানেই বস্তুত আলোক দান। জ্ঞানী পুরুষকে বলুন, "মহাত্মন্‌, আপনি সত্যবাদী।" তিনি বলিবেন, "সত্যপথে চলব না ত করব কি? আমি বিশেষ কি করছি?" অসত্য জ্ঞানীপুরুষের কাছে থাকিতেই পারে না।

অকর্মেরও অবস্থা এইরূপ। ক্রিয়াসমূহ এমন নৈসর্গিক ও স্বাভাবিক হইয়া যায় যে, কখন তাহা আরম্ভ হয় আর কখন শেষ হয় তাহা টেরও পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়গুলি তাঁহাদের সহজ বশে আসিয়া যায়। "সহজ বলা হিত উপদেশ"—এই অবস্থা দাঁড়ায়। এই অবস্থায় কর্ম অকর্ম হয়। জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে সৎকর্ম সহজ হয়। কলরব করা পাখির সহজ ধর্ম। মার কথা মনে হওয়া শিশুর সহজ ধর্ম। তদ্রূপ, ঈশ্বরের কথা মনে হওয়া সাধুদের সহজ ধর্ম। ভোরে 'কুঁকড়ু-কু' করা মোরগের সহজ ধর্ম। স্বরের জ্ঞান দিতে গিয়া ভগবান পাণিনি মোরগের বাঁগের (ডাক) দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মোরগ পাণিনির সময় হইতে আজও ডাকে। তা বলিয়া তাকে কেহ কি মানপত্র দিয়াছে? উহা মোরগের সহজ ধর্ম। তদ্রূপ, সত্য বলা, জীব-মাত্রে দয়া, অন্যের দোষ-ত্রুটি না দেখা, যে কোনও লোকের সেবা করা ইত্যাদি সৎপুরুষের কর্ম। সৎপুরুষদের এই যে সব কর্ম তাহা সহজভাবে হইতে থাকে। তাহা না করিয়া তাঁহাদের উপায় নাই। কেহ আহার করিলে কি লোকে তার যশ গান করে? আহার, পান, শয়ন যেমন সংসারীদের সহজ কর্ম, সেবাকর্ম তদ্রূপ জ্ঞানীদের সহজ কর্ম। উপকার করাই তাঁহাদের স্বভাব। আমি উপকার করিব না একথা বলা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। এইরূপ জ্ঞানী পুরুষের কর্ম অকর্ম অবস্থায় পৌঁছিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থাকে সন্ন্যাস-রূপ অতি পবিত্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সন্ন্যাস বলিতে এইরূপই পরমধন্য অকর্মদশা বুঝায়। এই দশাকে কর্মযোগও

বলিতে হইবে। কর্ম করিতেছি বলিয়া তাহা যোগ আর করিতেছি এই বোধ থাকে না বলিয়া তাহা সন্ন্যাস। এরূপভাবে সে কর্ম করে যে কর্মের ছোপ তাহাতে লাগে না তাই অহা যোগ, আর করিয়াও কিছু করে না, তাই তাহা সন্ন্যাস।

(১৯)

সন্ন্যাসের কল্পনা কিরূপ? কিছু কাজ ছাড়িতে হইবে, কিছু কাজ করিতে হইবে ইহাই কি কল্পনা? না, তা নয়। সকল কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে ইহাই বস্তুত সন্ন্যাসের সংজ্ঞা। সব কর্ম হইতে মুক্ত হওয়া, কিঞ্চিৎ-মাত্র কর্ম না করা—এর নাম সন্ন্যাস। কিন্তু কর্ম না করার মানে? কর্ম অতীব বিচিত্র। সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাস হইবে কিরূপে? আগে-পাছে, এখানে-ওখানে কর্ম সর্বত্র বিদ্যমান। ভাল, বসিলেন তাহাও ত ক্রিয়া। 'বসা' এইটি ক্রিয়াপদ। ব্যাকরণের দৃষ্টিতেই কেবল তাহা ক্রিয়া নয়, সৃষ্টি শাস্ত্রেও 'বসা' ক্রিয়া। বসিতে বসিতে পায়ে ব্যথা হয়। বসাতেও শ্রম আছে। না করাও যেখানে কর্ম হইয়া যায় সেখানে কর্ম-সন্ন্যাস হইবে কিরূপে? ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। সেই সর্বত্র ব্যাপ্ত বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জুন ভয় পাইলেন এবং ঘাবড়াইয়া গিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন। কিন্তু চক্ষু মুদিয়া দেখিলেন ত ভিতরেও তাহা দেখিতে লাগিলেন। চক্ষু বুজিলেও যাহা দেখা যায় তাহা হইতে বাঁচার উপায়? না করিলেও যাহা হয় তাহা দূরে ঠেলা যায় কিভাবে?

একটি লোক। তার অনেক দামী গহনা ছিল। বড় একটা সিন্দুকে তাহা সে বন্ধ করিয়া রাখিবে ঠিক করিল। চাকর বেশ বড় দেখিয়া একটা লোহার সিন্দুক বানাইয়া আনিল। তাহা দেখিয়া সে বলিল, "বোকা কোথাকার! সৌন্দর্যের বোধ আদৌ যদি থাকে! এমন মূল্যবান সুন্দর গহনা থাকার এরূপ বিশ্রী লোহার সিন্দুক? সোনার ভাল সিন্দুক তৈরি করে আন।" চাকর সোনার সিন্দুক লইয়া আসিল। "তালাও সোনার আন। সোনার সিন্দুকে সোনার তালাই শোভা পায়।" লোকটি চাহিয়াছিল গহনা লুকাইয়া রাখিতে, সোনা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখিতে। কিন্তু সে সোনা ঢাকিয়া রাখিল কি খুলিয়া রাখিল? চোরের খুঁজিতে হইল না। সিন্দুক

সরাইল, আর কাজ হাসিল। তাৎপর্য, কর্ম না করাও এক প্রকার কর্ম করা। এইরূপ ব্যাপক যে কর্ম তার সন্ন্যাস করার উপায় ?

এরূপ কর্মের সন্ন্যাস করার রীত হইতেছে এই যে, যে উপায় অবলম্বন করিলে দুনিয়াভর কর্ম করিলেও তাহা ধুইয়া-মুছিয়া যাইবে সে উপায় অবলম্বন করা। তাহা যখন হইবে তখন সন্ন্যাস লাভ হইবে। কর্ম করিলেও তাহা নিঃশেষে ধুইয়া-মুছিয়া যাইবে এ কিরূপ কথা? সূর্যের যেরূপ। সূর্য রাতদিন কর্ম করিতেছে। রাতেও কর্ম করে। তার আলো তখন অপর গোলার্ধে কর্মে রত। কিন্তু এত কর্ম করিলেও, একথা বলা যায় যে সে কিছুই করে না। তাই চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন, "আমি এই যোগ প্রথমে সূর্যকে শিখাই, তারপরে বিচার করতে, চিন্তা করতে অভ্যস্ত মনু সূর্যের কাছ হতে তা শেখে।" চব্বিশ ঘণ্টা কর্ম করিয়াও সূর্য লেশমাত্র কর্ম করে না। সত্যসত্যই এই অবস্থা অদ্ভুত। সন্দেহ মাত্র নাই।

(২০)

সে কর্ম করিয়াও করে না এ ত হইল সন্ন্যাসের এক দিক। সে কোন কর্মই করে না অথচ সারা বিশ্বকে কর্মে প্রবৃত্ত করে ইহা সন্ন্যাসের আর এক দিক। তাহাতে অপরিসীম প্রেরক শক্তি থাকে। অকর্মের বিশেষত্বও এই। অকর্মে অনন্ত কর্মের উপযোগী শক্তি ভরা থাকে। বাষ্পের তাহা নয় কি? ভাপ আটকাইয়া রাখেন ত প্রচণ্ড কর্ম করে। ঐ আবদ্ধ ভাপে অশেষ শক্তি আসে। তাহা অনায়াসে বড় বড় জাহাজ, বড় বড় রেলগাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। সূর্যেরও এইরূপ। সে লেশমাত্রও কর্ম করে না। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা একটানা কাজ করে। তাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, "আমি কিছু করি না।" দিনরাত কর্ম করিয়া কিছু না করা যেমন সূর্যের এক দিক তেমন কিছু না করিয়া দিনরাত অনন্ত কর্ম করা তার আর এক দিক। এই দুই ভূষণে সন্ন্যাস বিভূষিত।

দুইটিই অসাধারণ। একটিতে কর্ম প্রকট ও অকর্মাবস্থা গুপ্ত। অপরটিতে অকর্মাবস্থা ব্যক্ত দেখা যায় কিন্তু তৎসাহায্যে অনন্ত কর্ম হইতে থাকে। এই অবস্থায় অকর্মে কর্ম কানায় কানায় ভরা থাকে। তার ফলে

প্রচণ্ড কর্ম হয়। যে এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহার আর কুড়ে লোকের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী। আলসে লোক ক্লান্ত হইবে, হাঁপাইয়া উঠিবে। এই অকর্ম সন্ন্যাসী কর্মশক্তি অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। লেশমাত্রও কর্ম করে না। সে হাত-পা দিয়া, ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কর্ম করে না। কিন্তু কিছু না করিয়া সে অনন্ত কর্ম করে।

কোন লোক রাগ করিয়াছে। আমাদের ভুলের দরুন রাগ হইয়া থাকিলে আমরা তার কাছে যাই। কিন্তু সে কথাই বন্ধ করিয়া দেয়। তাহার না-বলার, ঐ কর্মত্যাগের কিরূপ প্রচণ্ড ফল হয়? আর একজন বকিয়াই চলিবে। দুইজনেই ক্রুদ্ধ। একজন মৌন, আর একজন মুখর। উভয়ই ক্রোধের দৃষ্টান্ত। না-বলাও ক্রোধের এক রূপ। তাতেও কর্ম হয়। মা বা বাবা সন্তানের সহিত কথা বন্ধ করিলে তার ফল কেমন প্রচণ্ড হয়! ঐ কথা-বলা বন্ধ করার, কর্ম না করার পরিণাম প্রত্যক্ষ কর্ম করার পরিণাম হইতে অনেক বেশী প্রচণ্ড হইয়া থাকে। ঐ অ-বলার যে প্রভাব হইল, বলার সে প্রভাব হওয়া সম্ভব ছিল না। জ্ঞানীপুরুষের এইরূপই হয়। তার অকর্ম, তার শান্ত ভাব, প্রচণ্ড কর্ম করিয়া থাকে। প্রচণ্ড সামর্থ্য সৃষ্টি করে। অকর্মী থাকিয়াও সে এত কর্ম করে যাহা নানা ক্রিয়া দ্বারাও করা যায় না। ইহা সন্ন্যাসের অপর রূপ।

এইরূপ সন্ন্যাসের সকল প্রযত্ন, সকল শ্রম এক স্থানে আসিয়া স্থির হয়।

"কর্মের গতি হয়েছে স্থির।
প্রভুপদে যেন লেগেছে খিল॥
ঘুচে গেছে চিন্তা এসেছে ভরসা।
নাই আর গর্ভবাসের ভাবনা॥
হয়নি নিজ শক্তি-সামর্থ্যে জয়।
করেছেন প্রভু অভিমান ক্ষয়॥
তুকা কহে হয়েছে জয়ী সে শক্তি।
পেয়েছি আমি রিক্তার মুক্তি॥"

তুকারাম বলিতেছেন, "আমি এখন রিক্ত হয়েছি, পুটলি হয়ে গেছি। সকল

চেষ্টার অন্ত হয়েছে।" তুকারাম রিক্ত হইয়াছেন, কিন্তু সেই খালি থলিতে প্রচণ্ড প্রেরণা-শক্তি রহিয়াছে। সূর্য নিজে কখনও ডাকে না কিন্তু তার দর্শন মাত্র পাখি ওড়ে, মেষশাবক নৃত্য করে, গাভী চরিতে যায়, বণিক মহাজন দোকান খোলে, কৃষক ক্ষেতে যায়। সংসারে নানা কাজ সুরু হয়। সূর্য আছে মাত্র। বস্, তাহাই যথেষ্ট। অনন্ত কর্ম সুরু হইয়া যায়। এই অকর্মাবস্থায় অনন্ত প্রেরণা ভরা থাকে। সামর্থ্য গাদান থাকে। এমনি অদ্ভুত সন্ন্যাসের অপর রূপ।

(২১)

পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিবিধ প্রকারের সন্ন্যাসের তুলনা করা হইয়াছে। এক, চব্বিশ ঘণ্টা কর্ম করিয়াও কিছু করে না, অপর, পলভর কর্ম না করিয়াও সব কিছু করে। এই দুই প্রকারের এখানে তুলনা করা হইয়াছে। এই দ্বিবিধ দিব্য রূপ অবলোকন করুন, বিচার করুন, মনন করুন। অপূর্ব আনন্দে তাহা পূর্ণ।

বিষয়টিও অপূর্ব ও উদাত্ত। সন্ন্যাসের এই কল্পনা সত্যসত্যই অতি পবিত্র, অতি মধুর। এই ভাবের, এই কল্পনার প্রথম সন্ধান যিনি দিয়াছিলেন, তিনি কতই না ধন্যবাদের পাত্র। বড়ই উজ্জ্বল এই কল্পনা। মানববুদ্ধি, মানবচিন্তা আজ অবধি যত ঊর্ধ্বে বিচরণ করিয়াছে, সন্ন্যাসের এই কল্পনা সে সবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহা আজও কেহ ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। উচ্চে বিচরণ আজও ক্ষান্ত হয় নাই। কিন্তু চিন্তার, অনুভবের এত উচ্চে আর কেহ উঠিয়াছে বলিয়া আমি জানি না। এই দ্বিবিধ সন্ন্যাসের নিছক কল্পনা চক্ষে ভাসিয়া ওঠা মাত্র আমার আনন্দ হয়, অপার আনন্দ। ভাষার বা ব্যবহারের জগতে আসিলে সে আনন্দ কম হইয়া যায়। মনে হয় নীচে পড়িতেছি। বন্ধুদের সহিত এ বিষয়ে আমার হামেশা কথাবার্তা হয়। বহু বর্ষ যাবৎ আমি এই সব দিব্য ভাবনা মনন করিয়া আসিতেছি। ভাষা এখানে ফেল। শব্দের ছকে ইহা ধরা যায় না।

না করিয়া সব কিছু করিলাম আর সব কিছু করিয়া লেশমাত্রও করিলাম না—কেমন উদাত্ত, রসময় ও কাব্যময় এই কল্পনা! কাব্যের আর

বাকী থাকিল কী? যত কিছু কাব্য এই কাব্যের কাছে ম্লান। এই কল্পনায় যে আনন্দ, যে উৎসাহ, যে স্ফূর্তি, যে দিব্যভাব রহিয়াছে তাহা কোন কাব্যেই নাই। এইরূপে এই পঞ্চম অধ্যায়কে উচ্চ, অতি উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত কর্ম-বিকর্মের কথা বলিয়া এখানে খুব উচ্চ ঝম্প মারা হইয়াছে। এখানে অকর্মদশার দুই প্রকারের তুলনা করা হইয়াছে। ভাষা এখানে পরাস্ত। কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ, কি কর্মসন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ? কর্ম অধিক কে করে তাহা বলা সম্ভব নহে। সব করিয়া কিছু না করা, আর কিছু না করিয়া সব করা, এ দুই-ই যোগ। কিন্তু তুলনার জন্য এককে যোগ বলা হইয়াছে আর অপরকে সন্ন্যাস।

(২২)

এখন ইহাদের তুলনা কিরূপে করা যায়? তার জন্য কোনও উদাহরণের আশ্রয় লইতে হইবে। উদাহরণের কথায় মনে হয় যেন নীচে পড়িতেছি। কিন্তু নীচে পড়া ছাড়া উপায় নাই। বলিতে কি, পূর্ণ কর্মসন্ন্যাস কিম্বা পূর্ণ কর্মযোগ এই কল্পনাই এরূপ যে এই দেহে তাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না। ঐ কল্পনা এই দেহ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যে সকল মহাপুরুষ এই কল্পনার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত সামনে রাখিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। উদাহরণ চিরদিনই অপূর্ণ থাকিবে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য ধরিয়া লইতে হইবে তাহা পূর্ণ।

জ্যামিতিতে বলা হয় 'মনে কর' কখগ একটি ত্রিকোণ। কেন মনে করিব? এই ত্রিকোণের রেখা যথার্থ রেখা নয় বলিয়া। দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ নাই আসলে ইহাই রেখার সংজ্ঞা। প্রস্থ বাদে দৈর্ঘ্য বোর্ডে আঁকা যায় কি? লম্বাইএর সঙ্গে চওড়াইও আসে। রেখা টানিলেই তাহাতে কিছু চওড়াই আসিবে। তাই জ্যামিতিশাস্ত্রে রেখা 'মনে করে' লওয়া ছাড়া কাজ চলে না। ভক্তিশাস্ত্রের কথাও তাহাই নয় কি? সেখানেও ভক্ত বলেন—"মনে কর" এই ছোটমোট শালগ্রাম শিলাতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী রহিয়াছেন। এ কিরূপ বোকামি? একথা যদি কেহ বলে ত তাকে বলিও,—তোমার এই জ্যামিতি কি বোকামি? পরিষ্কার মোটা রেখা দেখা যাইতেছে

আর বলিতেছ 'মনে কর' ইহার চওড়াই নাই; ইহা কিরূপ বোকামি? অণুবীক্ষণে দেখিলে আধ ইঞ্চি চওড়া দেখাইবে। জ্যামিতি শাস্ত্রে তুমি যেমন ধরিয়া লও ভক্তিশাস্ত্রও তেমনি বলে, "মনে কর এই শালগ্রামে পরমেশ্বর আছেন।" "পরমেশ্বর ত ভাঙেন না চুরেন না। তোমার শালগ্রাম চূর্ণ হয়ে যাবে। লাগাও না ঘা?" কেহ এরূপ বলে ত তাহা বুদ্ধিমানের কথা নহে। জ্যামিতিতে 'মনে কর' চলিবে আর ভক্তিশাস্ত্রে চলিবে না কেন? বিন্দু মানে মনে কর। আর বোর্ডে বিন্দু আঁক। বিন্দু নয় ত সুন্দর এক বর্তুল। বিন্দুর বর্ণনা ব্রহ্মের বর্ণনারই সমান। বিন্দুর লম্বাই, চওড়াই, গভীরতা কিছুই নাই। কিন্তু এরূপ বর্ণনা করা সত্ত্বেও বোর্ডে তাহা আঁকা হয়। বিন্দু ত কেবল অস্তিত্ব-মাত্র। ত্রি-পরিণাম-রহিত। তাৎপর্য, যথার্থ ত্রিকোণ, যথার্থ বিন্দু সংজ্ঞাতেই কেবল যথার্থ। কিন্তু উহা আমাদের মানিয়া লইতে হয়। ভক্তিশাস্ত্রেও তদ্রূপ শালগ্রামে অন্তর্গুরু সর্বব্যাপী পরমেশ্বর ধরিয়া লইতে হয়। তদ্রূপ আমরাও কাল্পনিক দৃষ্টান্ত লইয়া ইহাদের তুলনা করিব।

মীমাংসকগণ ত বড়ই মজা করিয়াছেন। পরমেশ্বর কোথায় আছেন ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া তাঁহারা সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতা আছে। এই সব দেবতাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে মীমাংসায় প্রশ্ন করা হয়, "এই ইন্দ্র কিরূপ? তাঁহার রূপ কি? কোথায় থাকেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসকগণ বলিয়াছেন, 'ইন্দ্র' এই শব্দই ইন্দ্রের রূপ। 'ইন্দ্র' এই শব্দেই তিনি থাকেন। 'ই' আর তাতে অনুস্বার এবং তারপরে 'দ্র' ইহাই ইন্দ্রের রূপ। তাহাই তার মূর্তি। তাহাই প্রমাণ। বরুণ দেবতা কিরূপ? তদ্রূপই। প্রথমে 'ব' পরে 'রু' পরে 'ণ'। ব-রু-ণই বরুণের রূপ। অগ্নি আদি দেবতা সম্বন্ধেও ঐকথা। এই সকল দেবতাই অক্ষর-রূপধারী। দেবতাগণ অক্ষরমূর্তি এই কল্পনায়, এই ভাবনায় বড়ই মাধুর্য রহিয়াছে। দেব এই কল্পনা, দেব এই বস্তু আকারে ঠাঁই দেওয়া যায় না। ঐ কল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য অক্ষর এই চিহ্নই পর্যাপ্ত। ঈশ্বর কিরূপ? আগে 'ঈ' তারপরে 'শ্ব' তারপরে 'র'। পরিশেষে 'ওঁ' ত হদ্দ করিয়া ছাড়িয়াছে। 'ওঁ' অক্ষরই ঈশ্বর হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের তাহা এক সংজ্ঞা

হইয়া গিয়াছে। এরূপ সংজ্ঞা সৃষ্টি করিতে হয়। কারণ মূর্তিতে, আকারে, এই বিশাল কল্পনা ঠাঁই দেওয়া যায় না। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা খুব প্রবল। সে এই কল্পনা মূর্তিতে রূপ দিতে চেষ্টা করে।

(২৩)

সন্ন্যাস ও যোগ, এ অতি উচ্চে পক্ষ বিস্তার। পূর্ণ সন্ন্যাস ও পূর্ণ যোগের কল্পনার ঠাঁই এই দেহে হইতে পারে না। এই দেহে তাহা আঁটান না গেলেও চিন্তায় তাহা ধরা যায়। পূর্ণ যোগী ও পূর্ণ সন্ন্যাসী ব্যাখ্যাতেই থাকিবে। ধ্যেয়ভূত ও অপ্রাপ্যই থাকিবে। তবে উদাহরণ স্বরূপ এরূপ ব্যক্তি লইতে হইবে যে এই কল্পনার সর্বাধিক নিকটে পৌঁছিয়াছে। আর জ্যামিতির মত মনে করিতে হইবে যে অমুকেই পূর্ণ যোগী আর অমুকেই পূর্ণ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসের উদাহরণ দিতে গিয়া শুক-যাজ্ঞবল্ক্যের নাম করা হয়। আর ভগবদ্‌গীতায় জনক-শ্রীকৃষ্ণকে কর্মযোগী বলা হইয়াছে। গীতা-রহস্যে লোকমান্য এরূপ এক নামের তালিকাই দিয়াছেন। "জনক-শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি এই পথে গিয়াছেন। শুক-যাজ্ঞবল্ক্য আদি ঐ পথে গিয়াছেন।" একটু ভাবিয়া দেখিলে, ভিজা হাতে লেখা পুছিয়া ফেলার মত এই তালিকা পুছিয়া ফেলা যাইবে। যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন সন্ন্যাসী, জনক ছিলেন কর্মযোগী। অর্থাৎ কর্মযোগী জনক, সন্ন্যাসী যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য ছিলেন। আর ঐ জনকেরই শিষ্য হইলেন সন্ন্যাসী শুকদেব। যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য জনক, আর জনকের শিষ্য শুকদেব। সন্ন্যাসী, কর্মযোগী, সন্ন্যাসী—এই রূপই এই মালিকা। অর্থাৎ যোগ ও সন্ন্যাস একই পর্যায়ে আসিল।

ব্যাসদেব শুকদেবকে বলিলেন, "বৎস শুক, তুমি জ্ঞানী ত বটেই; কিন্তু গুরুর ছাপ তুমি পাও নাই। জনকের কাছে তুমি যাও।" শুকদেব চলিলেন। জনক রাজপ্রাসাদের তেতলায় ছিলেন। শুক ছিলেন বনবাসী। নগর দেখিতে দেখিতে তিনি চলিয়াছেন। শুকদেবকে জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন এসেছ?"

শুকদেব কহিলেন—"জ্ঞান লাভের জন্য।"

জনক—"পাঠিয়েছেন কে?"

"ব্যাসদেব।"

"কোত্থেকে আসছ?"

"আশ্রম হতে।"

"আসতে আসতে এখানে বাজারে কি দেখলে?"

"যেখানে-সেখানে একই রকম চিনির মিঠাই সাজান দেখলাম।"

"আর কি?"

"চলছে-বলছে এরূপ চিনির পুতুল দেখলাম।"

"তারপরে কি দেখলে?"

"এখানে আসতে চিনির শক্ত সিঁড়ি পেলাম।"

"তারপর?"

"চিনির পুতলা এখানেও সর্বত্র দেখছি।"

"এখন কি দেখছ?"

"এক চিনির পুতলা আর এক চিনির পুতলার সঙ্গে কথা বলছে।"

জনক বলিলেন, "যাও, সব জ্ঞান তোমার লাভ হয়েছে।" জনকের স্বাক্ষরিত যে প্রমাণপত্রের দরকার ছিল তাহা মিলিল। মোদ্দা-কথা, কর্ম-যোগী জনক সন্ন্যাসী শুকদেবকে শিষ্য বলিয়া পাশ করিলেন। শুক ত সন্ন্যাসী, কিন্তু দেখুন প্রসঙ্গটি কিরূপ মজাদার।

পরীক্ষিৎ শাপগ্রস্ত হইলেন, "সাত দিনে তোর মৃত্যু হবে।" মৃত্যুর জন্য পরীক্ষিৎকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কিরূপে মরিতে হয় এই শিক্ষা দেওয়ার গুরু তাঁর চাই। শুকদেবকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন। শুকদেব আসিলেন আর স্বস্তিকাসনে বসিয়া ২৪×৭=১৬৮ ঘণ্টা ভাগবত শুনাইতে লাগিলেন। তিনি নিজ আসন হইতে উঠিলেন না। একটানা বলিয়া চলিলেন। ইহাতে আর বিশেষত্ব কি? বিশেষত্ব এই যে সাত দিন অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইলেও তাহা তাঁর মনে হয় নাই। অনুক্ষণ কর্ম করিতে থাকিলেও তিনি যেন কর্ম করিতেছিলেন না। শ্রমের বোধই সেখানে ছিল না। তাৎপর্য, সন্ন্যাস আর কর্মযোগ মূলে ভিন্ন নহে।

তাই ত ভগবান বলিয়াছেন, 'একং সাখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'—সন্ন্যাস ও যোগকে যে একই দেখে সে যথার্থ রহস্য বুঝিয়াছে।

একে না করিয়াও করে, আর এক করিয়াও করে না। যিনি সত্য সত্যই শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী, সমাধি নিরন্তর যাঁহার লাগিয়াই রহিয়াছে, এরূপ পূর্ণ নির্বিকার কোন সন্ন্যাসী আমাদের মধ্যে দিন দশেক আসিয়া যদি থাকেন ত দেখিবেন কত আলো, কত প্রেরণা তিনি দিয়াছেন। বহু বর্ষের স্তূপীকৃত কর্মেও যাহা হয় নাই তাহা তাঁর দর্শন মাত্রে, অস্তিত্বমাত্রে হইয়া যাইবে। ফটো দেখিয়া যদি মনে পবিত্র ভাব আসে, মৃত লোকের ছবি দেখিয়া যদি ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা হৃদয়ে জন্মে তাহা হইলে জীবন্ত সন্ন্যাসী দেখিয়া কতই না প্রেরণা পাওয়া যাইবে! সন্ন্যাসী ও যোগী দুইই লোক সংগ্রহ করেন। বাহির হইতে এক জায়গায় কর্মের ত্যাগ দেখা গেলেও সেই কর্মত্যাগে কর্ম ঠাসা ভরা থাকে। অনন্ত প্রেরণা ভরা থাকে। জ্ঞানী সন্ন্যাসী ও জ্ঞানী কর্মযোগী দুইই একই সিংহাসনে বসিবার অধিকারী। নাম পৃথক হইলেও অর্থ এক। একই তত্ত্বের ইহা দুই ভিন্ন রূপ। যন্ত্র যখন বেগে ঘুরিতে থাকে তখন মনে হয় তাহা স্থির, ঘুরিতেছে না। সন্ন্যাসীর অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁহার শান্তভাব হইতে, স্থিরতা হইতে অনন্ত শক্তি, অফুরন্ত প্রেরণা উৎসারিত হয়। মহাবীর, বুদ্ধ, নিবৃত্তিনাথ, এঁরা এইরূপই বিভূতি ছিলেন। সন্ন্যাসের সকল প্রচেষ্টার প্রবাহ যদি এক স্থানে আসিয়া স্থির হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাহা প্রচণ্ড কর্ম করে। তার মানে যোগীই সন্ন্যাসী, আর সন্ন্যাসীই যোগী। দুইয়ে আসলে কোন পার্থক্য নাই। শব্দ ভিন্ন ভিন্ন, অর্থ এক। যেমন পাথর মানে পাষাণ আর পাষাণ মানে পাথর, তদ্রূপ কর্মযোগী মানে সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসী মানে কর্মযোগী।

(২৪)

কথা যদ্যপি এই তাহা হইলেও ভগবান একটি বিন্দু উপরে বসাইয়া দিয়াছেন। সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ ভগবান একথা বলিয়াছেন। দুইই এক। তবে ভগবান এরূপ বলিতেছেন কেন? তবে কি তাহা পরিহাস? কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ একথা যখন ভগবান বলেন, তখন তিনি সাধকের দৃষ্টিতে বলেন। কোন কর্ম না করিয়া সকল কর্ম করার যে বিধি তাহা সিদ্ধ পুরুষের পক্ষেই সম্ভব, সাধকের পক্ষে নহে। কিন্তু সর্ব কর্ম

করিয়াও কিছু না করার যে বিধি তাহা অল্পাধিক অনুসরণ করা যাইতে পারে। এক বিধি সাধকের সাধ্যের অতীত। কেবল সিদ্ধের পক্ষেই সম্ভব। অপরটি সাধকের পক্ষেও অল্পাধিক সম্ভবপর। আদৌ কর্ম না করিয়া কর্ম কিরূপে করা যায়, ইহা সাধকের কাছে ধাঁধা মনে হইবে। ইহা তার বুদ্ধি ধরিতে অক্ষম। সাধকের পক্ষে কর্মযোগ মার্গও বটে, গন্তব্যও বটে। কিন্তু সন্ন্যাস হইতেছে গন্তব্যে পৌঁছিয়া যাওয়া, মার্গে চলা নহে। তাই সাধকের দৃষ্টিতে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

এই ন্যায় অনুসারে পরবর্তী দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান নির্গুণ অপেক্ষা সগুণকে বিশেষ স্থান দিয়াছেন। সগুণে সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ম রহিয়াছে। নির্গুণে তাহা নহে। নির্গুণে হাত কর্মহীন, পা কর্মহীন, চক্ষু কর্মহীন। সকল ইন্দ্রিয় কর্মহীন। এ সব সাধকের কাজে আসে না। কিন্তু সগুণে তাহা নয়। চোখ দিয়া রূপ দেখা যায়, কান দিয়া কীর্তন শোনা যায়, হাত দিয়া পূজা করা যায়-লোকের সেবা করা যায়, পা দিয়া তীর্থ ভ্রমণ করা যায়। এইভাবে সকল ইন্দ্রিয়কে কাজ দিয়া এবং তাহাদের দিয়া সেই সেই কর্ম করাইতে করাইতে তাহাদের ধীরে ধীরে হরিময় বানান যায়। কিন্তু নির্গুণে সব বন্ধ—জিভ বন্ধ, কান বন্ধ, হাত-পা বন্ধ। বন্দীপনার এই সব রূপ দেখিয়া বেচারা সাধক ঘাবড়াইয়া যায়! তাহার চিত্তে নির্গুণ তবে আসর পাতিবে কিরূপে? সে যদি নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে ত মনে আজেবাজে চিন্তা খেলিতে থাকে। ইন্দ্রিয়ের স্বভাব এই যে তাকে যাহা করিতে নিষেধ করিবে, সে তাহা করিবেই। বিজ্ঞাপনেরও তাই নয় কি? উপরে লিখিয়া দেয় 'পড়ো না।' পাঠক মনে মনে বলে, "কেন পড়বো না? এটাই আগে পড়া যাক।" 'পড়ো না' বলার উদ্দেশ্য অবশ্যই পড়িবে। লোকে তাহা আগ্রহে পড়েও। নির্গুণে মন দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকিবে। সগুণ ভক্তিতে তদ্রূপ নহে। সেখানে আরতি আছে, পূজা আছে, সেবা আছে, ভূতে দয়া আছে। ইন্দ্রিয়ের জন্য সেখানে কাজ আছে। ইন্দ্রিয়গুলিকে ঠিক কাজে লাগাইয়া দাও আর বল, "এবার যেখানে ইচ্ছা যা।" কিন্তু মন তখন দৌড়াইবে না। উহাতে ডুবিয়া যাইবে, অজ্ঞাতে একাগ্র হইবে। কিন্তু জোর করিয়া তাদের যদি কোথাও বসাইতে যাও ত ছুটিয়া পালাইবে। ভিন্ন ভিন্ন

ইন্দ্রিয়কে দিব্য কাজে, সুন্দর কর্মে লাগাইয়া দাও আর তারপরে মনকে বল যেমন ইচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াও। তাহা দৌড়াদৌড়ি করিবে না। যাওয়ার খোলা ছুটি দাও ত বলিবে, "এখানে আমি থাকব।" 'চুপ করে বস' এই হুকুম করিয়াছ ত সে বলিবে, "এই আমি চল্লুম।"

সহজসাধ্যতার দিক হইতে দেহধারী মানুষের পক্ষে নিগুর্ণ অপেক্ষা সগুণ শ্রেষ্ঠ। কর্ম করিয়া কর্ম উড়াইয়া দেওয়ার কৌশল কর্ম না করিয়া কর্ম করার কৌশল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ তাহাতে সুলভতা রহিয়াছে। কর্মযোগে প্রযত্নের, বারংবার চেষ্টার সুযোগ আছে। ইন্দ্রিসমূহকে বশে আনিয়া আস্তে আস্তে সকল প্রযত্ন হইতে মনকে উঠাইয়া লওয়ার চেষ্টা করার সুযোগ কর্মযোগে আছে। আজ ঐ কৌশল আয়ত্ত না হইলেও আয়ত্তের বাহিরে নহে। কর্মযোগ অনুকরণ-সুলভ। আর এখানেই সন্ন্যাসের তুলনায় ইহার বিশেষত্ব। কিন্তু পূর্ণাবস্থায় কর্মযোগ ও সন্ন্যাস দুইই এক। নাম দুই, দেখিতে পৃথক পৃথক, কিন্তু আসলে দুই এক। একটিতে দেখা যায় কর্মের ভূত বাহিরে নাচিতেছে, কিন্তু ভিতরে শান্তি বিরাজিত। অপরটিতে রহিয়াছে কিছু না করিয়াও ত্রিভুবন ওলট-পালট করার শক্তি। যাহা দেখা যায় তাহা নয় এই হইতেছে এই দুইয়ের স্বরূপ। পূর্ণ কর্মযোগ সন্ন্যাস হয় ত পূর্ণ সন্ন্যাস কর্মযোগ। কোন ব্যবধান নাই। কিন্তু সাধকের দৃষ্টিতে কর্মযোগ সহজ। পূর্ণাবস্থায় দুইই এক।

জ্ঞানদেবকে চাঙ্গদেব একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি ছিল স্রেফ্ সাদা কাগজ। জ্ঞানদেব ছিলেন চাংগদেব হইতে বয়সে ছোট। 'চিরজীবেষু' লেখা যায় না। জ্ঞানদেব জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' লেখা চলে না। বয়সে জ্ঞানদেব ছোট। তাই চাংগদেব সাদা কাগজই পাঠাইয়া দিলেন। সে কাগজ প্রথমে নিবৃত্তিনাথের হাতে পড়ে। তিনি সেই সাদা কাগজ পড়িলেন। জ্ঞানদেবের হাতে দিলেন। জ্ঞানদেব পড়িয়া মুক্তাবাঈকে দিলেন। মুক্তাবাঈ পড়িয়া কহিলেন, "চাংগদেব এত বড় হয়েছেন, কিন্তু আজও তিনি সেই কোরা, আন-কোরা।" নিবৃত্তিনাথ পাইলেন অন্য অর্থ। তিনি কহিলেন, "চাংগদেব তেমনি সরল, শুদ্ধ, নির্মল। উপদেশ দেওয়ার অধিকারী। একথা বলিয়া জ্ঞানদেবকে উত্তর দিতে বলিলেন।

জ্ঞানদেব ৬৫টি ওবীতে* পত্রের উত্তর দিলেন। উহাকে 'চাঙ্গদেব পাসষ্টী' বলে। এমনি মজাদার এই পত্রের বৃত্তান্ত। লেখা পড়া সহজ, কিন্তু অ-লেখা পড়া কঠিন। তাহা পড়িয়া শেষ করা যায় না। তদ্রূপ সন্ন্যাসী দেখিতে কর্মশূন্য, রিক্ত দেখাইলেও তাহাতে অপরিসীম কর্ম ভরা থাকে।

পূর্ণ সন্ন্যাস ও পূর্ণ কর্মযোগের মূল্য এক সমান। কিন্তু তদতিরিক্ত কর্মযোগের ব্যবহারিক মূল্য অধিক। একখানি নোট, মূল্য তার পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকার মুদ্রাও আছে। সরকার না বদলান পর্যন্ত উভয়ের মূল্য এক সমান। কিন্তু সরকার বদলিয়া গেলে নোটের ব্যবহারিক মূল্য এক পয়সাও থাকে না। কিন্তু সোনার মুদ্রার মূল্য কিছু-না-কিছু থাকেই। কারণ মূলত তাহা সোনা। পূর্ণাবস্থায় কর্মত্যাগ ও কর্মযোগের মূল্য একেবারে সমান। কারণ জ্ঞান উভয়েই রহিয়াছে। জ্ঞানের মূল্য অনন্ত। অনন্তে কিছু যোগ করিলে মূল্য অনন্তই থাকে। ইহা গণিতশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ যখন পরিপূর্ণ জ্ঞানে মিলিয়া যায় তখন উভয়ের মূল্য সমান। কিন্তু উভয় হইতে যদি জ্ঞান বাদ দেওয়া যায় তবে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ সাধকের কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হইবে। উভয় দিকে পূর্ণ শুদ্ধ জ্ঞান রাখ ত মূল্য এক। গন্তব্যে পৌঁছিলে জ্ঞান+কর্ম=জ্ঞান+কর্মাভাব। কিন্তু উভয় দিক হইতে জ্ঞান সরাইয়া লও ত তখন কর্মের অভাব অপেক্ষা কর্মই সাধকের কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হইবে। না করিয়া করা ইহা সাধক বুঝে না। কর্মযোগ যেমন মার্গে তেমন গন্তব্যে রহিয়াছে। কিন্তু সন্ন্যাস কেবল গন্তব্যেই স্থিত, মার্গে নহে। শাস্ত্রের ভাষায় বলিলে, কর্মযোগ সাধনও বটে আর নিষ্ঠাও বটে। কিন্তু সন্ন্যাস নিছক নিষ্ঠা। নিষ্ঠা মানে অন্তিম অবস্থা।

রবিবার ২০-৩-৩২

---

*ওবী এক মারাঠী ছন্দ। মহারাষ্ট্রের সাধুপুরুষেরা জনসাধারণের কাছে তাঁহাদের বাণী পৌঁছাইবার কাজে এই ছন্দের খুব ব্যবহার করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের মহিলারা ধান-ভানিতে, গম-পিষিতে, শিশুদের ঘুম-পাড়াইতে ও দোলনা দোলাইতে 'ওবী' আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(২৫)

বন্ধুগণ,

মানুষ যে কত ঊর্ধ্বে বিচরণ করিতে পারে, কল্পনা ও বিচার সহায়ে তাহা আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিয়াছি। কর্ম বিকর্ম অকর্ম মিলিয়া সকল সাধনা পূর্ণ হয়। কর্ম স্থূল বস্তু। যে সব স্বধর্ম-কর্ম আমরা করি তাহাতে আমাদের মনের সহযোগ থাকা চাই। মানসিক শিক্ষার জন্য যে কর্ম করা হয় তাহা বিকর্ম, বিশেষ কর্ম, কিম্বা স্থূল কর্ম। কর্ম ও অকর্ম দুইই দরকার। এই দুইয়ের আচরণ করিতে করিতে অকর্মের ভূমিকা প্রস্তুত হয়। এই ভূমিকাতে কর্ম ও সন্ন্যাস দুইই যে একরূপ তাহা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি। এখন ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভে আবার বলা হইয়াছে যে, কর্মযোগের ভূমিকা সন্ন্যাসের ভূমিকা হইতে ভিন্ন মনে হইলেও বস্তুত অক্ষরে অক্ষরে একরূপ। কেবল দৃষ্টির ব্যবধান। পঞ্চম অধ্যায়ে যে অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে সে অবস্থায় পৌঁছানর উপায় অনুসন্ধান হইতেছে পরবর্তী এই অধ্যায়ের বিষয়।

পরমার্থ, গীতা আদি গ্রন্থ এ সব কেবল সাধুদের জন্য এরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা কিছু লোকের আছে। কোন লোক বলিল, "আমি কিছু সাধু নই।" ইহার অর্থ এই যে সাধু নামে এক জীব আছে আর সে তাহাদের এক জন নহে। ঘোড়া, সিংহ, ভালুক, গাভী আদি প্রাণী যেমন, তেমন সাধু নামে এক প্রাণী আছে, আর পরমার্থের ভাবনা কেবল তাহাদেরই জন্য। অবশিষ্ট ব্যবহারিক জগতের লোকেরা যেন অন্য জাতির,—বিচারে পৃথক, আচারে ভিন্ন। এই ভাবনা হেতু সাধু-সন্ত ও ব্যবহারিক লোক এই দুইকে পৃথক করা হইয়াছে। গীতা-রহস্যে তিলক একথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গীতা-গ্রন্থ সর্বসাধারণ ব্যবহারিক লোকের জন্য তিলকের একথা আমি অক্ষরশঃ ঠিক মনে করি। ভগবদ্গীতা সমস্ত সংসারের জন্য। পরমার্থ-বিষয়ক সব সাধন যে কোন ব্যবহারিক লোকের জন্য। নিজ

আচরণ শুদ্ধ ও নির্মল করিয়া কিভাবে মনের সমাধান* ও শান্তি লাভ করা যায়, পরমার্থ সেই শিক্ষাই দেয়। ব্যবহার কিরূপে শুদ্ধ করা যায় তারই জন্য গীতা। তুমি যখনই কোন আচরণ কর তখনই গীতা আসিয়া যায়। কিন্তু গীতা সেখানেই তোমাকে রাখিতে চাহে না। তোমার হাত ধরিয়া গীতা তোমাকে অন্তিম গন্তব্যে লইয়া যাইবে। সেই প্রসিদ্ধ প্রবাদ-বাক্যের কথা কে না জানে 'পর্বত মহম্মদের কাছে না আসিলে, মহম্মদ পর্বতের কাছে যাইবে।' মহম্মদের চিন্তা, জড় পর্বতের কাছেও তাঁহার কথা পৌঁছাইবেন। পর্বত ত জড়। তাই মহম্মদ তার আসার প্রতীক্ষায় থাকিবেন না। গীতার কথাও তাহাই। গরীব, দুর্বল, মূর্খেরও যে মূর্খ তাহার কাছেও গীতা যাইবে। কিন্তু যেখানে সে আছে তাকে সেখানে রাখার জন্য যাইবে না, যাইবে তাকে হাত ধরিয়া আগে লইয়া যাওয়ার জন্য, উপরে তোলার জন্য। মানুষ নিজ আচরণ শুদ্ধ করিয়া পরম উচ্চ অবস্থায় পৌঁছুক ইহাই গীতা চায়। আর তার জন্যই গীতার জন্ম।

অতএব 'আমি জড়, আমি বিষয়ী লোক, সংসারিক জীব' একথা বলিয়া নিজের চারিদিকে দেয়াল টানিও না। বলিও না, 'আমার দ্বারা কি হবে। এই সাড়ে তিন হাত দেহেই আমার যথা সর্বস্ব।' বন্ধনের এই-রূপ প্রাচীর, কারাপ্রাচীর নিজের চারিদিকে খাড়া করিয়া পশুর মত আচরণ করিও না। অগ্রসর হওয়ার, ঊর্ধ্বে আরোহণ করার সাহস ধর।

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েত্'

আমি নিজকে ঊর্ধ্বে লইয়া যাইব এই সাহস রাখ। আমি ক্ষুদ্র সাংসারিক জীব একথা ভাবিয়া মনের শক্তি খোয়াইও না। কল্পনার ডানা ছিঁড়িয়া ফেলিও না। কল্পনা বিশাল কর। শালিক সেই উদাহরণই আমাদের সামনে ধরে না কি? ভোরে সূর্য দেখিয়া শালিক বলে, আমি উড়িয়া গিয়া সূর্যকে ধরিব। আমাদের তেমন হইতে হইবে। শালিক তার দুর্বল ডানা সহায়ে যতই উচ্চে উঠুক না কেন, সূর্যে সে পৌঁছিবে কি প্রকারে? কিন্তু কল্পনাশক্তি প্রভাবে সে নিশ্চয়ই সূর্যতক যাইতে পারে।

---

* সমাধান-সন্তুষ্টি; সব কিছু হইতে তুলিয়া লইয়া মনকে ব্রহ্মে লীন করা।

আমাদের আচরণ তদ্বিপরীত। আমরা যতটা উঁচুতে উঠিতে পারিতাম তত-দূর না উঠিয়া, নিজেদের কল্পনা ও ভাবনাকে বন্ধনে আড়ষ্ট করিয়া আমরা নিজেদের আরও নীচে ফেলিয়া দিই। হাতে পাওয়া শক্তি হীন ভাবনা হেতু নষ্ট করিয়া ফেলি। যেখানে কল্পনার পা-ই খোঁড়া করা হইয়াছে সেখানে নীচে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে কি? অতএব কল্পনার গতি ঊর্ধ্বমুখী হওয়া চাই। মানুষ কল্পনার সহায়তায় অগ্রসর হয়। তাই কল্পনাকে সংকুচিত করিবে না।

"স্থূল মার্গ ছেড়ো না।
থাক পড়ে জগতে, এদিক-সেদিক ব্যর্থ ঘুরে মরো না।"

এরূপ কান্না জুড়িও না। আত্মার অপমান করিও না। সাধনায় যদি বিশাল ভাব থাকে, আত্মবিশ্বাস থাকে তবে সাধকের মার নাই। তাহার দ্বারা উদ্ধার হইবে। ধর্ম ত কেবল সাধুদের জন্য, সাধুসংগ লোকে করে ত, "যা করছ তোমার অবস্থায় তা-ই ঠিক" তাঁদের কাছ হইতে স্রেফ্ এই সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য, এই যে ভাব তা মন হইতে দূর করিয়া দাও। এইরূপ ভেদাত্মক কল্পনা করিয়া নিজকে বন্ধনে বাঁধিও না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ যদি না কর ত এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না।

এই দৃষ্টি, এই আকাঙ্ক্ষা, এই মহান ভাবনা যদি আসে তবে না সাধনার আঁট-গাঁট বাঁধা দরকার, নয়তো সবই ফক্কিকার। বাহ্য কর্মের সহযোগীরূপে মানসিক সাধনরূপ বিকর্মের নির্দেশ করা হইয়াছে। কর্মের সহায়তার জন্য বিকর্ম নিরন্তর দরকার। এই দুইয়ের সহায়তায় অকর্ম নামক যে দিব্য অবস্থা লাভ হয় সেই অকর্ম ও অকর্মের রূপ পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি। এই ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে বিকর্মের প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে। মানসিক সাধনার কথা বলা হইয়াছে। এই মানসিক সাধনা বুঝাইবার আগে গীতা বলিতেছে, "বাবা, জীব তুমি দেবতা হতে সক্ষম। তুমি এই দিব্য ভাবনা পোষণ কর। মন মুক্ত রেখে ডানা দৃঢ় কর।" সাধনার—বিকর্মের পৃথক পৃথক প্রকার আছে। যথা—ভক্তিযোগ, ধ্যান, জ্ঞানবিজ্ঞান গুণ-বিকাশ, আত্মানাত্ম-বিবেক আদি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ নামক সাধন-প্রকারের কথা বলা হইয়াছে।

(২৬)

ধ্যানযোগে তিনটি বিষয় মুখ্য। (১) চিত্তের একাগ্রতা (২) চিত্তের একাগ্রতার নিমিত্ত প্রয়োজনানুরূপ জীবন-পরিমিততা ও (৩) সাম্যদশা বা সমদৃষ্টি। এই তিন বস্তু ছাড়া যথার্থ সাধনা সম্ভব নয়। চিত্তের একাগ্রতা মানে চিত্তের চঞ্চলতার উপর অংকুশ। জীবনের পরিমিততা মানে সকল ক্রিয়া মাপ-জোক করিয়া করা। সমদৃষ্টি মানে বিশ্বকে উদার দৃষ্টিতে দেখা। এই তিনের সংযোগে ধ্যানযোগ হয়। এই তিন সাধনেরও আবার সাধন আছে। তাহা হইতেছে প্রযত্ন ও বৈরাগ্য। এই পাঁচের একটু আলোচনা এখানে করিব।

প্রথমে চিত্তের একাগ্রতা। যে কোন কাজের জন্য চিত্তের একাগ্রতা দরকার। বৈষয়িক ব্যাপারেও চিত্তের একাগ্রতা চাই। বিষয় কর্মের জন্য এক পৃথক গুণ আর পরমার্থের জন্য আর এক গুণ দরকার, তাহা নয়। ব্যবহার শুদ্ধ করার মানেই পরমার্থ। ব্যবহার (কর্ম) যেমনই হোক, তার ভালমন্দ, সফলতা-নিষ্ফলতা আপনার একাগ্রতা অনুযায়ী হইবে। ব্যাপার, ব্যবহার, শাস্ত্র-শোধন, রাজনীতি, কূটনীতি যে কোনটি ধরুন, প্রত্যেক স্থলে তাহাতে লিপ্ত ব্যক্তির একাগ্রতা অনুসারে ফল লাভ হয়। নেপোলিয়নের সম্বন্ধে বলা হয় যে যুদ্ধের ব্যবস্থা একবার ঠিক মত করিয়া দিতেন ত তাহা গণিতের সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিত। তাঁবুতে গোলা পড়ে, সৈন্য মরে, কিন্তু নেপোলিয়নের চিত্ত গণিতে নিবিষ্ট। নেপোলিয়নের একাগ্রতা অতি প্রগাঢ় ছিল একথা আমি বলি না। তাহা হইতে উচ্চতর একাগ্রতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার একাগ্রতার মাত্রা লক্ষ্য করিতে বলিতেছি মাত্র। খলিফা ওমরের সম্বন্ধেও এরূপ কথিত আছে। যুদ্ধ চলিতেছে, নমাজের সময় হইয়াছে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে হাঁটু গাড়িয়া নমাজ পড়িতে বসিতেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্ত এমন একাগ্র হইয়া যাইত যে তিনি টেরও পাইতেন না কাহার লোক কাটা যাইতেছে, মরিতেছে। সুরুতে মুসলমানদের এরূপ ঈশ্বরনিষ্ঠা ছিল, এরূপ একাগ্রতা ছিল তাই না ইস্‌লামধর্মের প্রসার হইয়াছিল।

এই সেদিন এক ফকিরের কথা শুনিয়াছি। তাহার শরীরে তীর বিঁধিয়াছিল। খুব যাতনা হইতেছিল। তীর বাহির করিতে গেলে যাতনা

বাড়িবে। তাই তোলা যাইতেছিল না। ক্লোরোফর্মের মত বেহুঁশ করার ঔষধ তখন ছিল না। সমস্যা কঠিন। ফকিরকে জানিত এমন একজন বলিল, "তীর এখন তুলতে যাবেন না। ইনি যখন নমাজ পড়তে বসবেন তখন তুলে নেবেন।" সান্ধ্য-নমাজে ফকির বসিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চিত্ত এমন একাগ্র হইল যে তীর তাঁহার শরীর হইতে তুলিয়া লওয়া হইল। টেরও তিনি পাইলেন না। কেমন প্রগাঢ় ঐ একাগ্রতা!

সারাংশ, কর্মই বলুন বা পরমার্থই বলুন, চিত্তের একাগ্রতা ছাড়া তাহাতে সাফল্য লাভ করা কঠিন। চিত্ত একাগ্র হইলে সামর্থ্যের কখনও অভাব হয় না। ষাট বছর বয়সেও আপনাতে যুবকের মত উৎসাহ ও সামর্থ্য দেখা যাইবে। মানুষ যত বৃদ্ধ হইবে তাহার মন তত বেশী পরিপক্ক হইবে—এই ত হওয়া চাই। ফলের কথা ধরুন। প্রথমে থাকে তাহা সবুজ, পরে পাকে, পরে পচে, শেষ হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরে বীজ দিন দিন ঝুনো শক্ত হইতে থাকে। এই বাহ্য শরীর পচিবে, গলিবে। কিন্তু বাহ্য শরীর ফলের সারসর্বস্ব নহে। ফলের সারসর্বস্ব ফলের আত্মা, বীজ। শরীরের কথায়ও তাহাই। শরীর বৃদ্ধ হোক না, কিন্তু স্মরণশক্তি ত বাড়িতে থাকা চাই। বুদ্ধি তেজস্বী হওয়া চাই। কিন্তু তাহা হয় না। মানুষে বলে, "আজকাল আমার স্মরণ-শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।" "কেন?" "বুড়ো হয়ে গেছি।" তোমার জ্ঞান, তোমার বিদ্যা, তোমার স্মরণশক্তি তাহা তোমার বীজ। বার্ধক্যের সাথে সাথে শরীর শিথিল হইতে থাকিবে, কিন্তু ভিতরের আত্মা তেমন তেমন অধিক বলবান হওয়া চাই। তার জন্য একাগ্রতা দরকার।

(২৭)

একাগ্রতা আনিতে হইবে। কিন্তু তার উপায়? তার জন্য কি করা চাই? ভগবান বলিয়াছেন, আত্মায় মন স্থির কর ঃ

"ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েত্"—অন্য কিছু চিন্তা করিও না।

কিন্তু তাহা করার উপায়? মনকে স্থির করা সে মস্ত ব্যাপার। চিন্তার চক্রকে জোর করিয়া না থামাইলে একাগ্রতা কোথা হইতে আসিবে? বাহিরের চক্র না হয় যেমন-তেমন করিয়া থামাইলে, কিন্তু ভিতরের চক্র ত চলিতেই থাকে।

চিত্তের একাগ্রতার জন্য বাহ্য উপায় যতই অবলম্বন করিবে ভিতরের চক্র তত অধিক বেগে চলিতে থাকিবে। আপনি আসন করিলেন, সোজা হইয়া বসিলেন, চক্ষু স্থির করিলেন। কিন্তু তাহাতে মন একাগ্র হইবে, তা নয়। আসল কথা মনের চক্র বন্ধ করা চাই।

বাহিরের অপার সংসার মনে ঘর বাঁধিয়া রহিয়াছে। তাহা বন্ধ করা ছাড়া একাগ্রতা অসম্ভব। আত্মার অসীম জ্ঞানশক্তি ক্ষুদ্র বাহ্য বস্তুতে আমরা খরচ করিয়া ফেলি। তাহা ত ঠিক নয়। অপরকে না লুটিয়া নিজ চেষ্টায় যে ধনী হইয়াছে সে যেমন অযথা খরচ করে না, তেমন আত্মার জ্ঞান-শক্তি ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তায় আমাদের ব্যয় করা উচিত নহে। এই জ্ঞানশক্তি আমাদের অমূল্য পুঁজি। কিন্তু স্থূল বিষয়ে তাহা আমরা খরচ করিয়া ফেলি। বলি তরকারি ভাল হয় নাই। লবণ কম হইয়াছে। কয় রতি কম হইয়াছে, ভাই? কণাভর লবণ কম হইয়াছে এই মহান্ বিচারেই আমাদের জ্ঞান খরচ হইয়া যায়। দেয়াল-ঘেরা ঘরে ছেলেদের পড়ান হয়। বলা হয় গাছতলায় গিয়া বসিলে কাক-কোকিল দেখিয়া তাহাদের মন একাগ্র হইবে না। এ ত শিশুর মতই কথা। কাক-কোকিল দেখিতে পায় না ত হইয়া গেল একাগ্রতা। কিন্তু আমরা হইয়াছি ঘোড়ার মত। আমাদের শিং গজাইয়াছে। কেহ যদি আমাদের সাত দেয়ালের ভিতরেও পুরিয়া দেয় ত আমাদের একাগ্রতা হইবার নহে। কারণ দুনিয়ার ছোট-বড় সব ব্যাপারের চর্চা করা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। যে জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বর লাভ হইতে পারে তাহা আমরা তরকারির সোয়াদের চর্চায় খরচ করি আর কৃতার্থ মনে করি!

এভাবে এ ভয়ানক সংসার আমাদের চারিদিকে সাঁ সাঁ করিতেছে। প্রার্থনা করি, ভজন গাই। তাহাও বাহ্য কারণে। পরমেশ্বরে তন্ময় হইয়া ক্ষণিকের জন্যও সংসার ভুলিয়া যাওয়ার কথা ভাবি না। প্রার্থনা যেখানে লোক দেখানর জন্য সেখানে আসন করিয়া বসা আর চক্ষু বুজা সবই বৃথা। মনের গতি নিরন্তর বাহিরে ধাবিত হওয়ায় মানুষের সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কোনরূপ নির্ণয়, কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ শক্তি মানুষে থাকে না। একথার প্রমাণ আজ আমাদের দেশে যেখানে-সেখানে মিলে। ভারতবর্ষ বাস্তবপক্ষে পরমার্থ ভূমি। লোকে জানে এখানকার লোক সেই যুগেই ঊর্ধ্বে বিচরণ করিত।

কিন্তু এরূপ যে দেশ সেখানে আপনার আমার অবস্থা কি! নেহাত ছোট-খাটো ব্যাপারের এমন গভীর চর্চা আমরা করি যে দেখিয়া দুঃখ হয়। ক্ষুদ্র বিষয়ে চিত্ত ডুবিয়া থাকে।

কথা-পুরাণ-শ্রবণে, মিঠে নিদ আসে নয়নে।
শুয়েছি কি বিছানায়, ঘেরেছে শত চিন্তায়।
এমনি কর্মের গতি, কে'দে নাই তা থেকে নিষ্কৃতি।

কথা পুরাণ শুনিতে যাই ত নিদ্রা পায় আর ঘুমাইতে যাই ত চিন্তা ও বিচার-চক্র সুরু হয়। একদিকে শূন্যাগ্রতা ত অন্যদিকে অনেকাগ্রতা। একাগ্রতা কোথাও নাই। মানুষ এমনই ইন্দ্রিয়ের দাস। কেহ একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "চোখ আধা বুজে থাকবে, এরূপ বলা হয়েছে কেন?" তাহাকে আমি বলিয়াছিলাম, "সোজা কথা। চোখ পুরা বন্ধ করলে ঘুম পায়। খোলা রাখলে চারদিকে ধায়। একাগ্রতা আসে না। চোখ বুজলে ঘুম পায় এ হচ্ছে তমোগুণ। খুলে রাখলে চারদিকে দৌড়ায় এ হচ্ছে রজোগুণ। তাই মধ্যাবস্থার কথা বলা হয়েছে।" তাৎপর্য, মনের অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া একাগ্রতা হয় না। মনের অবস্থা শুদ্ধ হওয়া চাই। কেবল আসনে বসিলে তাহা হয় না। তার জন্য সকল আচরণ শুদ্ধ হওয়া চাই। আচরণ শুদ্ধ করার মানে আচরণের উদ্দেশ্য বদলান। ব্যক্তিগত লাভ, বাসনাতৃপ্তি কিংবা তদ্রূপ বাহ্য বিষয়ের জন্য কর্ম করিতে নাই।

সারাদিন আমরা কর্ম করি। সারাদিনব্যাপী এই দৌড়-ঝাঁপ কেন?

অন্তিম ঘড়ি হবে সুখময়।
তার জন্যেই না এত মেহনত॥

আমাদের অন্তিম দিবস সুখের হোক তার জন্যেই না যত কিছু ভাবনা-চিন্তা, যত কিছু দৌড়-ঝাঁপ। জীবনভর তিক্ত বিষ কেন হজম করিয়াছি? সেই অন্তিম দিবস, সেই মৃত্যু পবিত্র যেন হয় এই বাসনায়। সন্ধ্যা দিবসের অন্তিম ক্ষণ। আজিকার দিনের সকল কর্ম যদি পবিত্র ভাবনা হইতে করা হইয়া থাকে ত রাত্রির প্রার্থনা মধুর হইবে। দিনের ঐ অন্তিম ক্ষণ যদি মধুর হইয়া থাকে তবে বুঝিবে দিনের সকল কাজ সফল হইয়াছে। তখন আমার মন একাগ্র হইবে।

একাগ্রতার জন্য এরূপ জীবন-শুদ্ধি আবশ্যক। বাহ্য বস্তুর চিন্তন দূর হওয়া চাই। মানুষের আয়ু দীর্ঘ নহে। তাহা হইলেও ভাগবত সুখের আস্বাদ লাভের সামর্থ্য এই আয়ুতেই আছে। দুইটি লোক। একই তাদের কর্ম, আর একই ছাপ,—দুই চোখ, তার মধ্যে এক নাক আর নাকে দুই নাসা-রন্ধ্র। এইরূপ সম্পূর্ণ এক রকমের হইলেও এক জন দেবতুল্য হয় ত আর এক জন পশুতুল্য। এরূপ কেন হয়? একই পরমেশ্বরের সন্তান

'সব-ই এক খনির'

তবু কেন এই ব্যবধান? মনে হয় না এই দুই একই জাতির। এক নরে নারায়ণ ত আর এক নরে বানর!

মানুষ যে কত উচ্চে উঠিতে পারে তাহা সপ্রমাণ করিবার মত লোক আগেও ছিল আর আজও আছে। তাহা অনুভবের কথা। এই নরদেহে কত শক্তি আছে তাহা প্রদর্শনকারী সন্ত আগেও ছিলেন আর আজও আছেন। এই দেহে থাকিয়া মানুষ যদি এরূপ অদ্ভুত করণী করিতে পারে তবে আমিই বা করিতে পারিব না কেন? ভাল, কেন আমি নিজ কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করিতে যাই? যে নরদেহে থাকিয়া অন্যে নরবীর হইয়াছে, সে নরদেহ আমিও পাইয়াছি, তবে আমার এ দশা কেন? কোথাও-না-কোথা আমাতে ত্রুটি আছে। আমার এই চিত্ত অনুক্ষণ বাহিরে দৌড়াদৌড়ি করে। অন্যের দোষ-গুণ দেখিতে তাহা একান্ত উৎসুক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্যের দোষ দেখার আমার প্রয়োজন কি?

কেন খুঁজতে যাই দোষ পরের।
আছে কি কমতি আমার নিজের॥

স্বয়ং আমাতে কি দোষ কিছু কম! অন্যের ছোট-খাটো কথা লইয়া যদি তন্ময় থাকি ত আমার চিত্তের একাগ্রতা আসিবে কিরূপে? সেই অবস্থায় আমার দুই অবস্থা হইতে পারে। এক—শূন্য অবস্থা অর্থাৎ নিদ্রা, আর দুই—অনেকাগ্রতা। তমোগুণ ও রজোগুণে আমি পাক খাইতে থাকিব।

চিত্তের একাগ্রতার নিমিত্ত এভাবে বস, এভাবে চক্ষু রাখ, এভাবে আসন কর একথা ভগবান অবশ্যই বলিয়াছেন। কিন্তু চিত্তের একাগ্রতার

জন্য ব্যাকুল হইলে না এসব কাজে লাগিবে। চিত্তের একাগ্রতা চাই এই ভাবনা চিত্ত অধিকার করিয়াছে ত মানুষ নিজেই সেই পথ খুঁজিয়া লইবে।

(২৮)

চিত্তের একাগ্রতার পক্ষে আর এক সহায়ক হইতেছে জীবনের পরিমিততা। আমাদের সব কাজ মাপা-জোকা হওয়া চাই। গণিতশাস্ত্রের এই রহস্য অনুযায়ী সকল কর্ম হওয়া চাই। ঔষধের মত আহার-নিদ্রারও মাত্রা থাকা চাই। সর্বত্র মাপ-জোক চাই। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপর পাহারা বসান দরকার। অধিক খাই না ত, অধিক ঘুমাই না ত, প্রয়োজনের অধিক দেখি না ত—নিরন্তর এরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা চাই।

এক ব্যক্তি কোন লোকের সম্বন্ধে আমাকে বলিতেছিলেন যে কাহারও ঘরে গেলে ঘরের কোথায় কি আছে মুহূর্ত মধ্যে তাহার দৃষ্টি তার উপর পড়িত। আমি মনে মনে বলিয়াছিলাম, "ভগবান, এ মহিমায় আমার দরকার নাই।" আমি কি তাহার সেক্রেটারী যে সাত-সতের জিনিষের হিসাব মনে রাখিব? অথবা আমাকে কি চুরি করিতে হইবে? সাবান এখানে ছিল, ঘড়ি ওখানে ছিল তাহাতে আমার কি কাজ? এ জ্ঞানে আমার কি দরকার? চোখের এ ব্যর্থ ব্যবহার আমার ত্যাগ করিতে হইবে। কানের সম্বন্ধেও তাই। পাহারা বসাও। কেহ কেহ মনে করে, কুকুরের কানের মত যদি আমাদের কান হইত তবে বেশ হইত! যেদিকে ইচ্ছা মুহূর্ত মধ্যে ফিরান যাইত। ভগবান মানুষের কানে এ ত্রুটি রাখিয়াছেন। কিন্তু কানের এই প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি আমার দরকার নাই। তদ্রূপ এই মনও খুব জবরদস্ত। একটু শব্দ হইয়াছে ত মন সেখানে গিয়া হাজির। অতএব জীবনে নিয়মন ও পরিমিততা আন। কুদৃশ্য দেখিও না। মন্দ বই পড়িও না। নিন্দাস্তুতি শুনিও না। সদোষ বস্তু ত নয়ই, নির্দোষ বস্তুও প্রয়োজনের অধিক লইবে না। লোলুপতা আদৌ নয়। মদ, তেলেভাজা, রসগোল্লা ত নয়ই। কমলা, কলা, মোসাম্বি তাও অধিক নয়। ফলাহার শুদ্ধ ত বটেই। কিন্তু তাহাও মাত্রা ছাড়াইয়া নয়। জিহ্বের স্বেচ্ছাচার অন্তর পুরুষের অসহ্য হওয়া চাই। আঁকাবাঁকা পথে চলিলে ভিতরের মালিক সাজা

দিবেন এ ভয় ইন্দ্রিয়সমূহের থাকা চাই। নিয়মিত আচরণকেই জীবনের পরিমিততা কহে।

(২৯)

তৃতীয় কথা, সমদৃষ্টি হওয়া। সমদৃষ্টির অর্থই শুভদৃষ্টি। সম-দৃষ্টি লাভ না হইলে চিত্ত একাগ্র হইতে পারে না। সিংহ এত বড় বনরাজ। কিন্তু চার পা চলে ত একবার পেছন ফিরিয়া দেখে। হিংস্র সিংহের একাগ্রতা আসিবে কোথা হইতে? বাঘ, কাক, বিড়াল, এদের চোখ সতত ঘোরে। তাদের দৃষ্টি চঞ্চল ও ভয়চকিত। হিংস্র প্রাণীর অবস্থা এরূপই থাকিবে। সাম্যদৃষ্টি আসা চাই। সকল সৃষ্টি মঙ্গলময় মনে হওয়া চাই। নিজের উপর আমার যেরূপ বিশ্বাস তেমন বিশ্বাস সারা সৃষ্টির উপর হওয়া চাই। এখানে ভয়ের কি আছে? সবই শুভ, সবই পবিত্র।

"বিশ্বং তদ্ ভদ্রং যদবন্তি দেবাঃ"

এ বিশ্ব মঙ্গলময় কারণ ইহার দেখাশুনা করেন পরমেশ্বর। ইংরেজ কবি ব্রাউনিং এরূপই বলিয়াছেন :

"ঈশ্বর রয়েছেন আকাশে। তাই ত নাই গোল সংসারে॥"

জগতে কোন গণ্ডগোল নাই। থাকে ত তাহা আমার দৃষ্টিতে। যেমন আমার দৃষ্টি তেমন এ সৃষ্টি। লাল রঙের চশমা পরি ত সৃষ্টি লাল দেখাইবে, মনে হইবে জ্বলিতেছে।

রামদাস রামায়ণ লিখিতেন আর শিষ্যদের পড়িয়া শুনাইতেন। হনুমান ছদ্মবেশে আসিয়া তাহা শুনিতেন। সমর্থ লিখিয়াছিলেন, "হনুমান অশোক বনে গেলেন। সেখানে সাদা ফুল দেখলেন।" তাহা শুনিবা মাত্র হনুমান আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমি মোটেই সাদা ফুল দেখি নি, দেখেছিলাম লাল ফুল। ভুল লিখেছ। সংশোধন কর।" সমর্থ বলিলেন, "আমি ঠিক লিখেছি। সাদা ফুলই তুমি দেখেছিলে।" হনুমান বলিলেন, "আমি নিজে গিয়েছিলাম। আর আমি বলছি মিথ্যা?" শেষটায় ঝগড়া পৌঁছিল রামচন্দ্রের কাছে। রামচন্দ্র বলিলেন, "ফুল সাদাই ছিল। কিন্তু হনুমানের চোখ রাগে লাল হয়েছিল। তাই সাদা ফুল তার কাছে লাল মনে

হয়েছিল।" এই সুমধুর কাহিনীর তাৎপর্য এই যে জগত দেখার দৃষ্টি যেমন জগত মনে হয় তেমন।

এই সৃষ্টি শুভ এই নিশ্চিত বোধ যত দিন না জন্মে ততদিন একাগ্রতা আসে না। এ সৃষ্টি ভাল নয় এই ভাব যতদিন থাকিবে ততদিন ভয়চকিত দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিতে থাকিব। কবিরা পাখিদের স্বাধীনতার গান গাহিয়া থাকেন। তাঁহাদের বলিব, একবারটি পাখি হইয়া দেখুন, তখন বুঝিতে পারিবেন পাখিদের স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু। পাখির ঘাড় সতত সামনে-পেছনে ঘুরিয়া থাকে। সারাক্ষণ অন্যের ভয়। পক্ষীকে আসনে বসাইয়া দাও। ভাল, উহা কি একাগ্র হইয়া যাইবে? নিকটে গিয়াছি কি সে উড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সে মনে করিবে এই মারিল বুঝি ঢিল মাথায়। সমস্ত জগত ভক্ষক, সংহারক এই সাংঘাতিক ভয় যাহার মনে তাহার শান্তি কোথায়? আমার রক্ষক একমাত্র আমি নিজে, আর সবে ভক্ষক এই ভাব দূর না হইলে একাগ্রতা আসে না। সমদৃষ্টির ভাবনাই একাগ্রতা লাভের উত্তম উপায়। সর্বত্র মঙ্গল দেখিতে থাকুন, চিত্ত আপনা হইতে শান্ত হইবে।

কোন লোক দুঃখে পড়িয়াছে। তাহাকে কুলকুল করিয়া বহমানা নদীর কিনারায় লইয়া যান। নদীর নির্মল শান্ত প্রবাহ দেখিয়া তাহার অস্থিরতা কমিয়া যাইবে। সে দুঃখ ভুলিয়া যাইবে। ঐ ঝরনাতে এই শক্তি কোথা হইতে আসিল? পরমেশ্বরের কল্যাণকারী শক্তি উহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। বেদে ঝরনার সুন্দর বর্ণনা আছে ঃ

"অতিষ্ঠন্তীনাম্ অনিবেশনানাম্"

এই হইতেছে ঝরনা। ঝরনা অখন্ড বহিয়া চলে। তার ঘর-দ্বার নাই। সে সন্ন্যাসী। এই পবিত্র ঝরনা মুহূর্তে আমার মন একাগ্র করিয়া দেয়। ঐ সুন্দর ঝরনা দেখিয়া প্রেমের, জ্ঞানের ঝরনা আমার মনে আমি কেন না সৃষ্টি করিব?

বাহিরের এই জড় জল যদি আমার মনকে এতটা শান্তি দান করিতে সক্ষম, তবে আমার মানস-উপত্যকায় যদি ভক্তি ও জ্ঞানের চিন্ময় ঝরনা বহিতে থাকে ত আমার মন কতই না শান্তি লাভ করিবে? আমার এক বন্ধু

হিমালয় ভ্রমণে—কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তথাকার পবিত্র পর্বতের রমণীয় জল-প্রবাহের বর্ণনা আমাকে লিখিয়া পাঠাইতেন। তাঁহাকে আমি একথা লিখিয়াছিলাম, যে জল-স্রোত, যে পর্বতমালা, যে শুভ সমীর তোমাকে সেখানে অনুপম আনন্দ দিতেছে, সে সকলের উপলব্ধি আমার নিজ হৃদয়ে হইতে পারে। আমার অন্তঃসৃষ্টিতে সেই সকল রমণীয় দৃশ্য আমি নিত্য দেখিতে পাই। অতএব সেখানে ডাকিলেও নিজ হৃদয়ের ভব্যদিব্য হিমালয় ছাড়িয়া আমি আসিব না।

"স্থাবরদের মধ্যে আমি হিমালয়"

স্থিরতা লাভের জন্য স্থিরতার মূর্তি স্বরূপ যে হিমালয়ের উপাসনা করা দরকার, সেই হিমালয়ের বর্ণনায় লুব্ধ হইয়া আমি যদি কর্তব্য ছাড়ি ত তাহা হইবে বিপরীত ব্যাপার!

সারাংশ, চিত্ত একটু শান্ত করুন। সৃষ্টি মঙ্গল দৃষ্টিতে দেখুন। তখন হৃদয়ে অনন্ত ঝরনা বহিতে থাকিবে। কল্পনার দিব্য তারা হৃদয়াকাশে ঝিক্‌মিক করিতে থাকিবে, পাথরের ও মাটির শুভ বস্তু দেখিয়া চিত্ত যদি শান্ত হয় তবে অন্তঃসৃষ্টির দৃশ্য দেখিয়া কেন হইবে না? এক সময়ে আমি ত্রিবাঙ্কুরে গিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যাকালে সমুদ্র কিনারে বসিয়াছিলাম। ঐ অপার সমুদ্র, সেই ঘো-ঘো গর্জন, সায়ংকাল। আমি নিস্তব্ধ বসিয়াছিলাম। আমার বন্ধু খাওয়ার জন্য কিছু ফল ইত্যাদি সমুদ্রের কিনারায় আনিয়া দিলেন। সে সময়ে ঐ সাত্ত্বিক আহারও আমার কাছে বিষের মত লাগিয়াছিল। সমুদ্রের ঐ ওঁ ওঁ গর্জন আমাকে "মামনুস্মর যুদ্ধ্য চ" এই গীতা বচন স্মরণ করিয়া দিতেছিল। সমুদ্র অনুক্ষণ স্মরণ করিতেছিল ও কর্ম করিতেছিল। একটি ঢেউ আসে, চলিয়া যায়, আবার আসে। ক্ষণিকের তরেও বিরাম নাই। সে দৃশ্য দেখিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আখের, ঐ সমুদ্রে ছিল কি! সেই নোনা জলের ঢেউকে উথলিয়া উঠিতে দেখিয়া আমার হৃদয় যদি উথলিয়া উঠে তাহা হইলে জ্ঞান ও প্রেমের অগাধ সাগরকে হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইতে দেখিয়া কতই না নাচিব! বৈদিক ঋষিদের হৃদয়ে এইরূপ সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইত :

"অন্তঃসমুদ্রে হৃদি অন্তরায়ুষি
ঘৃতস্য ধারা অভিচাকশীমি
সমুদ্রাদূর্মির্মধুমানুদারত্"

এ দিব্য ভাষার উপর ভাষ্য লিখিতে গিয়া বেচারা ভাষ্যকারদের কিনা দুর্দশা হইয়াছিল। কেমন ঐ ঘৃতের ধারা? কেমন ঐ মধুর ধারা? আমার অন্তঃসমুদ্রে কি নোনা ঢেউ উঠিবে? না না। হৃদয়ে আমার দুধ-ঘি ও মধুর ঢেউ উঠিতেছে।

(৩০)

হৃদয়ের এই সমুদ্রকে দেখিতে শিখ। বাহিরের নিরভ্র নীল আকাশ দেখিয়া চিত্তকেও অলিপ্ত ও নির্মল বানাও। বস্তুত চিত্তের একাগ্রতা এক খেলা। সাধারণ কথা। চিত্তের ব্যগ্রতাই অস্বাভাবিক ও অনৈসর্গিক। শিশুদের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে দেখ। শিশু পলকহীন দৃষ্টিতে দেখে। তুমি দশ বার পলক মারিবে। শিশুর একাগ্রতা শীঘ্র হয়। চার-পাঁচ মাসের শিশুকে বাহিরের সবুজ সৃষ্টি দেখাও। এক দৃষ্টিতে সে দেখিতে থাকিবে। স্ত্রীলোকদের অভিনিবেশ এরূপ যে বাহিরের সবুজ দেখিয়া তাহাদের বিষ্ঠার রং পর্যন্ত সবুজ হইয়া যায়। সকল ইন্দ্রিয়কে চক্ষু বানাইয়া যেন তাহারা দেখে। শিশুদের মনে যে কোন ঘটনার গভীর ছাপ পড়ে। প্রথম দুই-চার বছরে শিশুরা যে শিক্ষা লাভ করে, শিক্ষাবিদ্দের মতে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আপনি যতই বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা ও সংঘ প্রতিষ্ঠা করুন না কেন, আরম্ভে যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে তাহা আর মিলিবার নয়। শিক্ষার সহিত আমার যোগ আছে। বাহিরের এই শিক্ষা যে শূন্যপ্রায়, এই বিশ্বাস আমার দিন দিন দৃঢ় হইতেছে। প্রারম্ভিক সংস্কার বজ্রলেপ হইয়া যায়। পরবর্তী শিক্ষা হইতেছে বাহিরের রং, উপরের চুনকাম। সাবান মাখিলে উপরের দাগ দূর হয়। কিন্তু গায়ের কাল রং যায় না। তদ্রূপ প্রারম্ভিক সংস্কার দূর হওয়া শক্ত।

ভাল, এই প্রারম্ভিক সংস্কারই বা বলবান কেন আর পরবর্তী সংস্কারই বা দুর্বল কেন? তার কারণ শিশুকালের চিত্তের একাগ্রতা নৈসর্গিক। একাগ্রতা হেতু যে সংস্কার গড়িয়া উঠে তাহা দূর হওয়ার নয়। এমনি মহত্ত্ব

চিত্তের এই একাগ্রতার। এই একাগ্রতা যে লাভ করিয়াছে তাহার কাছে কিছুই অসাধ্য নয়।

আমাদের সারা জীবন আজ কৃত্রিম হইয়া গিয়াছে। বালবৃত্তি মরিয়া গিয়াছে। জীবনে সত্যিকার রস নাই। জীবন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমরা আঁকাবাঁকা, যেমন-তেমন চলিতেছি। বানর মানুষের পূর্বজ ছিল একথা ডারউইন নহে, আমরাই আমাদের আচরণে সপ্রমাণ করিতেছি।

শিশু আস্থাপরায়ণ। মা যাহা বলে তাহা তার কাছে প্রমাণ। তাহাদের যে গল্প বলা হয় তাহা তাহাদের কাছে অসত্য মনে হয় না। কাক বলিল, পাখি বলিল, সবই তাহার কাছে সত্য মনে হয়। এই মঙ্গল বৃত্তির দরুন একাগ্রতা তাহাদের শীঘ্র আসে।

(৩১)

সারাংশ, ধ্যানযোগের জন্য চিত্তের একাগ্রতা, জীবনের পরিমিততা ও শুভ সাম্যদৃষ্টি আবশ্যক। তা বাদে আরও দুইটি উপায় বা সাধনের কথা বলা হয়—বৈরাগ্য ও অভ্যাস। একটি হইতেছে ধ্বংসকারী আর অপরটি সৃজনী। ক্ষেত হইতে ঘাস উপড়াইয়া ফেলা বিধ্বংসী কর্ম। উহাকে বৈরাগ্য বলে। ক্ষেতে বীজ বোনা বিধায়ক কর্ম। মনে সদ্‌বিচারসমূহের পুনঃ পুনঃ চিন্তন করাকে অভ্যাস বলে। বৈরাগ্য বিধ্বংসী ক্রিয়া, অভ্যাস সৃজনী ক্রিয়া। বৈরাগ্য লাভের উপায়? আমরা বলি আম মিঠা। কিন্তু মধুরতা কি কেবল আমেই? কেবল আমেই নহে। আমাদের আত্মার মধুরতা আমরা বস্তুতে ঢালিয়া দিই তবে না তাহা মিঠা লাগে। অতএব ভিতরের মধুরতা চাখিতে শিখ। কেবল বাহ্য বস্তুতে মধুরতা নাই। বরং ঐ 'রসানাং রসতমঃ' মাধুর্যসাগর যে আত্মা তাহা আমাতে রহিয়াছে, আর তাই মিষ্টি জিনিষের মধুরতা পাওয়া গিয়াছে, এইরূপ মনে করিতে করিতে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। সীতা হনুমানকে মোতির মালা দিলেন। হনুমান মোতি চিবান, দেখেন আর ফেলিয়া দেন। রামকে তিনি উহাতে দেখিতে পাইলেন না। রাম ছিলেন তাঁহার হৃদয়ে। ঐ মোতি মূর্খেরা লাখো টাকায় কিনে।

এই ধ্যানযোগের বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবান প্রারম্ভেই অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলিয়াছেন। তাহা এই, "নিজেই নিজের উদ্ধার করতে হবে। আমি এগিয়ে যাব। আমি ঊর্ধ্বে বিচরণ করব। যেমন-তেমন ভাবে এ নরদেহে আমি পড়ে থাকব না। পরমেশ্বরের কাছে যাওয়ার সাহস ধরব ও প্রযত্ন করব"—এরূপ দৃঢ় সংকল্প করা চাই।

এসব শুনিয়া অর্জুনের মনে শঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, "ভগবান, বয়স হয়েছে। দু'দিন বাদে মরে যাব। এ সাধনা তবে কোন কাজে লাগবে?" ভগবান বলিলেন, "মৃত্যু মানে দীর্ঘ নিদ্রা।" দিনের কাজের পরে সাত-আট ঘণ্টা আমরা ঘুমাই। এ নিদ্রাকে কি আমরা ভয় করি? উল্টা, ঘুম না আসে ত আমরা ভাবনায় পড়ি। নিদ্রা যেমন দরকার, মৃত্যুও তেমন দরকার। ঘুম হইতে উঠিয়া আমরা আবার কাজ সুরু করি। তদ্রূপ মৃত্যুর পরে পূর্বেকার সব সাধনা আমাদের কাজে আসিবে। এই প্রসঙ্গে লিখিতে গিয়া জ্ঞানদেব জ্ঞানেশ্বরীতে ওবি ছন্দে যেন আত্মচরিত লিখিয়া ফেলিয়াছেন:

"শৈশবে সর্বজ্ঞতা। বরেছে তাকে।
সকল শাস্ত্র স্বয়ং। ফুটেছে মুখে।"

ইত্যাদি চরণে তাহা দেখা যায়। পূর্বজন্মের অভ্যাস তোমাকে টানিয়া লয়। কাহারও কাহারও চিত্ত বিষয়ের দিকে যায়ই না। মোহ যে কি তাহা তাহারা জানেই না। তার কারণ পূর্ব জন্মে সে সাধনা তাহারা করিয়া রাখিয়াছে।

"শুভকারী কোন জন
পায়নি কুগতি কখন।"

যে মানুষ কল্যাণ-মার্গ ধরিয়া চলে তার কিছুই বৃথা যায় না। অন্তে এরূপ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। অপূর্ণ অন্তে পূর্ণ হইবে। ভগবানের এই উপদেশের মর্ম উপলব্ধি করুন আর নিজ জীবন সার্থক করুন।

রবিবার, ২৭-৩-৩২

সপ্তম অধ্যায়

(৩২)

বন্ধুগণ,

অর্জুনের সামনে যখন স্বধর্ম পালনের প্রশ্ন উপস্থিত হয় তখন তাঁহার মনে স্বকীয় ও পরকীয় এই মোহ জন্মে আর তিনি স্বধর্মাচরণ হইতে বাঁচার পথ খুঁজিতে থাকেন। তাঁহার এই বৃথা মোহ প্রথম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। আর এই মোহ দূর করার জন্যই দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ। সেখানে তিন সিদ্ধান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে, (১) আত্মা অমর ও সর্বত্র বিদ্যমান, (২) দেহ নশ্বর আর (৩) স্বধর্ম কখনও ত্যাগ করিতে নাই। আর তৎসঙ্গে যাহা দ্বারা এইসব সিদ্ধান্ত কার্যে রূপ দেওয়া যায় সেই ফলত্যাগ উপায়ের কথাও বলা হইয়াছে। এই কর্মযোগের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম এই তিন বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে। কর্ম ও বিকর্মের সঙ্গমে উৎপন্ন অকর্মের দ্বিবিধ রূপ আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিয়াছি। ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিকর্মের রূপ বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। সাধনার পক্ষে আবশ্যক একাগ্রতার কথাও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে।

আজ সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনা। এ অধ্যায়ে বিকর্মের এক দিব্য ভবন খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সৃষ্টি দেবীর মন্দিরে, কোনও বিশাল বনে আমরা যেমন নানা মনোহর দৃশ্য দেখি, গীতা-গ্রন্থেও তদ্রূপ দেখিতে পাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ে একাগ্রতার ভবন দেখিয়াছি। এখন আর এক ভবনে আমরা একটু প্রবেশ করিতেছি।

এ ভবন উদ্ঘাটনের আগেই মোহ সৃষ্টিকারী এ জগৎ রচনার রহস্য ভগবান বুঝাইয়া দিয়াছেন। একই রকম কাগজে একই তুলিতে চিত্রকার নানা চিত্র আঁকে। সেতারী সাত সুর হইতে অনেক রাগ সৃষ্টি করে। বাহান্ন অক্ষরের সহায়তায় নানাবিধ বিচার ও ভাব আমরা প্রকাশ করি। এ সৃষ্টির ব্যাপারও তাহাই। সৃষ্টিতে অনন্ত বস্তু ও অনন্ত বৃত্তি রহিয়াছে। কিন্তু এই সারা অন্তর্বাহ্য সৃষ্টি একই অখন্ড আত্মা আর একই অষ্টধা প্রকৃতি—

এই দ্বিবিধ উপকরণে তৈরি। ক্রোধী মানুষের ক্রোধ, প্রেমী মানুষের প্রেম, দুঃখিতের ক্রন্দন, আনন্দিতের আনন্দ, অলসের নিদ্রা-প্রবণতা, উদ্যোগীর কর্ম-স্ফূর্তি, এসব একই চৈতন্যশক্তির খেলা। এই পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের মূলে একই চৈতন্য নিহিত রহিয়াছে। ভিতরের চৈতন্য একই। তদ্রূপ বাহ্য আবরণের স্বরূপও একই। চৈতন্যময় আত্মা ও জড় প্রকৃতি এই দ্বিবিধ উৎপাদন হইতে সারা সৃষ্টির জন্ম একথা প্রারম্ভেই ভগবান বলিয়া দিতেছেন।

আত্মা ও দেহ, পরা ও অপরা প্রকৃতি সর্বত্র একই। তবে মানুষ মোহে পড়ে কেন? ভেদ দেখে কেন? প্রিয় জনকে দেখিয়া মন খুশি হয়, আর অপর কাহাকেও দেখিয়া মন বিরূপ হয়। একের সহিত মিলনের ও অপরকে দূরে রাখার ইচ্ছা কেন হয়? একই পেন্সিল, একই কাগজ, একই চিত্রকার। কিন্তু বিভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত হয়। এখানেই চিত্রকারের কুশলতা। চিত্রকারের ও সেতারীর অঙ্গুলিতে এমনি নৈপুণ্য যে সে আপনাকে কাঁদায়, আপনাকে হাসায়। তার অঙ্গুলিতেই রহিয়াছে এই সব বিশেষতা।

এ কাছে থাক, সে দূরে যাক, এ আমার, সে অন্যের, মনে এই যে চিন্তা আসে আর তার ফলে কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হওয়ার যে প্রবৃত্তি জন্মে, সে সকলের মূলেই রহিয়াছে মোহ। এই মোহ হইতে বাঁচিতে হইলে সৃষ্টি-কর্তার অঙ্গুলির ঐ নৈপুণ্যের পরিচয় লইতে হইবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে নাকারার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। একই নাকারা হইতে নানা নাদ বাহির হয়। কোনটিতে আমি ভীত হই, কোনটিতে নাচি। এ সকল ভাব জয় করিতে হইলে ধরিতে হয় নাকারা-বাদককে। সে ধরা পড়িয়াছে কি সকল নাদ ধরা পড়িয়াছে। একটি বাক্যে ভগবান বলিতেছেন, "মায়া থেকে যে মুক্ত হতে চায় সে আমার শরণ নিক।"

এখানেই লীলা থেকে সে তরে, যে সর্বভাবে ভজে মোরে,
এখানেই শুকিয়ে যায় তার মায়াজল।

এই মায়া কি? মায়া মানে পরমেশ্বরের শক্তি, তাঁর কলা, তাঁর কুশলতা। আত্মা ও প্রকৃতি কিম্বা জৈন পরিভাষায় বলিলে জীব ও অজীব এই উপাদানে যিনি এই অনন্ত রঙবেরঙ সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন তাঁর শক্তি বা কলাই

মায়া। জেলে যেমন সেই গমেরই সেই রুটি আর সর্বরসী সেই একই ডাল, অখণ্ড আত্মাও তেমন একই, আর অষ্টধা প্রকৃতিও একই। ইহা হইতে ভগবান নানা জিনিষ বানাইতেছেন। এই সব জিনিষ দেখিয়া ভালমন্দ নানা বিরোধী ভাব আমরা অনুভব করি। ইহার পরে যাইয়া সত্যিকার শান্তি পাইতে হইলে এই সব বস্তুর স্রষ্টাকে ধরিতে হইবে। তাঁর সহিত পরিচয় করিতে হইবে। তাঁকে জানিলে বুঝিলে এই ভেদজনক, আসক্তিমূলক মোহ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

সেই পরমেশ্বরকে বুঝিবার এক মহান সাধন, এক মহান বিকর্ম নির্দেশ করার জন্য সপ্তম অধ্যায়ে গীতা ভক্তিরূপ সুন্দর ভবন খুলিয়া দিয়াছে। চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ-দান জপতপ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি বহু বিকর্মের কথা বলা হয়। এই সব সাধনকে আমি সোডা, সাবান, রিঠার সহিত তুলনা করিব। কিন্তু ভক্তি হইতেছে জল। সোডা, সাবান, রিঠা পরিষ্কার করে কিন্তু জল ছাড়া এ সকলের চলে না। জল বিনা উহারা কি কাজে আসিবে? কিন্তু সোডা, সাবান, রিঠা না হইলেও কেবল জলই পরিষ্কার করিতে পারে। জলের সহিত এদের সংযোগ হইলে 'অধিকস্য অধিকং ফলম' হইবে। তাহা যেন দুধে চিনি সংযোগ। যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান, তপ এসবে যদি হৃদয়ের পরশ না থাকে তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে কিরূপে? হৃদয়ের পরশ মানে ভক্তি।

ভক্তি ছাড়া কোন সাধনেরই চলে না। ভক্তি এক সার্বভৌম সাধন। সেবা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, শুশ্রূষায় পটু কোন লোক কোন রোগীর পরিচর্যার জন্য গেল। কিন্তু তাহার মনে যদি সেবাভাব না থাকে তবে ঠিক সেবা হইবে কিরূপে? গরু তাজা মোটা হইতে পারে। কিন্তু যদি গাড়ী টানার ইচ্ছা না থাকে তবে ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া যাইব। এমন কি গাড়ীটাকে গর্তেও ঠেলিয়া দিতে পারে। যে কার্যে হার্দিকতা নাই তাহা তুষ্টিকরও নয়, পুষ্টিকরও নয়।

(৩৩)

এই ভক্তি লাভ হইলে সেই মহান চিত্রকরের কলা আমরা দেখিতে পাইব। তাঁর হাতের সেই কলম দেখিতে পাইব। ঐ উৎসের সন্ধান যে পাইয়াছে, উহার অপূর্ব রস যে আস্বাদ করিয়াছে তার কাছে বাকী সব রস ফিকা ও

নীরস মনে হইবে। যে আসল কলা খাইয়াছে, কাঠের রঙ্গীন কলা সে হাতে লইবে, 'বেশ সুন্দর ত' একথাও বলিবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া দিবে। আসল কলার সোয়াদ সে পাইয়াছে। নকল কলা পাওয়ার আগ্রহ তার হইবে কেন? তদ্রূপ আসল ঝরনার মাধুর্য যে আস্বাদ করিয়াছে বাহিরের তুচ্ছ মনোহারী বস্তুর লোভে সে মজিবে কেন?

এক তত্ত্বজ্ঞানীকে কোন লোক বলিয়াছিল, "মহারাজ, চলুন, শহরে আজ দীপালীর মহা আয়োজন হয়েছে।" তত্ত্বজ্ঞানী বলিলেন, "দীপসজ্জা মানে কি? একটি বাতি, তারপর আর একটি, এইভাবে লাখ, দশ লাখ, কোটি, যত ইচ্ছে বাড়িয়ে যাও। এই ত দীপসজ্জা।" গণিতের ক্রম ১, ২, ৩ এই-ভাবে অনন্ত পর্যন্ত চলিয়াছে। সংখ্যার মধ্যে যে অন্তর রাখিতে হয় তাহা বুঝিলে সমস্ত সংখ্যা লেখা দরকার হয় না। তদ্রূপ তাহারা একটির পর আর একটি দীপ রাখিয়া দিয়াছে। তাহাতে এমন মশগুল হওয়ার কি আছে? কিন্তু এরূপ আনন্দে লোকের রুচি। সে লেবু আনিবে চিনি আনিবে। তাহা জলে মিশাইয়া খাইয়া বলিবে, "আঃ কী চমৎকার!" সোয়াদ লওয়া ছাড়া জিহ্বার আর কি কাজ! ইহাতে ইহা মিশাও, আর উহাতে উহা। এই-রূপ সাত-পাঁচ মিশ্রিত খাদ্যেই যত সুখ। ছোটবেলা একবার সিনেমা দেখিতে যাই। সঙ্গে শনের একটুকরা চট লইয়া গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য, ঘুম পাইলে তার উপর শুইব। পরদায় চোখ ঝলসান আগুন আমি দেখিতে লাগিলাম। দুই-চার মিনিট সেই অগ্নিচিত্র দেখার পরে চক্ষু ক্লান্ত হইয়া গেল। চটে শুইলাম আর বলিলাম, "শেষ হলে আমায় ডেকো।" রাত্রি-কালে বাহিরের খোলা হাওয়ায় আকাশের চন্দ্র-তারকা না দেখিয়া, শান্ত সৃষ্টির ঐ পবিত্র আনন্দ উপভোগ না করিয়া, ঐ বন্ধ থিয়েটারে আগুনের পুতুলের নাচ দেখিয়া লোকে হাতে তালি দেয়! তাহাতে যে কি আছে তাহা আমি ভাবিয়া পাইতাম না।

এরূপ নিরানন্দও মানুষ হয়? বেচারা ঐ নির্জীব পুতলা দেখিয়া কোন রকমে একটু আনন্দ পায়। জীবনে আনন্দ নাই তাই এরূপ কৃত্রিম আনন্দ খোঁজে। একবার আমাদের প্রতিবেশীর বাড়ীতে বাজনা বাজিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বাজনা কেন?" শুনিতে পাইলাম, "ছেলে

হয়েছে।” জগতে একমাত্র তোমারই কি ছেলে হইয়াছে যে ঢোল বাজাইয়া জগতকে বলিতেছ তোমার ছেলে হইয়াছে। ছেলে হইলে হৈচৈ পড়ে, লোকে নাচে, গান গায়। বস্তুত তাহা ছেলেমানুষি বটে। আনন্দের যেন দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। দুর্ভিক্ষের দিনে ভাত-কণা দেখিলে যেমন লোকে ঝাঁপাইয়া পড়ে, এও তেমনি। ছেলে হইয়াছে ত সার্কাস আসে সিনেমা আসে আর আনন্দের ভিখারীরা পিপীলিকার মত আসিয়া জড় হয়।

ইহা কি যথার্থ আনন্দ? গান কানে প্রবেশ করে আর উহার ঢেউ গিয়া লাগে মগজে। চোখে রূপ ঢোকে আর মগজে ধাক্কা দেয়। এই ধাক্কা হইতেই আনন্দের উৎপত্তি ও স্থিতি। তামাক গুঁড়া করিয়া কেহ নাকে ঠাসে; কেহ বা বিড়ি বানাইয়া মুখে টানে। ঐ নস্যের বা ধোঁয়ার ধাক্কা লাগিলে আনন্দের ভাণ্ডার যেন খুলিয়া যায়। বিড়ির টুকরা মিলিয়াছে ত আনন্দ ধরে না। টলস্টয় লিখিয়াছেন, “সিগারেটের নেশায় সে লোকও খুন করতে পারে। আশ্চর্য কিছু নেই।” উহা এক প্রকারের নেশাই।

এরূপ আনন্দে লোকে মত্ত হয় কেন? কারণ যথার্থ আনন্দের খোঁজ সে পায় না। ছায়ার পেছনে মানুষ পাগল। আজ সে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের আনন্দ উপভোগ করিতেছে। চক্ষু-ইন্দ্রিয় যদি না থাকিত তবে সে মনে করিত সংসারে চারিটি মাত্র আনন্দ। কাল যদি মঙ্গল গ্রহ হইতে ছয় ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট কোন জীব নামিয়া আসে ত পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী কাঁদিতে আরম্ভ করিবে আর বলিবে, “এর তুলনায় আমরা কত কাঙ্গাল।”

সৃষ্টির পূর্ণ অর্থ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচরে কি করিয়া আসিবে? বেচারা মানুষ এই পাঁচ বিষয়েও বাছ-বিচার করে আর তাহাতে ডুবিয়া থাকে। গাধার চিৎকার কানে আসে ত সে অশুভ মানে। ভাল, তোমাকে দেখিলে কি ঐ গাধার অশুভ হইবে না? উহা হইতে তোমার হানি ত নিশ্চয় হয়। ভাল, তোমা হইতে কাহারও কি কিছু হানি হয় না? তখন বরোদা কলেজে পড়িতাম। জন কয়েক ইউরোপীয় গায়ক আসিয়াছিল। সকলেই তাহারা ভাল গায়ক। তাহাদের দিক হইতে ত তাহারা নৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু আমার মনে হইতেছিল ওখান হইতে পালাইয়া বাঁচি। ঐরূপ গান শুনিতে কান অভ্যস্ত ছিল না। তাহাদের আনাড়ী আখ্যা

দিলাম। আমাদের গাইয়ে ওদেশে গেলে তাহারাও নিশ্চয় তাহাদের আনাড়ী বলিত। এরূপে, সঙ্গীতে একের আনন্দ হয় ত অপরের হয় না। তার মানে যথার্থ আনন্দ নয়, কৃত্রিম আনন্দ। যথার্থ আনন্দের দর্শন না হওয়া পর্যন্ত লোকে এই মিথ্যা, কৃত্রিম আনন্দে মজিয়া থাকে। আসল দুধ না খাওয়া পর্যন্ত, আটা-গোলা দুধই অশ্বত্থামা দুধ জ্ঞানে খাইত। তদ্রূপ যখন যথার্থ আনন্দের স্বরূপ বুঝিবেন, তাহা আস্বাদ করিবেন তখন অপর সব কিছু ফিকা লাগিবে।

এই আনন্দে পৌঁছিবার উৎকৃষ্ট পথ, ভক্তি। এই পথে চলিতে চলিতে ভগবানের কুশলতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই দিব্য কল্পনা আসিলে অপর সকল কল্পনা আপনা হইতেই লোপ পাইবে। তখন ক্ষুদ্র আকর্ষণ থাকিবে না। জগৎ-জোড়া এক আনন্দই চোখে পড়িবে। মিঠাইয়ের শত দোকান, কিন্তু মিঠাই সেই একই। যতদিন আসল বস্তু লাভ না হয় ততদিন পাখির মত এক ঠোক খায় এখানে এক ঠোক খায় সেখানে। ভোর-রাত্রে তুলসী রামায়ণ পড়িতেছিলাম। বাতির কাছে পোকার ভিড়। একটা টিক্‌টিকি আসিয়া হাজির। আমার রামায়ণে কি তার কাজ? পোকা দেখিয়া তার মহা আনন্দ। পোকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে এমন সময় হাত নাড়িলাম। টিক্‌টিকিটা ভাগিয়া গেল। কিন্তু পলকহীন দৃষ্টি তার পোকার উপর। মনে মনে বলিলাম, "খাচ্ছিস তুই এ পোকা? জল পড়ছে তোর জিব থেকে?" আমার জিবে জল আসিতেছে না। যে আনন্দ আমি লুটিতেছি হতভাগ্য টিক্‌টিকি তা বুঝিবে কিরূপে? রামায়ণের রস আস্বাদনের শক্তি তার ছিল না। আমাদের দশা ঐ টিক্‌টিকিরই মত। নানা রসে আমরা মত্ত। যথার্থ রস মিলে ত কি না মজা! যে সাধন দ্বারা সেই সত্যকার রস পাওয়া যাইতে পারে, চাখা যাইতে পারে, ভক্তিরূপ সেই সাধনের পথ ভগবান দেখাইতেছেন।

(৩৪)

তিন প্রকার ভক্তের কথা ভগবান বলিয়াছেন। (১) সকাম ভক্ত, (২) নিষ্কাম কিন্তু একাঙ্গী ভক্ত, (৩) জ্ঞানী অর্থাৎ পূর্ণ ভক্তির সাধক। নিষ্কাম কিন্তু একাঙ্গী ভক্তির সাধক আবার তিন প্রকারের ঃ (১) আর্ত

(২) জিজ্ঞাসু, (৩) অর্থার্থী। এ সব ভক্তি বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। সকাম ভক্ত মানে কি? মনে কিছু ইচ্ছা লইয়া পরমেশ্বরের কাছে যাইতে অভিলাষী। এ ভক্তি নিকৃষ্ট স্তরের একথা বলিয়া তার নিন্দা করিব না। মান-সম্মানের আশায় অনেকে সার্বজনীন কাজ করে। তাহাতে ক্ষতি কি? তাদের মান দিন। খুব সম্মান দিন। মান-সম্মান দিলে ক্ষতি কিছু হইবে না। এরূপ সম্মান মিলিতে থাকিলে এক সময়ে সার্বজনীন কার্যে সে স্থির হইয়া যাইবে। পরে সে কাজে সে আনন্দও পাইবে। সম্মান পাওয়া যাইবে এই যে ইচ্ছা, আসলে তার মানে কি? আমরা যে কাজ করিতেছি তাহা যে উত্তম ঐ সম্মান হইতে এই বিশ্বাস আমাদের দৃঢ় হয়—ইহাই মানে। যে সেবা করিতেছি তাহা ভাল কি মন্দ একথা নির্ণয় করার আভ্যন্তরীণ সাধন যার নাই, সে বাহ্য সাধনের আশ্রয় লয়। মা সন্তানের পিঠ চাপড়াইয়া বলে, 'সাবাস'। তাহার ফলে মায়ের কাজ করার উৎসাহ সন্তানের আরও বাড়ে। সকাম ভক্তির বেলায়ও এই কথা। সকাম ভক্ত সোজা পরমেশ্বরের কাছে যাইয়া বলিবে, 'দাও'। পরমেশ্বরের কাছে যাইয়া সব কিছু চাওয়া সামান্য কথা নয়। তাহা অসাধারণ কথা। জ্ঞানদেব নামদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তীর্থে যাবেন?" নামদেব বলিলেন, "কেন?" জ্ঞানদেব বলিলেন, "সাধু-সন্তের সমাগম হবে।" নামদেব বলিলেন, "থাম, ভগবানকে জিজ্ঞাসা করে আসি।" নামদেব দেবালয়ে গেলেন। ভগবানের সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁর চোখ হইতে ধারা বহিতে লাগিল। পরমেশ্বরের যুগল চরণের দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভগবান যাব কি?" পাশে জ্ঞানদেব ছিলেন। এই নামদেবকে কি পাগল বলিবেন? স্ত্রী ঘরে না থাকিলে কাঁদে এমন লোকের অভাব নাই। কিন্তু ভগবানের কাছে যে ভক্ত কাঁদে, হইলেনই বা তিনি সকাম ভক্ত, তবু তিনি অসাধারণ। যাহা চাওয়ার মত, অজ্ঞানতাবশত তাহা সে চায় না এই পর্যন্ত; কিন্তু তা বলিয়া তাহার সকাম ভক্তি ত্যাজ্য প্রমাণিত হয় না।

ভোরে উঠিয়া স্ত্রীলোকেরা নানা রকমের ব্রত করে, আরতি করে, তুলসী প্রদক্ষিণ করে। কেন করে? মৃত্যুর পরে ভগবানের কৃপা লাভ হইবে এই আশায়। সরল বিশ্বাস ইহাকে বলিতে পারেন। কিন্তু ইহার

জন্য তারা ব্রত করে উপোস করে। এরূপ ব্রতশীল পরিবারে মহাপুরুষের জন্ম হয়। তুলসীদাসের কুলে রামতীর্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামতীর্থ ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। কেহ বলিয়াছিল, "তুলসীদাসের কুলে জন্মেছ, সংস্কৃত জান না?" রামতীর্থের অন্তরে একথা বিঁধিল। কুল-স্মৃতির এমনই সামর্থ্য। এই প্রেরণা হেতু তিনি সংকৃতের প্রগাঢ় অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। স্ত্রীলোকদের এই ভক্তিভাবকে উপহাস করিও না। এরূপ কণা-কণা ভক্তি যেখানে সঞ্চিত হয় সেখানে তেজস্বী সম্পদের উৎপত্তি হয়। তাই ভগবান বলিতেছেন, "আমার ভক্ত যদি সকাম হয়, তবুও তার ভক্তি আমি দৃঢ় করব। তার মনে বিভ্রম আসতে দেব না। অকপট হৃদয়ে সে যদি আমার কাছে রোগ-মুক্তির প্রার্থনা করে তবে আরোগ্যের ভাবনা পুষ্ট করে তার রোগ দূর করে দেব। যে কারণেই সে আমার কাছে আসুক, তার পিঠে আমি হাত বুলাব, আদর করব।" ধ্রুবের কথা ধরুন। পিতার কোলে বসিতে পাইল না বলিয়া মা তাকে বলিলেন, "ঈশ্বরের কাছে চাও।" সে উপাসনা করিতে লাগিল। ভগবান তাকে অচল পদ দিলেন। মন নিষ্কাম না হইলেই বা কি? মানুষ কাহার কাছে যায়, আর কাহার কাছে চায়, গুরুত্ব সেখানে। সংসারের কাছে হাত না পাতিয়া ঈশ্বরের কাছে মিনতি করার যে বৃত্তি তাহার গুরুত্ব আছে।

নিমিত্ত যাহাই হোক, ভক্তিমন্দিরে যাও ত। প্রথমে যদি কামনা লইয়াও যাও, ত পরে নিষ্কাম হইয়া যাইবে। প্রদর্শনীর আয়োজন লোকে করে। পরিচালক ডাকিয়া বলে, "মহাশয়, আসুন। দেখুন খদ্দরের কেমন উন্নতি হচ্ছে। নমুনা দেখুন।" লোকে যায়, প্রভাবিত হয়। ভক্তির বেলায়ও তাহাই। ভক্তিমন্দিরে একবার প্রবেশ ত কর, তখন উহার সৌন্দর্য ও সামর্থ্য আপনা হইতেই বুঝা যাইবে। স্বর্গে যাইতে শেষ পর্যন্ত ধর্মরাজের সহিত কুকুরই ছিল। স্বর্গদ্বারে ধর্মরাজকে বলা হইল, "আপনি আসুন। কুকুরের প্রবেশ নিষেধ।" ধর্মরাজ বলিলেন, "আমার কুকুরের প্রবেশ মানা ত আমার প্রবেশও মানা।" অনন্যসেবাকারী, কুকুর হইলেও 'আমি-আমি' স্পর্ধাকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই কুকুর ভীম-অর্জুন হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইল। ভগবানবিমুখী বড় বড় লোক অপেক্ষা ভগবানমুখী কীটও মহৎ। মন্দিরে

কচ্ছপ ও নন্দীর মূর্তি থাকে। কিন্তু সকলে ঐ নন্দী-ষাঁড়কে নমস্কার করে। কারণ সে সাধারণ ষাঁড় নহে। সে ভগবানের সামনে থাকে। ষাঁড় বটে। কিন্তু সে যে ভগবানের ষাঁড় একথা আমাদের ভুল হয় না। বড় বড় বুদ্ধিমানদের অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠ। ভগবানের স্মরণকারী পাগল জীব বিশ্ববন্দ্য হইয়া থাকে।

রেলে যাইতেছিলাম। যমুনার পুলের উপর গাড়ী আসিয়াছে। পাশের একটি লোক পুলকিত হৃদয়ে যমুনায় একটি আধলা ফেলিল। কাছে এক সমালোচক ছিলেন। বলিলেন, "এমনি ত দেশ দরিদ্র। তাতে এরা এভাবে নিরর্থক পয়সা নিক্ষেপ করছে।" আমি বলিলাম, "লোকটির মনোভাব আপনি বুঝেন নাই। যে ভাব থেকে সে আধলা দু'টি ফেলেছে তার মূল্য দু'-চার পয়সার মত হবে কি হবে না? অন্য কোন সৎকার্যে এ পয়সা যদি দেওয়া হত ত এ দান আরও ভাল হত। সেকথা পরে। এ নদী কি? না, ঈশ্বরের করুণাধারা বহন করে আনছে। এ ভাবনা থেকে এ ভাবুক লোক এ ত্যাগ করেছে। এ ভাবনার কোন স্থান আপনাদের অর্থশাস্ত্রে আছে কি? দেশের একটি নদী দেখে তার অন্তঃকরণ দ্রব হয়েছে। এ ভাবনার আদর করেন কিনা তা দিয়ে না আপনার দেশপ্রেমের পরীক্ষা হবে। দেশপ্রেমের অর্থ কি? দেশের কোন মহান্ নদী দেখে সকল সম্পত্তি যদি তাতে বিসর্জন করার, তার চরণে সমর্পণ করার বাসনা জাগে ত সে কত বড় দেশপ্রেম! ঐ যে সব ধন-দৌলত, সবুজ-পান্ডুবর্ণ পাথর, ঐ যে কীটের বিষ্ঠায় সৃষ্ট মোতি, ঐ যে কয়লাতে সৃষ্ট হীরা—এ সকলের মূল্য কি? জলে ফেলে দেওয়ারই মত। পরমেশ্বরের চরণপ্রান্তে এ সকলের মূল্য ধূলারই সমান। আপনি বলবেন নদী আর পরমেশ্বরের চরণ এ দু'য়ের সম্বন্ধ কি? আপনার সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের কথা আছে কি কোথাও? নদী মানে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন। সূর্য গ্যাস-বাতির বৃহৎ সংস্করণ তাকে আবার নমস্কার কেন? নমস্কার কেবল আপনার রুটিকে। ভাল, ঐ রুটিতেই বা কি আছে? তাহা ত আসলে এক প্রকারের সাদা মাটিই বটে। তার জন্যেও আবার জিহ্বায় জল আসে? এত বড় সূর্য উঠেছে। এমন সুন্দর নদী বইচে—এতেও যদি পরমেশ্বরের উপলব্ধি না হয় ত হবে

কিসে?" ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বড় দুঃখে বলিয়াছেন, "আগে যখন ইন্দ্রধনু দেখতাম আনন্দে নেচে উঠতাম। হৃদয় দোল খেত। ভাল, আজ কেন নেচে ওঠে না? আগেকার জীবন-মাধুরী খুইয়ে আমি কি পাথর হয়ে গেছি?"

সারাংশ, সকাম ভক্তির কিম্বা অজ্ঞানী মানুষের ভাবনারও খুব মহত্ব আছে। পরিণামে তাহা হইতে মহান সামর্থ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জীব সে যে কেহ হোক আর যেমনই হোক, পরমেশ্বরের দরবারে একবার আসিয়া গেলে তাঁর অনুগ্রহ সে লাভ করিবে। আগুনে যে কোন কাঠ ফেলুন উহা জ্বলিয়া উঠিবে। পরমেশ্বরে ভক্তিই অপূর্ব সাধনা। পরমেশ্বর সকাম ভক্তিরও আদর করিবেন। পরে সে ভক্তি নিষ্কাম হইয়া পূর্ণতা লাভ করিবে।

(৩৫)

এক প্রকার সকাম ভক্তের কথা বলা গেল। একা নিষ্কাম ভক্তের কথা ধরা যাক। একাঙ্গী ও পূর্ণ এই দুই ভাগে তাহারা বিভক্ত। একাঙ্গী আবার তিন প্রকারের। এক—আর্ত ভক্ত। আর্ত মানে সহানুভূতিপ্রার্থী, ভগবানের জন্য সে কাঁদে, ছটফট করে যথা নামদেব। ভগবানের প্রেম কবে লাভ করিব, কবে তাঁকে গলায় জড়াইয়া ধরিয়া জীবন সার্থক করিব, কবে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইব—ইহার জন্য সে উৎসুক, ব্যাকুল, অধীর, আতুর। আন্তরিকতা আছে কিনা, প্রেম আছে কিনা, এই দৃষ্টি হইতে প্রত্যেকটি কার্য এই ভক্ত নিরীক্ষণ করে। দুই—জিজ্ঞাসু। বর্তমানে এ শ্রেণীর ভক্ত এদেশে বড় নাই। এরূপ ভক্তের কেহ বার বার গৌরীশঙ্কর আরোহণ করিবে আর মরিবে। কেহ বা উত্তর মেরুর সন্ধানে বাহির হইবে আর অনুসন্ধানের ফল কাগজে লিখিয়া, বোতলে বন্ধ করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া মরিয়া যাইবে। অপর কেহ বা জ্বালামুখীর ভিতরে চলিয়া যাইবে। ভারতবাসীর কাছে মৃত্যু মহা ভয়ের ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের অতিরিক্ত পুরুষার্থ তাহার নাই। জিজ্ঞাসু ভক্তের উৎসাহ অদম্য। সে বস্তুমাত্রের গুণধর্মের খোঁজ করে। নদীর গতি অনুসরণ করিয়া মানুষ যেমন অবশেষে সমুদ্রে পৌঁছিয়া যায়, এই জিজ্ঞাসু তদ্রূপ

অন্তে ভগবানের কাছে পৌঁছিয়া যায়। তিন—অর্থার্থী। অর্থার্থী মানে প্রত্যেকটি কার্যের অর্থ যে অনুসন্ধান করে। অর্থ মানে পয়সা নয়। অর্থ মানে হিত, কল্যাণ। 'ইহা দ্বারা সমাজের কি কল্যাণ হবে'—প্রতিটি বিষয় তিনি এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া থাকেন। আমি যাহা লিখি, যাহা বলি, যেসব কর্ম করি তাহাতে সংসারের মঙ্গল হইবে কিনা ইহাই তাঁহার দৃষ্টি। নিরর্থক, অহিতকর কার্য তাঁহার কাছে ত্যাজ্য। জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী কত বড় সে মহাত্মা! জগতের কল্যাণেই তাঁহার আনন্দ। প্রেমের দৃষ্টিতে সমগ্র ক্রিয়া যে দেখে সে আর্ত। জ্ঞানের দৃষ্টিতে যে দেখে সে জিজ্ঞাসু। আর সকলের কল্যাণ-দৃষ্টিতে যে দেখে সে অর্থার্থী।

এই তিন ভক্ত নিষ্কাম ত বটেই, কিন্তু একাঙ্গী। একে ঈশ্বর লাভ করে কর্মের দ্বারা, আর একে করে হৃদয়ের দ্বারা, আর তৃতীয় আর এক করে বুদ্ধিদ্বারা। বাকী থাকিতেছে পূর্ণ ভক্তের কথা। তাহাকে জ্ঞানী ভক্তও বলা যাইতে পারে। এই ভক্ত সব কিছুতেই ভগবানের রূপ দেখে। সুরূপ-কুরূপ, রাজা-রঙ্ক, স্ত্রীপুরুষ, পশুপক্ষী সর্বত্রই সেই পরমাত্মার পবিত্র দর্শন।

নর-নারী শিশু সবে দেখি নারায়ণ।
এমনি প্রভু করে দাও মোর মন॥

এই হইতেছে তুকারাম মহারাজের প্রার্থনা। নাগ পূজা, হাতির শুঁড়ধারী দেবতার পূজা, গাছের পূজা ইত্যাদি পাগলামির নিদর্শন হিন্দু ধর্মে আছে। কিন্তু জ্ঞানী ভক্তের ব্যাপারে এই পাগলামি চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে। যাহাকে সে দেখে, পিঁপড়ে হইতে চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত, সর্বত্রই সে একই পরমাত্মা দেখে। হৃদয় তাহার আনন্দে নাচিতে থাকে।

অনন্ত সে সুখ, নাহি পারাপার।
আনন্দসাগর লহরে উত্তাল॥

এই রূপ যে দিব্য সুন্দর দর্শন তাহাকে ভ্রম বলিতে হয় বলুন। কিন্তু এই ভ্রম শান্তির পুঞ্জ, আনন্দের খনি। গাম্ভীর্যময় সাগরে সে দেখে প্রভুর বিলাস। গরুতে দেখে ভগবানের বাৎসল্য, পৃথিবীতে দেখে তাঁর সামর্থ্য। নিরভ্র আকাশে দেখে তাঁর নির্মলতা। রবি-চন্দ্র-তারায় দেখে তাঁর সৌন্দর্য,

ফলে তাঁর কোমলতা, দুর্জনে দেখে নিজ পরীক্ষকরূপে দণ্ডায়মান পরমেশ্বর। এইভাবে, জ্ঞানী ভক্ত, একই পরমাত্মার খেলা সর্বত্র চলিতেছে, এরূপ দেখার প্রযত্ন করিয়া থাকে। এরূপ করিতে করিতে একদিন ঐ জ্ঞানী ঈশ্বরে মিলিয়া যায়।

রবিবার, ৩-৪-৩২।

অষ্টম অধ্যায়

(৩৬)

বন্ধুগণ,

মানুষের জীবন বহু সংস্কারে ভরা। আমাদের দ্বারা অসংখ্য ক্রিয়া হয়। সে সকলের হিসাব করিতে গেলে অন্ত পাওয়া যাইবে না। চব্বিশ ঘণ্টার ক্রিয়ার হিসাব কষিতে গেলেও দেখা যাইবে যে সে সংখ্যা মস্ত বড় হইয়া গিয়াছে। পানাহার, শোয়াবসা, চলাফেরা, কাজ করা, লেখাপড়া, বলা এ সকল বাদে নানাবিধ স্বপ্ন, রাগ-দ্বেষ, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অনন্ত রকমের ক্রিয়া দেখা যাইবে। এ সকলের সংস্কার মনে অংকিত হইতে থাকে। অতএব কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে জীবন কাহাকে বলে ত বলিব, জীবন মানে সংস্কার-সঞ্চয়। ইহাই জীবনের সংজ্ঞা।

সংস্কার দুই রকমের—ভাল ও মন্দ। মানুষের জীবনে উভয়েরই প্রভাব পড়িতে থাকে। বাল্যকালের ক্রিয়াসমূহের কথা ত মনেই থাকে না। গোটা বাল্যকালটা যেন স্লেট্ হইতে পুঁছিয়া-ফেলা লেখার মত। পূর্ব-জন্মের সংস্কার ত একদম সাফ্ পুঁছে-যাওয়ার মত ব্যাপার—এতদূর পর্যন্ত যে পূর্বজন্ম বলিয়া কিছু আছে কিনা এ বিষয়েই সন্দেহ জন্মে। পূর্ব-জন্মের কথা থাক। এ জন্মের কথাই ধরা যাক। যত ক্রিয়ার কথা মনে থাকে কেবল তাহাই ঘটিয়াছে তা নয়। ক্রিয়া অনেক, আর জ্ঞানও অনেক। কিন্তু এসব ক্রিয়া ও এসব জ্ঞান মিটিয়া গিয়া অন্তে অবশিষ্ট থাকে কিছু সংস্কার মাত্র। রাত্রে শোয়ার সময়ে দিনের সব ক্রিয়ার কথা মনে করিতে যাই ত মনে হয় না। কোনগুলি হয়? যাহা অতিশয় সুস্পষ্ট তাহাই কেবল মনে পড়ে। খুব ঝগড়া করিয়া থাকি ত তাহা মনে পড়ে। কারণ তাহাই সে দিনকার মুখ্য কামাই। বিশেষ ঘটনার সংস্কার মনে গভীর দাগ কাটে। মুখ্য ক্রিয়া মনে থাকে, বাকী সব ম্লান হইয়া যায়। দিনলিপি লিখিতে বসি ত বিশেষ বিশেষ দুইচারিটি কথা লিখি। প্রতিদিনের এরূপ সংস্কার লইয়া যদি এক সপ্তাহের হিসাব কষিতে যাই ত আরও কতকগুলি কথা বাদ

পড়িবে এবং সপ্তাহের মুখ্য মুখ্য ঘটনা মাত্র হিসাবে ঠাঁই পাইবে। আর পুরা এক মাসের কর্মের হিসাব করিতে বসি ত সে মাসের বিশেষ বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ কথাগুলিই মাত্র মনে আসিবে। তদ্রূপ ছয় মাসের, এক বছরের, পাঁচ বছরের হিসাব ধরিতে যাই ত দেখা যাইবে যে সামান্য গুটি কয়েক বিশেষ কথাই মাত্র মনে আছে। আর তাহাই সংস্কারে পরিণত হয়। অসংখ্য ক্রিয়া ও অনন্ত জ্ঞান হইলেও অন্তে মনে খুবই কম অঙ্কিত থাকে। সেই সব কর্ম, সেই সব জ্ঞান আসিল আর নিজ নিজ কার্য করিয়া শেষ হইয়া গেল। সেই সব কর্মের গুটিকয়েকমাত্র সংস্কার দৃঢ় থাকিয়া যায়। এসব সংস্কারই আমাদের পুঁজি। জীবন-ব্যাপার করিয়া আমরা কেবল সংস্কার-সম্পত্তি অর্জন করি। ব্যাপারী প্রতিদিনের, মাসের ও বছরের জমা-খরচ করিয়া অন্তে লাভ বা লোকসানের অঙ্ক বাহির করে। জীবনব্যাপারেও ঠিক তাহাই। অনেক সংস্কারের জমা-খরচ হইতে শেষটায় অবশিষ্ট থাকে অতি সুন্দর নির্যাসের মত কিছু বস্তু। জীবনের অন্তিম ঘড়ি সখন ঘনাইয়া আসে আত্মা তখন সর্বশেষ রোকড়বাকীর দিকে তাকায়। জন্মভর কি করিয়াছি একথা যখন মনে করে তখন সারাজীবনের কামাই গিয়া ঠেকে দুই-চারিটি কথায়। তার অর্থ এ নয় ঐ সকল কর্ম ও জ্ঞান বৃথা গিয়াছে। তাদের কার্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাজারো দৌড়-ঝাঁপের পরে শেষটায় ব্যাপারীর হাতে ঠেকে পাঁচ হাজারের লোকসান নয় ত দশ হাজারের লাভ। লোকসান হইলে হৃদয় দমিয়া যায়, লাভ হইলে নাচে।

আমাদেরও তদ্রূপ। মৃত্যুকালে যদি খাওয়ার বাসনা হয় তবে বুঝিতে হইবে সারাজীবন খাওয়ার তালে কাটিয়াছে। খাওয়ার বাসনাই এ স্থলে সারাজীবনের উপার্জন। মরণের সময়ে মায়ের যদি পুত্রের কথা মনে হয় তবে পুত্র-বিষয়ক সংস্কার তার বলবান, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তার অন্য সব অসংখ্য কর্ম ছিল গৌণ। অঙ্কগণিতে অপূর্ণাঙ্কের উদাহরণ আছে। কত মস্ত মস্ত অঙ্ক! কিন্তু সংক্ষেপ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত উত্তর হয় এক বা শূন্য। তদ্রূপ জীবনেও সংস্কার অনেক সংখ্যা পর্যন্ত চলে কিন্তু অন্তে সাররূপে কোন এক বলবান সংস্কার থাকিয়া যায়। জীবনরূপ প্রশ্নের তাহা উত্তর। অন্তকালের স্মরণই সারাজীবনের ফলিত।

জীবনের এই অন্তিম সার মধুর হয়, এই অন্তিম কাল সুমধুর হয়, সে দিকে জীবনের প্রযত্ন হওয়া চাই। শেষ মধুর ত সব মধুর। ঐ অন্তিম উত্তরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের অংক কষিতে হইবে। এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া জীবন রচনা কর। কোন প্রশ্নের মীমাংসা কালে সেই প্রশ্ন ধরিয়াই উত্তর দিতে হয়। জীবন ক্ষেত্রেও সেই রীতি অবলম্বনীয়। মৃত্যু-কালে যে সংস্কারের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আমরা চাই, জীবন-প্রবাহ তদভিমুখী করা চাই। সদা সেদিকে মতি থাকা চাই।

(৩৭)

মৃত্যুকালে যে ভাব প্রবল থাকে পরের জন্মে তাহা বলবত্তর হয়, অষ্টম অধ্যায়ে এ তত্ত্ব উপস্থিত করা হইয়াছে। এই পাথেয় লইয়া জীব পরবর্তী যাত্রা-পথে রওনা হয়। আজিকার কামাই লইয়া নিদ্রার পরে আমরা আগামী কাল সুরু করি। তদ্রূপ এ জন্মের পুঁজি লইয়া মৃত্যুরূপী নিদ্রার পরে আমাদের যাত্রা পুনরায় সুরু হয়। এ জন্মের যাহা অন্ত আগামী জন্মের তাহাই আরম্ভ। অতএব মরণ অনুক্ষণ স্মরণ রাখিয়া চল।

নির্ভীকভাবে মৃত্যু-বিভীষিকার সম্মুখীন হইতে পারি, তার পথ বাহির করিতে পারি তজ্জন্যও মরণ স্মরণ রাখা দরকার। একনাথের এক গল্প আছে। কোন লোক নাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার জীবন কেমন সাদা, কিরূপ নিষ্পাপ। আমাদের তেমন নয় কেন? আপনি কখনও চটেন না। কারো সহিত ঝগড়া করেন না, কোন ঝামেলায় যান না। কতই না আপনি শান্ত, পবিত্র, প্রেমময়।" নাথ বলিলেন, "আমার কথা এখন রাখ। তোমার বিষয়ে একটা কথা আমি জেনেছি। আজ থেকে সাত দিন মধ্যে তোমার মৃত্যু হবে।" একনাথের কথা মিথ্যা একথা কে বলিবে? সাত দিনে মৃত্যু! মাত্র ১৬৮ ঘণ্টা বাকী। আঃ এ কি কথা! লোকটি তাড়া-তাড়ি বাড়ী ফিরিয়া গেল। কি করিবে ঠিক পাইতেছিল না। শেষের দিনের সকল কথা সকল কাজ গুছাইতে ছিল। অসুখ হইল। বিছানা লইল। ছয় দিন চলিয়া গেল। সাত দিনের দিন একনাথ তাহার কাছে গেলেন। লোকটি নমস্কার করিল। নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?"

সে বলিল, "চলেছি।" নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছ'দিনে কত পাপ করলে? কত পাপ ভাবনা মনে এসেছে?" আসন্নমরণ লোকটি বলিল, "নাথ, পাপের কথা ভাবার জো ছিল কি? চক্ষুর সামনে মরণ খাড়া ছিল।" নাথ বলিল, "আমাদের জীবন নিষ্পাপ কেন, এ প্রশ্নের উত্তর এবার পেলে?" মৃত্যুরূপ বাঘ মহাশয় সদৈব সামনে খাড়া একথা মনে করিলে পাপ করার চিন্তা আসিতে পারে কি? পাপ করার জন্যও নিশ্চিন্ততা চাই। মরণ সদৈব স্মরণ রাখা পাপ হইতে মুক্ত থাকার উপায়। মরণ সামনে দেখিলে কোন সাহসে লোক পাপ করিবে?

কিন্তু মানুষ মরার কথা দূরে রাখে। পাস্কেল নামে এক ফরাসী দার্শনিক ছিলেন। 'পাঁসে' নামক তাঁহার একখানি বহি আছে। 'পাঁসে'র অর্থ বিচার। ইহাতে বিভিন্ন চিন্তা তিনি সংক্ষেপে উপস্থিত করিয়াছেন। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, "মরণ সদা পিছনে খাড়া। কিন্তু মৃত্যু ভোলা যায় কি করে ইহাই মানুষের সতত চেষ্টা। মৃত্যু স্মরণ করে কিভাবে চলবে একথা সে সামনে রাখে না।" মরণ শব্দটাই মানুষের ভাল লাগে না। খাওয়ার সময় মৃত্যুর কথা বলিলে সে বলিবে, "আঃ, অশুভ কথা বল কেন।" তাহা হইলেও এক পা এক পা করিয়া আমরা সেই মৃত্যুর দিকেই ত চলিয়াছি। বোম্বাইর টিকেট কাটিয়া একবার গাড়ীতে বসিয়াছেন ত বসিয়া থাকিলেও গাড়ী আপনাকে বোম্বাই পোঁছিয়া দিবে। জন্ম যখন হইয়াছে মৃত্যুর টিকেট তখনই আমাদের কাটা হইয়া গিয়াছে. আপনি বসিয়াই থাকুন বা দৌড়ান। বসিয়া থাকিলেও মৃত্যু আসিবে, দৌড়াইলেও আসিবে। মরণের কথা ভাবুন বা দূরেই ঠেলুন তার আসা বন্ধ হইবে না। মরণ নিশ্চিত। অপর সব অনিশ্চিত। সূর্য অস্তাচলে গেলেন ত আমাদের জীবনের এক টুকরা গ্রাস করিয়া লইলেন। জীবনের টুকরা অতীতে মিলিতেছে; আয়ু কমিতেছে, পল পল করিয়া কমিতেছে। তবু মানুষের সে চিন্তা নাই। জ্ঞানেশ্বর বলেন, "তাজ্জব বটে!" এমন নিশ্চিন্ত মানুষ কী করিয়া অনুভব করে ইহাই জ্ঞানেশ্বরের কাছে আশ্চর্য ঠেকে। মরণের ভয় এত বেশী যে মরণের চিন্তাও মানুষের কাছে অসহ্য। এ চিন্তা সে দূরে রাখিতে চায়। চোখে সে পর্দা টানিয়া বসে। যুদ্ধ-যাত্রী

সৈনিক খেলে, নাচে, গায় ও সিগারেট ফুকে। পাস্কেল লিখিয়াছেন, "সাক্ষাৎ মরণ সর্বত্র দেখিলেও এ টমি, এ সিপাহী উহা ভুলিয়া যাওয়ার জন্য আহার-পানে, গানে-তানে মত্ত হইয়া থাকে।"

আমরা সকলে এই টমিরই মত। মুখ গোলগাল দেখায়, হাসি হাসি দেখায় সদা সে চেষ্টা। রুক্ষ দেখাইলে তেল মাখা, পাউডার লাগান, চুল পাকিলে কলপ লাগান ইত্যাদি কত প্রযত্নই না মানুষে করে। বুকের উপর মৃত্যু নাচিতেছে তবু তাহা ভুলিয়া যাওয়ার জন্য ঐ টমিরই মত অনন্ত চেষ্টা করি। লোকে বলিবে, "আর যা বলতে হয় বল। মরণের কথা কখনও মুখে এনো না।" ম্যাট্রিক পাস ছেলেকে জিজ্ঞাসা করুন, "এখন কি করবে?" ত বলিবে, "এই ত ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি। এখন ওকথা রাখ।" পরের বছর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ত বলিবে, "ইণ্টার ত পাস করতে দাও, পরে দেখা যাবে।" এই ভাবই চলিতে থাকে। পরে যাহা হইবে সেকথা আগেই চিন্তা করা হইবে না কেন? পরবর্তী পদক্ষেপের কথা আগেই ভাবিয়া দেখা দরকার, নইলে গর্তে পড়ার ভয় আছে। কিন্তু ছাত্রেরা তাহা দূরে ঠেলিয়া রাখে। বেচারাদের শিক্ষা এমনই অন্ধকারময় যে তাহা হইতে ও-পারের ভবিষ্যৎ দেখাই যায় না। অতএব পরে কি করা হইবে এ প্রশ্নই সে সামনে আসিতে দেয় না। তার কারণ সে চারিদিকে কেবল অন্ধকারই দেখে। কিন্তু ভবিষ্যৎ এড়ান যায় না। তা ঘাড়ে আসিয়া বসেই।

তর্ক-শাস্ত্র পড়াইতে কলেজের অধ্যাপক বলেন, "মানুষ মর্ত। সক্রেটিস মানুষ। অতএব সক্রেটিস মরিবে।" প্রোফেসর এই অনুমান শিখান। তিনি সক্রেটিসের উদাহরণ দেন। নিজের দেন না কেন? প্রোফেসরও মর্ত। সকল মানুষ মর্ত। তাই আমি প্রোফেসরও মর্ত। আর ছাত্র তোমরাও মর্ত। এর শিক্ষা প্রোফেসর দেন না। মৃত্যু তিনি সক্রেটিসের উপর চাপাইয়া দেন। কারণ সক্রেটিস কবেই মরিয়া গিয়াছে, নালিশ করিতে তিনি আসিবেন না। শিষ্য-গুরু উভয়েই সক্রেটিসের উপর মরণ সঁপিয়া নিজেদের বেলায় "তোমারও মৌন, আমারও মৌন" এ ভাব অবলম্বন করেন। তাহারা খুব সুরক্ষিত একথাই যেন তাহারা ধরিয়া লইয়াছে।

জানিয়া বুঝিয়া এভাবে মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকার চেষ্টা সর্বত্র চলিতেছে। কিন্তু মৃত্যু কি এড়ান যায়? মা কাল মরিয়া গেলেন ত মরণ সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। নির্ভীকভাবে মৃত্যুর চিন্তা করিয়া উহা হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় বাহির করার কথা সাহসভরে লোকে করে না। হরিণের পেছনে বাঘ ছুটিতেছে। গতি দ্রুত বলিয়া লম্বা-লম্বা লাফ মারিয়া হরিণ দৌড়াইতে থাকে। কিন্তু শক্তি তার হ্রাস হইতে থাকে। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পেছনে বাঘ মহাশয়, সেই মরণ আসিতেছেই। সে মুহূর্তে ঐ হরিণের অবস্থা কি হয়? বাঘের দিকে সে চাহিতেও পারে না। মাটিতে মুখ-শিং লুকাইয়া দাঁড়াইয়া যায়। সহায়হীনভাবে সে যেন বলে, "বাবা এসো, ঝাঁপিয়ে পড়, ঘাড় মটকাও।" মৃত্যু সামনে দেখিতে আমরা চাই না। উহা হইতে বাঁচার যত চেষ্টাই করি না কেন তবুও মৃত্যু এত প্রবল যে অন্ততক সে আমাদের ঘাড় না মটকাইয়া ছাড়ে না।

মৃত্যু যখন আসে মানুষ জীবনের রোকড়বাকীর দিকে তখন তাকায়। কুড়ে ছাত্র পরীক্ষা দিতে বসিয়া দোয়াতে কলম ডুবায় উঠায় কিন্তু সাদার উপর কাল অক্ষর লেখার সাহস হয় না। ভাই, কিছু লিখিবে না বসিয়াই থাকিবে? সরস্বতী আসিয়া উত্তর লিখিতে বসিবেন কি? তিন ঘণ্টা সমাপ্ত। সাদা কাগজ দেয়। অথবা শেষ মুহূর্তে যেমন-তেমন খস্‌খস্‌ করিয়া কিছু লিখিয়া দেয়। প্রশ্নের সমাধান করা, উত্তর দেওয়া ইহা বোঝে না। এদিকে চায়, ওদিকে দেখে। আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। অতএব আরম্ভেই জীবন মৃত্যুর দিকে ধাবমান হইয়াছে, একথা স্মরণ রাখিয়া অন্তিম মুহূর্তকে পুণ্যময়, অতীব পবিত্র ও মাধুর্যময় করার চেষ্টা প্রথম হইতেই আমাদের করা কর্তব্য। উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট সংস্কার কি করিলে জন্মে সেদিকে দৃষ্টি আজ হইতেই রাখা চাই। কিন্তু উত্তম সংস্কারের অভ্যাস কে করে? মন্দ কথারই অভ্যাস পদে পদে হইতেছে। জিব, চোখ, কান এদের হ্যাংলাপনা শিখাইতেছি। ইহা হইতে ভিন্ন অভ্যাসে চিত্তকে অভ্যস্ত করিতে হইবে। ভালর দিকে চিত্তকে লইয়া যাইতে হইবে। তাহাতে রঙ্গিন করিয়া লইতে হইবে। নিজ ত্রুটি যে মুহূর্তে দেখিতে পাইবেন সে মুহূর্তে তাহা সংশোধন করার জন্য ব্যস্ত হওয়া চাই। ভুল বুঝার

পরেও কি তাহা তেমনই করিতে থাকিবেন? যে মুহূর্তে নিজ ভুল আমাদের কাছে ধরা পড়ে সে মুহূর্তে আমাদের পুনর্জন্ম হয়। তাহা তোমার নূতন বাল্যাবস্থা। মনে করিবে তাহা তোমার জীবনের নবীন প্রভাত। সত্যসত্যই এখন তুমি জাগ্রত হইয়াছ। এখন দিন-রাত জীবন পরীক্ষা কর, সাবধানে থাক। তাহা না করিলে আবার পা ফস্‌কাইবে, আবার মন্দ অভ্যাস হইবে।

অনেক বছর পরে ঠাকুরমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। খুব বুড়া হইয়াছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিন্যা, কিছুই এখন মনে থাকে না। ঘির ঘট আনতে যাই ত খালি হাতে ফিরে আসি।" কিন্তু পঞ্চাশ বছরের একখানি গহনার কথা তিনি আমায় বলিলেন। পাঁচ মিনিট পূর্বের কথা ভুল হইয়া যাইত। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পূর্বেকার বলবান সংস্কার শেষতক সতেজ ছিল। ইহার কারণ কি? ঐ গহনার কথা অন্যকে তিনি বরাবর বলিতেন। সতত ঐ কথা বলিয়া আসিয়াছেন। জীবনের তাহা অঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। একরূপ হইয়া গিয়াছিল। মনে মনে আমি বলিয়াছিলাম, "ভগবান, তোমার কাছে প্রার্থনা, মরণের সময় গহনার কথা যেন ঠাকুরমার মনে না থাকে।"

(৩৮)

রাতদিন যেকথা আমরা ভাবি তাহা আমাদের পাইয়া বসিবে না কেন? অজামিলের কথা পড়িয়া আমরা যেন ভুল না করি। বাহিরে তিনি পাপী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের ভিতর হইতে পুণ্যের প্রবাহ বহিতেছিল। অন্তিম মুহূর্তে সেই পুণ্য জাগ্রত হইয়াছিল। অনুক্ষণ পাপ করিলেও অন্তিম সময়ে রামনাম নিশ্চয় মুখে আসিবে এ আত্মপ্রতারণা যেন না করি। ছেলেবেলা হইতেই যত্নপূর্বক অভ্যাস কর। ভাল সংস্কার মাত্রই ফুটিয়া উঠুক সতত এই আগ্রহ রাখ। ইহাতে কি হইবে? উহাতে কি হইবে? এরূপ বলিও না। চারটার সময়ে কেন উঠিব? সাতটায় উঠিলে ক্ষতি কি? এরূপ বলিলে চলিবে না। মনকে যদি বরাবর এরূপ স্বাধীনতা দিতে থাক তবে শেষটায় বিপন্ন হইবে। পরে উত্তম সংস্কারের ছাপ আর পড়িবে না। এক এক কণা করিয়া ধন সংগ্রহ করিতে হয়। একটি

মুহূর্ত ব্যর্থ যাইতে না দিয়া বিদ্যার্জনে লাগাইতে হয়। প্রতি মুহূর্তে যে সংস্কার জন্মিতেছে তাহা ভাল হইতেছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। মন্দ কথা বলিলাম ত সঙ্গে সঙ্গে মন্দ সংস্কার জন্মিল। প্রতিটি কর্ম ছেনি হইয়া জীবন-পাথরকে রূপ দেয়। দিন ভাল গেলেও রাত্রে মন্দ ভাব স্বপ্নে আসে। আট-দশ দিনের চিন্তা স্বপ্নে দেখা দেয় তাহা নয়। অনবধানতার কারণে কত মন্দ সংস্কারই না জন্মিয়া থাকে। কখন তাহা জাগ্রত হইবে তাহা বলা যায় না। তাই ছোট ছোট ব্যাপারেও সজাগ থাকা চাই। যে জলে ডুবিতেছে তৃণও তার কাছে অবলম্বন। সংসার সাগরে আমরা ডুবিতেছি। ভাল একটু বলিলেও তাহা আমাদের অবলম্বন হয়। ভাল করিলে তাহা ব্যর্থ যায় না। তাহা তোমায় উদ্ধার করিবে। লেশমাত্রও যেন মন্দ সংস্কার না হয়। চোখ পবিত্র থাকে, কান নিন্দা না শোনে, মুখ ভাল কথা বলে, সর্বদা এরূপ কাজ কর। এরূপ সাবধানে যদি চল ত অন্তিম মুহূর্তে পাশার যে দান ডাকিবে তাহাই পড়িবে। আমরা জীবন ও মরণের স্বামী হইব।

পবিত্র সংস্কারের ছাপ অঙ্কিত করার জন্য মনে উদাত্ত ভাবের প্রবাহ বহাইতে হইবে। হাত পবিত্র কর্মে রত থাকিবে। অন্তরে ঈশ্বরের স্মরণ, বাহিরে স্বধর্মাচরণ। হাতে সেবা-কর্ম আর মনে বিকর্ম। নিত্য তাহা করা চাই। গান্ধীজীর দিকে তাকাও। রোজ সুতা কাটিতেন। প্রতিদিন সুতাকাটায় তিনি জোর দিতেন। প্রতিদিন কেন কাটিব? কাপড়ের জন্য সময় সময় কাটিলে কি চলে না? কিন্তু এ ত হইল ব্যবহারিক দৃষ্টি। নিত্য কাটাতে আধ্যাত্মিকতা রহিয়াছে। দেশের জন্য আমার কিছু করিতে হইবে এই চিন্তা রহিয়াছে। ঐ সুতা প্রতিদিন আমাদিগকে দরিদ্রনারায়ণের সহিত যুক্ত করিতেছে। সংস্কার তাহাতে দৃঢ় হয়।

ডাক্তার ঔষধ দৈনিক খাইতে বলিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি তাহা একবারেই খাই ত? তাহা হইবে অদ্ভুত। ঔষধের উদ্দেশ্য তাহাতে সফল হইবে না। ঔষধের সংস্কার দিন দিন বলবান হইয়া প্রকৃতির বিকৃতি দূর হওয়া চাই। জীবনের কথায়ও তাই। শঙ্করের উপর ধীরে ধীরে অভিষেক করিতে হয়। এইটি আমার প্রিয় দৃষ্টান্ত। এ ক্রিয়া আমি ছোটবেলায়

রোজ দেখিতাম। সবটা মিলিয়া চব্বিশ ঘণ্টায় ঐ জল জোর দুই বালতি হইবে। ঝপ্ করিয়া দুই বালতি জল শিবের উপর ঢালিয়া দিলেই ত হয়? একথার উত্তর ছেলেবেলাতেই আমি পাইয়াছিলাম। একবারে ঢালিলে কর্ম সফল হইবার নয়। বিন্দু বিন্দু সতত পড়িতে থাকার নাম উপাসনা। সমান সংস্কারের সদৃশ ধারা সতত বহা চাই। যে সংস্কার সকালে তাহাই দুপুরে, তাহাই সন্ধ্যায়। যাহা দিবসে তাহাই রাত্রে। যাহা কাল তাহাই আজ আর যাহা আজ তাহাই কাল। যাহা এ বছর তাহাই আগামী বছর। যাহা এ জন্মে, তাহাই পরজন্মে। যাহা জীবনে তাহাই মরণে। এরূপ এক এক সৎসংস্কারের দিব্য ধারা সারা জীবনব্যাপী সতত বহিতে থাকা চাই। এরূপ প্রবাহ অখন্ড বহিতে থাকিলে আমরা অন্তে জয়ী হইব। তখনই গন্তব্যে যাইয়া পতাকা রোপণ করিতে পারিব। সংস্কারসমূহের প্রবাহ একই দিকে বহা চাই। পাহাড়ে পড়িয়া জল যদি চারিদিকে বহিয়া যায় তবে তাহা হইতে নদী সৃষ্টি হইবে না। কিন্তু সব যদি একদিকে বহে তবে ধারা হইতে নালা, নালা হইতে প্রবাহ, প্রবাহ হইতে নদী, নদী হইতে গঙ্গা সৃষ্টি হইয়া অহা সমুদ্রে গিয়া মিলিবে। যে জল একদিকে বহিয়াছে তাহা সমুদ্রে গিয়া মিলিয়াছে। কিন্তু যাহা চারিদিকে বহিয়াছে তাহা আগে গিয়া কোথাও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সংস্কার যদি আসে ও যায় ত লাভ কি? সংস্কারসমূহের পবিত্র প্রবাহ যদি নিয়ত বাড়িতে থাকে তবেই শেষটায় মরণ মহানন্দের বিধান মনে হইবে। যে যাত্রী পথে বেশী না থামিয়া, পথের মোহে না ভুলিয়া, এক পায়ের পর আর এক পা ফেলিয়া কষ্টে শিখরে গিয়া পৌঁছে, আর পিঠের সকল বোঝা, সকল বন্ধন খুলিয়া সেখানকার খোলা হাওয়া অনুভব করে তাহার আনন্দের আন্দাজ অপরের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে যাত্রী রাস্তায় থামিয়া গিয়াছে, সে-ই থামিয়া গিয়াছে, সূর্য থামে নাই।

(৩৯)

সার কথা, বাহিরে যখন সতত স্বধর্মাচরণ ও অন্তরে চিত্তশুদ্ধির হরিস্মরণের ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, অন্তর্বাহ্যে যখন কর্ম-বিকর্মের প্রবাহ

কাজ করিবে তখন মরণ আনন্দদায়ী বস্তু মনে হইবে। তাই ভগবান বলিতেছেন :

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ

আমায় অখণ্ড স্মরণ কর আর যুদ্ধ করিতে থাক। 'তাতে রঙিগয়ে যাও সদা।' সদা ঈশ্বরে লীন থাক। ভগবৎ প্রেমে যখন অন্তর্বাহ্য রঙিগয়া যাইবে, সেই রং যখন সারা জীবনে ব্যাপ্ত হইবে তখন পবিত্র কথায় সদাই আনন্দ অনুভব হইতে থাকিবে। মন্দ বৃত্তি তখন সামনে আসিয়া দাঁড়াইবেই না। সুন্দর মনোরথের অংকুর মনে গজাইবে। আপনা হইতে হইতে থাকিবে।

ঈশ্বরস্মরণ দ্বারা ভাল কর্ম সহজে হইতে থাকিবে ইহা ঠিক। কিন্তু সতত যুদ্ধ করিতে থাক ইহাও ভগবানের আর এক আজ্ঞা। তুকারাম মহারাজ বলেন :

রাত্রি দিবস আম্হাং যুদ্ধাচা প্রসংগ।
অন্তর্বাহ্য জগ আণি মন।

ভিতরে ও বাহিরে অনন্ত সৃষ্টি ব্যাপ্ত। এই সৃষ্টির সহিত মনের সতত ঝগড়া চলিতেছে। এ ঝগড়ায় সব সময় জয়লাভ হইবে তা নয়। শেষ পর্যন্ত যার জয় হইবে সেই সত্যকার বিজয়ী। শেষের জয়ই জয়। কখনও সাফল্য, আর কখনও অসাফল্য লাভ হইবে। অসফলতায় নিরাশ হইবার কারণ নাই। পাথরে ঊনিশ ঘা মারা হইয়াছে, তবু ভাঙে নাই। কুড়ি বারের বার ভাঙিগয়াছে। তবে কি মনে করিবে যে এই ঊনিশ ঘা বৃথা গিয়াছে? সেই বিশ ঘায়ের সাফল্যের পথ ঐ ঊনিশ ঘায়ে তৈরী হইয়াছে।

নিরাশ হওয়া অর্থ নাস্তিক হওয়া। ঈশ্বর আমাদের রক্ষক। বিশ্বাস রাখিও। শিশুর সাহস বাড়াইবার জন্য মা তাকে এদিক-ওদিক যাইতে দেন। কিন্তু তাকে তিনি পড়িতে দেন না। পড়ার উপক্রম হইলে আস্তে তুলিয়া লন। ঈশ্বর তোমাদের উপর নজর রাখেন। তোমার জীবন-পতঙেগর ডোর তাঁর হাতে। তাহা কখনও তিনি টানিয়া ধরেন, কখনও ছাড়িয়া দেন। কিন্তু ডোর যে তাঁহার হাতে এ বিশ্বাস রাখ। গঙগার ঘাটে সাঁতার শিখায়। ঘাটের গাছে শিকল বাঁধা থাকে। সেই শিকল কোমরে বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেয়। ওস্তাদ জলেই থাকেন। শিক্ষার্থী প্রথম প্রথম দুই-চারিবার

ডোবে ওঠে; কিন্তু অন্তে সাঁতার কাটার কৌশল শিখিয়া লয়। তদ্রূপ পরমেশ্বর আমাদের জীবনকলা শিখাইতেছেন।

(৪০)

পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখিয়া যদি কায়মনোবাক্যে দিনরাত লাড়িতে থাক তবে অন্তিম সময় খুব উত্তম হইবে। সে সময়ে সব দেবতা অনুকূল হইবেন। এই অধ্যায়ের অন্তে রূপক দ্বারা একথা বুঝান হইয়াছে। এই রূপক আপনারা বুঝিয়া লউন। যাহার মৃত্যুর সময়ে আগুন জ্বলিতে থাকে, সূর্য কিরণ দিতে থাকে, শুক্ল পক্ষের চন্দ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে, উত্তরায়ণে নিরভ্র সুন্দর আকাশ প্রসারিত হইতে থাকে, সে ব্রহ্মে বিলীন হয়। আর যাহার মৃত্যুর সময়ে ধোঁয়ায় সব আচ্ছন্ন হইতে থাকে, ভিতর বাহির অন্ধকার হইতে থাকে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র ক্ষীণ হইতে থাকে, দক্ষিণায়নে মলিন ও অভ্রাচ্ছাদিত আকাশ ব্যাপ্ত হইতে থাকে, সে আবার জন্মমরণের চক্রে পড়িবে।

এই রূপক পড়িয়া বহুলোকে ধাঁধায় পড়ে। পুণ্য মৃত্যু চাহি ত অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ এই সব দেবতার কৃপা থাকা দরকার। অগ্নি কর্মের চিহ্ন, যজ্ঞের নিদর্শন। অন্তিমকালেও যজ্ঞের শিখা জ্বলিতে থাকা চাই। ন্যায়মূর্তি রানাডে বলিতেন, "নিরন্তর কর্তব্য করতে করতে যদি মৃত্যু আসে ত ধন্য হব। কিছু পড়ছি, লিখছি, কোনও কাজ করছি—এই অবস্থায় মরি ত পুরা পেলাম।" 'যজ্ঞের শিখা জ্বলিতে থাকা'র ইহাই অর্থ। মরণ সময়েও কর্ম করিতেছি ইহা অগ্নির কৃপা। সূর্যের কৃপার অর্থ এই যে, বুদ্ধির প্রভা অন্ত পর্যন্ত চমকিতে থাকিবে। চন্দ্রের কৃপার অর্থ এই যে, মরণের সময় পবিত্র ভাবনা অনুক্ষণ ভাবিতে থাকা চাই। চন্দ্র মনের—ভাবনায় —দেবতা। শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের মত মনে প্রেম, ভক্তি, উৎসাহ, পরোপকার, দয়া, ইত্যাদি শুদ্ধ ভাবনার বিকাশ হওয়া চাই। আকাশের কৃপার অর্থ এই যে, হৃদয়াকাশে আসক্তিরূপ বাদল যেন দেখা না দেয়। গান্ধীজী একবার বলিয়াছিলেন, "আমি দিনরাত চরখার কথা বলি। চরখাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করি। কিন্তু অন্ত সময়ে তার বাসনা যেন না থাকে। যিনি আমাকে

চরখার প্রেরণা দিয়েছেন, চরখার কথা ভাববার শক্তি তাঁর পূর্ণমাত্রায়ই আছে। চরখা এখন অন্য সব ভাল ভাল লোকের হাতে পৌঁছে গেছে। চরখার ভাবনা ছেড়ে পরমেশ্বরের সাক্ষাতের জন্য আমাকে প্রস্তুত হতে হবে।" তাৎপর্য, উত্তরায়ণের অর্থ হৃদয়ে আসক্তির বাদল না থাকা।

শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দেহ কোন-না-কোন সেবাকার্য করিতেছে, ভাবনার পূর্ণিমা চমকাইতেছে, হৃদয়াকাশে আসক্তির লেশও নাই, বুদ্ধি সতেজ—এই অবস্থায় মৃত্যু হইলে লোক পরমাত্মার সহিত মিলিবে। এরূপ পরম মঙ্গলময় অন্ত লাভের নিমিত্ত সাবধানতা সহকারে রাতদিন দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকা চাই। মুহূর্তের জন্যও মনে অশুদ্ধ সংস্কার উঠিতে দিতে নাই। আর এই শক্তি লাভের নিমিত্ত সতত পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা চাই। পুনঃ পুনঃ নামস্মরণ, তত্ত্বস্মরণ করা চাই।

রবিবার, ১০-৪-৩২

নবম অধ্যায়

(৪১)

বন্ধুগণ,

আমার গলায় ব্যথা। আমার কথা আজ শোনা যাইবে কিনা ঠিক বুঝিতেছি না। এই প্রসঙ্গে সাধুচরিত্র বড় মাধবরাওয়ের অন্তিম সময়ের কথা মনে পড়িতেছে। ঐ মহাপুরুষ তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কফের প্রকোপ অত্যন্ত প্রবল। কফের পর্যবসান অতিসারে করা যায়। মাধবরাও বৈদ্যকে বলিলেন, "কফ দূর হয়ে অতিসার আসে সে ব্যবস্থা করুন। তা হলে কণ্ঠ মুক্ত হবে। হরিনাম করতে পাব।" আমিও আজ পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছিলাম। ভগবান বলিলেন, "গলায় যেমন দেয় তেমন বলবে।" আমি এখানে গীতার আলোচনা করিতেছি। কাহাকেও উপদেশ দেওয়ার জন্য তাহা নয়। লাভবান যাঁহারা হইতে চান তাঁহাদের অবশ্য লাভ হইবে। কিন্তু গীতা রামনাম, তাই ত আমি গীতা শুনাইতেছি। আমি গীতা বলি না, আমি হরিনাম করি। আমি যাহা বলিতেছি আজিকার আলোচ্য নবম অধ্যায়ের সহিত তার সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই অধ্যায়ে হরিনামের অপূর্ব মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে। এই অধ্যায় গীতার মধ্যস্থলে অবস্থিত। গোটা মহাভারতের মধ্যভাগে গীতা আর গীতার মধ্যভাগে নবম অধ্যায়। নানা কারণে এই অধ্যায় পবিত্র হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে অন্তিম সমাধিকালে জ্ঞানদেব এই অধ্যায়ের জপ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করেন। এই অধ্যায়ের স্মরণমাত্রে আমার চক্ষু ছলছল হয়, হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়। ব্যাসদেবের ইহা কত বড় কৃপা! কেবল ভারতবর্ষ নহে, সমস্ত মনুষ্যজাতির উপর তাঁহার এই কৃপা বর্ষিত হইয়াছে। যে অপূর্ব কথা ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, তাহা শব্দে ব্যক্ত করার মত নয়। কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া ব্যাসদেব সেকথা সংস্কৃত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। গুহ্য বস্তুকে বাণীরূপ দিয়াছেন। এই অধ্যায়ের আরম্ভে ভগবান বলিতেছেন :

"রাজবিদ্যা মহাগুহ্য উত্তমোত্তম পাবন"

এই যে রাজবিদ্যা, এই যে অপূর্ব বস্তু, তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। উহাকে ভগবান 'প্রত্যক্ষাবগম' বলিয়াছেন। শব্দ যাহা ধরিতে অসমর্থ অথচ প্রত্যক্ষ অনুভবের কষ্টিপাথরে যাহার যাচাই হইয়া গিয়াছে এরূপ কথা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার ফলে ইহা একান্ত মধুর হইয়াছে।

কে জানে কোথা, যমপুর কি সুরপুর যাবো।
রামদাস তুলসীর এ জীবনই ভালো॥

মরিলে স্বর্গলাভ হইবে সে কথায় এখানে কি লাভ? স্বর্গে কে যায়, আর যমপুরে কে যায় সেকথা কে বলিবে? এখানে যে দুই দিন থাকিতে হইবে রামের গোলাম হইয়া থাকাতেই আমার আনন্দ, তুলসীদাস একথা বলেন। রামের গোলাম হইয়া থাকার মাধুর্য এই অধ্যায়ে রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ এই দেহেই, এই চক্ষেই অনুভব করা যায় এইরূপ ফলের, জীবদ্দশায় উপলব্ধি করা যায় এইরূপ বিষয়ের কথা—এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। গুড় খাইলে গুড়ের মিষ্টতা বুঝা যায়। তদ্রূপ রামের গোলাম হইয়া থাকার মাধুর্য এখানে বিদ্যমান। তেমনি এই মৃত্যুলোকের জীবনের মাধুর্য যাহা দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায় সেই রাজবিদ্যার কথা এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই রাজবিদ্যা গূঢ়। কিন্তু ভগবান সকলের পক্ষে তাহা সুলভ করিয়া রাখিয়াছেন, সকলের জন্য খুলিয়া ধরিয়াছেন।

(৪২)

গীতা যে ধর্মের সার তাহাকে বৈদিক ধর্ম বলে। বৈদিক ধর্ম মানে বেদ হইতে নিষ্পন্ন ধর্ম। জগতে যত প্রাচীন গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া মান্য। তাই ভাবুক লোকেরা বেদকে অনাদি বলিয়া থাকেন। সেহেতু বেদ পূজ্য হইয়া রহিয়াছে। আর ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিলেও বেদ আমাদের সমাজের প্রাচীন ভাবনার প্রাচীনতম নিদর্শন। তাম্রপট্ট, শিলালেখ, মুদ্রা, পাত্র, প্রস্তরীভূত প্রাণীদেহ ইত্যাদি উপকরণ হইতে এই লিখিত প্রমাণ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জগতে যদি আদি ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু থাকে ত সে বেদ। এই বেদে যে ধর্ম বীজরূপে ছিল তাহা বাড়িতে বাড়িতে বৃক্ষ হইয়াছে আর অবশেষে তাহাতে গীতারূপ

দিব্য মধুর ফল ধরিয়াছে। ফল ছাড়া গাছের আমরা আর কিই বা খাইতে পারি? বৃক্ষে ফল ধরিলেই না বৃক্ষ হইতে খাওয়ার বস্তু মিলে। বেদ-ধর্মের সারের সার এই গীতা।

প্রাচীনকাল হইতে এই যে বেদ-ধর্ম প্রসিদ্ধ ছিল, তাহাতে নানা যজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ, বিবিধ তপশ্চর্যা, বহুবিধ সাধনার কথা আছে। এই যে সব কর্মকান্ড তাহা নিরর্থক নয় বটে, তবে তার অধিকারী হইতে হয়। কর্মকান্ড সকলের পক্ষে সুলভ ছিল না। উচ্চ নারিকেল বৃক্ষে উঠিয়া নারিকেল কে ছিঁড়ে, কে ছাড়ায়, কে ভাঙে? আমার খুব ক্ষুধা লাগিতে পারে কিন্তু ঐ উচ্চ বৃক্ষের নারিকেল পাওয়ার উপায় কি? আমি নীচ হইতে নারিকেল দেখি, নারিকেল উপর হইতে আমাকে দেখে। তাহাতে কি পেটের ক্ষুধা মিটে? ঐ নারিকেল যতক্ষণ না আমার হাতে আসে, ততক্ষণ সবই বৃথা। বেদের এই নানা ক্রিয়াতে অতি সূক্ষ্ম বিচার নিহিত। সাধারণ লোকে তাহা বুঝিবে কিরূপে? বেদমার্গ ছাড়া মোক্ষ নাই কিন্তু বেদের অধিকারও ত নাই, তবে অপর সকলের কাজ চলে কিভাবে? তাই ত কৃপাসিন্ধু সাধু-পুরুষেরা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এই বেদের সার নিষ্কাশন করছি। সংক্ষেপে বেদের সারসঙ্কলন করে জগতের কাছে ধরছি।" অতএব তুকারাম মহারাজ বলিয়াছেন :

"বেদ বলেছে অনন্ত। অর্থ এতেই লভ্য।"

সে অর্থ কি? হরিনাম। হরিনাম বেদের সার। রামনামের দ্বারা মোক্ষ নিশ্চিত লভ্য হইয়াছে। স্ত্রী, শিশু, শূদ্র, বৈশ্য, অশিক্ষিত, দুর্বল, রোগী, পঙ্গু, সকলের পক্ষে মোক্ষ সুলভ হইয়া গিয়াছে। বেদের আল-মারিতে আবদ্ধ মোক্ষ ভগবান রাজপথে আনিয়া দিয়াছেন। কেমন সহজ সরল পথ! যাহার যেরূপ সহজ জীবন, যাহা স্বধর্ম-কর্ম, সেবা-কর্ম তাহাকেই যজ্ঞময় করিয়া দিন না কেন? যাগযজ্ঞের দরকার কি? তোমার দৈনন্দিন সহজ সেবা-কর্মকেই যজ্ঞ-রূপ দাও। তাহাই রাজমার্গ।

যানাস্থায় নরো রাজন্ প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ॥
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥

এই মার্গে চক্ষু বুজিয়া দৌড়াইয়া গেলেও পতনের ভয় নাই। দ্বিতীয়

মার্গ হইতেছে, "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"র ন্যায়। তার তুলনায় তরবারির ধারও কতকটা ভোঁতা। বৈদিক মার্গ এমনি দুরূহ মার্গ। রামের গোলাম হইয়া থাকার পথ সহজ। একটু একটু করিয়া উঁচু করিতে করিতে ইঞ্জিনীয়ার রাস্তা শিখরে লইয়া যায়, আর আমাদের উচ্চ শিখরে বসাইয়া দেয়। এত উপরে যে উঠিতেছি তাহা টেরও পাওয়া যায় না। ইঞ্জিনীয়ারের এই বিশেষত্বের মতই রাজমার্গের বিশেষত্ব। মানুষ যেখানে যে কর্ম করিতেছে সেই কর্ম দ্বারা সেখানেই সে ভগবানকে পাইতে পারে। এইরূপই এই মার্গ।

পরমেশ্বর কি কোথাও লুকাইয়া আছেন? কোন উপত্যকায়, কোন গহ্বরে, কোন নদীতে, কোন স্বর্গে কি তিনি আত্মগোপন করিয়া বসিয়া গিয়াছেন? হীরা-মাণিক্য, সোনারূপা পৃথিবীর অভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকে। মোতি-প্রবাল রত্নাকর সমুদ্রে লুক্কায়িত থাক। তেমনই কি পরমেশ্বররূপ 'লালরতন' কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছেন? ভগবানকে কোথাও হইতে কি খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে? তিনি ত সব সময়ে আমাদের সকলের সামনে সর্বত্র দণ্ডায়মান। এই যে সব লোক তাহারা সকলেই ভগবানের মূর্তি। ভগবান বলেন, "এই যে মানবরূপে প্রকটিত হরিমূর্তি তার অবমাননা করিস নে ভাই।" ঈশ্বরই চরাচরে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে খোঁজার নিমিত্ত কৃত্রিম উপায়ে কি প্রয়োজন? উপায় সহজ। যেসব সেবাকার্য তুমি কর সে সবের সম্বন্ধ রামের সহিত জুড়িয়া দাও। বস্—কর্ম হাসিল। রামের গোলাম হইয়া যাও। ঐ কঠিন বেদমার্গ, ঐ যজ্ঞ, স্বাহা, স্বধা, ঐ শ্রাদ্ধ, ঐ তর্পণ, সবই মোক্ষের দিকে লইয়া যাইবে। কিন্তু অধিকারী অনধিকারীর ঝামেলা সেখানে উপস্থিত হয়। তাহার দরকারই আমাদের নাই। যাহা কিছু কর সব ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া দাও এইটুকু মাত্র কর। প্রত্যেক কর্মের সম্বন্ধ তাঁর সহিত জুড়িয়া দাও। ইহাই নবম অধ্যায়ের কথা। তাই ভক্তের তাহা অতীব প্রিয়।

(৪৩)

কৃষ্ণের সারা জীবনে তাঁর বাল্যকাল অতি মধুর। লোকে আলাদা করিয়া বালকৃষ্ণের উপাসনা করে। গোপ-বালকদের সহিত সে গরু চরায়,

তাহাদের সহিত খায়-দায়, তাহাদের সহিত হাসে-খেলে। গোপ-বালকেরা ইন্দ্রের পূজা করিতে যাইবে ত সে তাহাদের বলিল, "ইন্দ্রকে কেউ দেখেছে? কোন উপকার সে করে? এই গোবর্ধন পর্বত প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সেখানে গরু চরে। সেখান থেকে নদী বয়। তার পূজা কর।" এই শিক্ষা তিনি দিতেন। যে গোপ-বালকদের সহিত তিনি খেলিয়াছিলেন, যে গোপীদের সহিত তিনি কথা বলিয়াছিলেন, হাসিয়াছিলেন, যে গরু-বাছুরের সহিত তিনি চলাফেরা করিয়াছিলেন তাহাদের সকলের জন্য মোক্ষের পথ তিনি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-পরমাত্মা নিজ প্রত্যক্ষ অনুভব দ্বারা এই সহজ মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাল্যকালে তাঁহার সম্বন্ধ ছিল গরু-বাছুরের সহিত, প্রাপ্ত বয়সে ঘোড়ার সহিত। মুরলীর ধ্বনি কানে আসিতেই গাভী আহ্লাদে আত্মহারা হইত, আর কৃষ্ণ হাত বুলাইতেই ঘোড়া পুলকিত হইয়া উঠিত। সেই গাভী, রথের সেই ঘোড়া, একেবারে কৃষ্ণময় হইয়া যাইত। 'পাপযোনি' বলিয়া বিবেচিত ঐ পশুদেরও যেন মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিত। মোক্ষে কেবল মানুষেরই অধিকার নহে, পশুপক্ষীরও আছে—একথা শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। নিজ জীবনে তিনি একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ভগবানের যে অনুভূতি ব্যাসদেবেরও সেই অনুভূতি। কৃষ্ণ ও ব্যাস দুইই একরূপ। উভয়ের জীবনের সারও এক। মোক্ষের অবলম্বন বিদ্যাবত্তা নহে, আর কার্যকলাপও নহে। সাদাসিধা সরল ভক্তিই পর্যাপ্ত। 'আমি' 'আমি' বলিয়া অহঙ্কারী জ্ঞানী ব্যক্তি কোথায় পেছনে পড়িয়া রহিয়াছেন আর শ্রদ্ধাপরায়ণা সাদাসিধা নারী আগাইয়া গিয়াছেন। পবিত্র মন আর সরল শুদ্ধ ভাব—আর কি চাই, মোক্ষ দূর নহে। মহাভারতে জনক-সুলভা-সংবাদ নামে একটি প্রকরণ আছে। জ্ঞানলাভের নিমিত্ত জনক রাজা এক নারীর কাছে গিয়াছিলেন, ব্যাসদেব এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। বেদে স্ত্রীলোকের অধিকার আছে কিনা আপনারা এই তর্ক জুড়িবেন, কিন্তু এদিকে দেখুন সুলভা জনক রাজাকে পর্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। সে সামান্য নারী। জনক কত বড় রাজা! কত বিদ্যায় বিভূষিত! কিন্তু মহাজ্ঞানী জনকের হাতে মোক্ষ ছিল না। তাই ব্যাসদেব তাঁহাকে সুলভার শরণ লইতে পাঠাইলেন। তুলাধার বৈশ্যও তদ্রূপ। জাজলি

ব্রাহ্মণ তাহার কাছে জ্ঞানের জন্য উপস্থিত। তুলাধার বলিতেছেন, "পাল্লার দাঁড়ি সমান রাখাতেই আমার সব কিছু জ্ঞান।" ব্যাধের কথাও তদ্রূপ: ব্যাধ ত কসাই। পশুহত্যা করিয়া সমাজের সেবা করিত। কোন অহংকারী ব্রাহ্মণকে তাহার গুরু ব্যাধের কাছে যাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণের আশ্চর্য ঠেকিল। কসাই কি জ্ঞান দিবে! ব্রাহ্মণ ব্যাধের কাছে গেল। ব্যাধ কি করিতেছিল? মাংস কাটিতেছিল, ধুইতেছিল, বিক্রীর জন্য পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছিল। ব্রাহ্মণকে সে বলিল, "এ কার্যকে যতটা ধর্মময় করা যায় তা আমি করি। এ কার্যে আত্মা যতটা ঢেলে দেওয়া যায় ততটা ঢেলে দিয়ে আমি এ কার্য করি, আর মা-বাপের সেবা করি।" এইভাবে এই ব্যাধের রূপে ব্যাসদেব আদর্শ মূর্তি খাড়া করিয়াছেন।

মোক্ষের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত একথা প্রতিপাদনের নিমিত্ত মহাভারতে এই সব নারী, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদির প্রসঙ্গ অবতারণা করা হইয়াছে। এই তত্ত্ব নবম অধ্যায়ে ধরা হইয়াছে। ঐসব কথার উপরে এই অধ্যায়ে শীলমোহর অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রামের গোলাম হইয়া থাকাতে যে মাধুর্য, ব্যাধের জীবনে তাহা রহিয়াছে। তুকারাম মহারাজ অহিংসার সাধক। কিন্তু সজন কসাই কসাইয়ের কাজ করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন একথা তিনি বড়ই আগ্রহে বর্ণনা করিয়াছেন। আর এক জায়গায় তুকারাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভগবান, পশু-হত্যাকারীর গতি কি হবে?" কিন্তু,

"সজন কসাইয়ের সাথে বেচে মাংস"—

এই চরণ লিখিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ভগবান সজন কসাইয়ের সহায়তা করেন। যে ভগবান নরসী মেহতার হুণ্ডি চুকাইয়া দিয়াছিলেন, একনাথের জলভরা বাঁক বহিয়া আনিয়াছিলেন, দামাজীর জন্য মহার* হইয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রের প্রিয় জনাবাঈকে ধান-ভানায় সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই ভগবান সজন কসাইকেও তেমন প্রেমে সহায়তা করিতেন, একথা তুকারাম বলিতেছেন। সারাংশ, পরমেশ্বরের সহিত সকল কর্মের সম্বন্ধ জুড়িতে হইবে। কর্ম যদি শুদ্ধ ভাব হইতে করা হয়, সেবাময় হয়, তবে তাহা যজ্ঞরূপই বটে।

---

*মহারাষ্ট্রের এক হরিজন জাতি।

(৪৪)

এই বিশেষ কথা নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই দুইয়ের মধুর মিলন হইয়াছে। কর্মযোগের অর্থ, কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু ফল ত্যাগ করিতে হইবে। এইভাবে কর্ম করিবে যে ফলের বাসনা চিত্ত স্পর্শ না করে। তাহা যেন আখরোটের গাছ বসানো। আখরোট গাছে পঁচিশ বৎসরে ফল ধরে। যে লাগায় তার ভাগ্যে ফল খাওয়া ঘটে না। তবু তাহা লোকে লাগায় ও যত্নে বাড়ায়। কর্মযোগ মানে গাছ লাগানো আর ফলের প্রত্যাশা না রাখা। ভক্তিযোগ মানে কি? ভাব-পূর্বক ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাওয়া ভক্তিযোগ। রাজযোগে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ একত্র মিশিয়া যায়। নানা লোকে রাজযোগের নানা ব্যাখ্যা করিয়াছে। কিন্তু সংক্ষেপে রাজযোগ মানে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের মধুর মিশ্রণ, ইহা আমার ব্যাখ্যা।

কর্ম ত করিতে হইবেই; কিন্তু ফল ত্যাগ করা নয়। তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। ফল ত্যাগ কর বলিতে ফলের নিষেধ বুঝায়। অর্পণে তাহা নাই। ইহা এক অতি উত্তম ব্যবস্থা। তাহাতে অপূর্ব মাধুর্য বিদ্যমান। ফলত্যাগের অর্থ এই নয় যে কেহই ফল লইবে না। কেহ না কেহ তাহা নিশ্চয়ই লইবে। কেহ না কেহ তাহা নিশ্চয় পাইবে। এখানে তর্ক উঠিতে পারে, যে পাইবে সে পাওয়ার উপযুক্ত কিনা? দ্বারে ভিখারী আসিলে আমরা চট করিয়া বলিয়া বসি, "বেশ মোটা-তাগড়া। ভিক্ষে করা শোভা পায় না। পথ দেখ।" তার ভিক্ষা চাওয়া উচিত কি অনুচিত সে বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হই। বেচারা ভিখারী লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া যায়। তার প্রতি আমাদের অন্তরে সহানুভূতি আদৌ নাই। তবে আর ভিখারীর যোগ্যতা আমরা কিরূপে নির্ধারণ করিব? ছেলেবেলায় আমি মার কাছে এরূপ সংশয় ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন আজিও তাহা আমার কানে ধ্বনিত হয়। মাকে বলিয়াছিলাম, "এ ত দেখতে হৃষ্টপুষ্ট। একে ভিক্ষা দেওয়ার অর্থ ব্যসন ও আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া।" গীতার 'দেশে কালে চ পাত্রে চ' শ্লোকটি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। মা বলিয়াছিলেন, "যে ভিখারী এসেছে সে ত পরমেশ্বরই। কর এবার পাত্রাপাত্রের বিচার। ভগবান

কি অপাত্র? পাত্রাপাত্র বিচারে তোমার আমার কি অধিকার? আর অধিক বিচার করার প্রয়োজনও দেখি না। আমার কাছে সে ভগবান।" মায়ের এ কথার উত্তর আজও আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

অন্যকে খাওয়ানর কথায় পাত্রাপাত্রের কথা আমি বিচার করি। কিন্তু নিজে যখন খাই তখন ভুলেও কি ভাবি যে খাওয়ার অধিকার আমার আছে কিনা? আমাদের দ্বারে উপস্থিত ভিখারীকে তবে ইতর মনে করি কেন? যাঁহাকে দিতেছি তিনি ভগবান একথা মনে করিনা কেন? রাজযোগ বলে, "তোমার কর্মের ফল কেউ না কেউ ত পাবেই, তা নয় কি? তা পুরাপুরি ভগবানকেই দিয়ে দাও। তাঁকে অর্পণ কর।" রাজযোগ যোগ্য স্থান দেখাইয়া দিতেছে। ফলত্যাগরূপ নিষেধাত্মক কর্ম ইহাতে নাই, আর ভগবানকে যখন অর্পণ করিতে হইবে তখন পাত্রাপাত্রের প্রশ্নও নাই। ভগবানে সমর্পিত দান ত সর্বদা শুদ্ধ হইবেই। তোমার কর্মে যদি দোষও থাকে ত তাঁর হাতে পড়িবামাত্র পবিত্র হইয়া যাইবে। দোষ দূর করিতে যতই চেষ্টা করি না কেন তবুও দোষ কিছু থাকিয়া যায়ই। তাহা হইলেও, যতটা শুদ্ধ হইয়া কর্ম করা যায় তাহা করিতে হইবে। বুদ্ধি ঈশ্বরের দান। যতদূর শুদ্ধভাবে তাহা ব্যবহার করা যায় ততদূর শুদ্ধ ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। তাহা না করিলে পাপ হইবে। অতএব পাত্রাপাত্র বিচারও করা চাই। কিন্তু ভগবদ্ভাবের দরুন সে কাজ সোজা হইয়া যায়।

ফলের বিনিয়োগ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত করা চাই। যে কর্ম যেরূপ হইবে, তেমনই তাহা ভগবানকে অর্পণ করিবে। প্রত্যক্ষ কর্ম যেমন হইতে থাকিবে তেমন তেমন তাহা ভগবানে অর্পণ করিয়া মনস্তুষ্টি লাভ করা চাই। ফল ত্যাগ করা নয়, ভগবানকে তাহা দিয়া দেওয়া। কেবল তাহাই নয়, মনে যে সব বাসনা জন্মে তাহা এবং কাম ক্রোধাদি বিকার পর্যন্ত ভগবনাকে দিয়া মুক্ত হওয়া চাই।

"কাম ক্রোধ মোর, হলো এবে তোর"

এই রাজযোগে সংযমাগ্নিতে পড়িয়া জ্বলা নাই, পোড়া নাই; যেমনি অর্পণ তেমনি ছুটি। নাই কাউকে পায়ে দলা, নাই মারামারি।

"রোগ মরে দুধে চিনিতে, তবে কি কাজ তেতো নিমে।"

ইন্দ্রিয়সমূহও সাধন। তাহাদিগকে ঈশ্বরার্পণ কর। বলা হয়—কান কথা মানে না; তাই বলিয়া কি শোনাই বন্ধ করিয়া দিবে? শুনিবে, কেবল হরিকথা শুনিবে। শ্রবণ না করা বড় কঠিন। কিন্তু হরিকথারূপ শ্রবণের বিষয়ে কানের ব্যবহার করা অনেক বেশী সহজ, রুচিকর ও হিতকর। তোমার কান রামকে দাও। মুখে রামনাম কর। ইন্দ্রিয় শত্রু নহে। তাহারা ভাল তাহাদের সামর্থ্য অনেক। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধি হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে কাজ আদায় করা—ইহা রাজমার্গ। ইহাই রাজযোগ।

(৪৫)

অমুক কর্ম ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা নয়। কর্মমাত্রই তাঁকে সমর্পণ কর। সে সবই শবরীর কুল। রাম কতই না আদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরের আরাধনা করার জন্য গুহায় যাওয়ার দরকার নাই। তুমি যেখানে যে কর্ম কর তাহা ভগবানে অর্পণ কর। মা সন্তানের দেখাশুনা করেন না ত, ভগবানেরই যেন দেখাশুনা করেন। সন্তানকে স্নান করান, তাহা যেন পরমেশ্বরের অভিষেক। শিশু পরমেশ্বরের দয়ার দান, একথা মনে করিয়া পরমেশ্বরের ভাবনা হইতে শিশুর লালনপালন করা মায়ের কর্তব্য। কি প্রেমবশেই না কৌশল্যা রামচন্দ্রের, ও যশোদা কৃষ্ণের কথা ভাবিতেন! তাহা বর্ণনা করিতে পাইয়া শুক, বাল্মীকি, তুলসী-দাস নিজেদের ধন্য মানিয়াছেন। এই কর্মে তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। মাতার এই সেবাকার্য অতি উচ্চ স্তরের। ঐ যে শিশু সে ত পরমেশ্বরেরই মূর্তি, সেই মূর্তির সেবা অপেক্ষা অধিক ভাগ্যের আর কি থাকিতে পারে? পরস্পরের সেবার বেলায় এই ভাবনা হইতে যদি আমরা কাজ করি তবে আমাদের কর্মে কি পরিবর্তনই না দেখা দিবে! যাহার কাছে যে সেবাকর্ম উপস্থিত, তাহা ঈশ্বরেরই সেবা একথা আমাদের নিরন্তর মনে রাখা চাই।

কৃষক বলদের সেবা করে। এই বলীবর্দ কি তুচ্ছ? না। বেদে বামদেব শক্তিরূপে বিশ্বব্যাপী যে বৃষের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই ঐ কৃষকের বলদে মূর্ত।

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্যাং আবিবেশ ॥"

যার চারিটি শিং, তিন পা, দুই মাথা, সাত হাত, যে তিন স্থানে বাঁধা, মহান্ তেজস্বী হইয়া যে সকল মর্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত এইরূপ গর্জনকারী বিশ্বব্যাপী বলীবর্দের পূজা কৃষক করে। টীকাকারেরা ইহার পাঁচ সাত রকম বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। আর এই বলদও বিচিত্র! আকাশে গর্জন করিয়া যে বলদ বৃষ্টিপাত করে, সেই ক্ষেতে মলমূত্র বর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদনকারী কৃষকের বলদরূপে বিদ্যমান। এই উচ্চ ভাবনা হইতে কৃষক যদি নিজ বলদের সেবা করে, যত্ন করে তবে এই সাধারণ বলদের সেবাই ঈশ্বরার্পণ হইয়া যাইবে।

তদ্রূপ গৃহলক্ষ্মী যদি পাকশাল লেপিয়া মুছিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, উনুন ধরান, শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার্য প্রস্তুত করেন আর এই ভাব পোষণ করেন যে আমার পাকান্ন খাইয়া গৃহের সকলে তৃপ্ত হউক, পুষ্ট হউক ত তাঁর এইসব কর্মই নিঃসন্দেহ যজ্ঞরূপ। মা যেন ক্ষুদ্রায়তন যজ্ঞাগ্নিই প্রজ্বলিত করেন। পরমেশ্বরের তৃপ্তিবিধান করিব এই কামনা হইতে যে আহার্য প্রস্তুত করা হয় তাহা কত যে শুদ্ধ ও পবিত্র হইবে একবার দেখুন। ঐ গৃহলক্ষ্মীর মনে যদি এরূপ উচ্চ ভাবনা থাকে ত তাঁহাকে ভাগবতের ঋষিপত্নীর সমান স্থান দিতে হইবে। ঐরূপ কত মাতাই না সেবা করিতে করিতে তরিয়া গিয়া থাকিবেন। আর 'আমি' 'আমি' উচ্চারণকারী জ্ঞানী ও পণ্ডিত কোথায় কোন্ কোণে পড়িয়া রহিয়াছেন!

(৪৬)

আমাদের দৈনন্দিন জীবন, প্রতিক্ষণের জীবন দেখিতে সাধারণ হইলেও বস্তুত সাধারণ নহে। তাহার মহান্ অর্থ রহিয়াছে। সমস্ত জীবনটাই এক মহান্ যজ্ঞকর্ম। তোমার নিদ্রা, তাহাও এক সমাধি। সর্বপ্রকারের ভোগ ঈশ্বরার্পণ করিয়া নিদ্রা গ্রহণ করি ত তাহা সমাধি নয় ত কি? স্নান

করার সময় পুরুষসূক্ত আবৃত্তি করার রীতি আছে। স্নান-ক্রিয়ার সহিত এই পুরুষসূক্তের সম্বন্ধ কি তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। খোঁজেন ত সম্বন্ধ দেখিতে পাইবেন। সহস্র যাহার বাহু, সহস্র যাহার চক্ষু সেই বিরাট পুরুষের সহিত আমার স্নানের কি সম্বন্ধ? সম্বন্ধ এই, ঘটি ভরিয়া যে জল তুমি মাথায় ঢালিতেছ তাহাতে হাজারো বিন্দু রহিয়াছে। সেই বিন্দু তোমার মাথা ধুইতেছে, তোমায় নিষ্পাপ করিতেছে। তোমার মস্তকে উহা আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছে। পরমেশ্বরের সহস্র হাত হইতে যেন সহস্র ধারা তোমার উপর বর্ষিত হইতেছে। বিন্দু-রূপে স্বয়ং পরমেশ্বর যেন তোমার মস্তকাভ্যন্তরের ময়লা দূর করিতেছেন। এরূপ দিব্য ভাবনা ঐ স্নানে যদি আরোপ কর তবে সে স্নান অন্য কিছু হইয়া যাইবে। তাহাতে অনন্ত শক্তি আসিবে।

যাহা করিতেছি তাহা পরমেশ্বরের কাজ এই ভাবনা হইতে যে কাজই করি না কেন, তাহা সামান্য হইলেও পবিত্র হইয়া যায়। ইহা অনুভবসিদ্ধ কথা। আমাদের বাড়ীতে যিনি আসিয়াছেন তিনি ঈশ্বররূপ একথা একবার মনে করুন দেখি। সাধারণ কোন বড়লোক আসিলে আমরা ঘর-দোর কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করি। কেমন ভাল আহার্য প্রস্তুত করি। আর যদে ধরেন যে, ভগবান আসিয়াছেন তবে সেই কর্মেই মহা পার্থক্য দেখা যাইবে না কি? কবীর কাপড় বুনিতেন। তন্ময় হইয়া যাইতেন।

"ঝীনী ঝীনী ঝীনী, বিনী চদরিয়া"

এই গান গাহিতেন, দুলিতেন। পরমেশ্বরকে পরাইবেন বলিয়া যেন চাদর বুনিতেছেন। ঋগ্বেদের ঋষি বলিতেছেন :

"বস্ত্রেব ভদ্রা সুকৃতা সুপাণী"

সুন্দর হাতে বোনা বস্ত্রের মত আমার এই স্তোত্র আমি ঈশ্বরকে পরাইতেছি। কবি স্তোত্র রচনা করেন ঈশ্বরের জন্য, তাঁতি কাপড় বোনে সেও ঈশ্বরেরই জন্য। কেমন হৃদয়গ্রাহী কল্পনা! কিরূপ চিত্তশুদ্ধকারী হৃদয়-উদ্বেলকারী ভাবনা! এই ভাবনা জীবনে যদি একবার আসে তবে জীবন কতই না নির্মল হইয়া যাইবে! অন্ধকারে বিজলী খেলে ত মুহূর্তে অন্ধকার আলো হইয়া যায়। ঐ অন্ধকার কি আস্তে আস্তে আলো হয়? না,

মুহূর্তে সারা ভিতর-বাহিরের পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। তদ্রূপ, প্রত্যেক কর্ম ঈশ্বরে জুড়িয়া দেওয়া মাত্র জীবনে একেবারে অভূতপূর্ব শক্তি আসে। প্রত্যেক ক্রিয়া তখন বিশুদ্ধ হইতে থাকিবে। জীবনে উৎসাহের সঞ্চার হইবে। আজ আমাদের জীবনে উৎসাহ আছে কি? মরি না তাই বাঁচিয়া আছি। সর্বত্র উৎসাহের অভাব। রোরুদ্যমান কলাহীন জীবন। কিন্তু সর্ব ক্রিয়া ঈশ্বরের সহিত জুড়িতে হইবে এই ভাবনা মনে আন। তখন দেখিবে তোমার জীবন কেমন রমণীয় হইয়াছে, নমনীয় হইয়াছে।

পরমেশ্বরের নাম লওয়া মাত্রেই সহসা পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। সংশয়ের অবকাশ ইহাতে নাই। রামনাম করিলে কি হয় একথা বলিও না। নাম কর তারপর দেখ। মনে কর দিনের কাজ শেষ করিয়া কৃষক সন্ধ্যাকালে ঘরে ফিরিতেছে। পথে এক পথিকের সহিত দেখা। তাহাকে সে বলে :

"চাল ঘরা উভা রাহেং নারায়ণা"

"ভাই পথিক, হে নারায়ণ, থাম। রাত হয়ে এল। দেব, আমার ঘরে চল।" ঐ কৃষকের মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইতে দাও আর তারপর দেখ, ঐ পথিকের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে কিনা। বাটপাড় হইলেও সে পবিত্র হইয়া যাইবে। ভাবনাহেতু এই পার্থক্য হয়। সব কিছু ভাবনাতে নিহিত। জীবন ভাবনাময়। বিশ বৎসর বয়স্ক পরের ছেলে ঘরে আসে। পিতা তাহাকে কন্যা দান করে। বরের বয়স কুড়ি আর কন্যার পিতার বয়স পঞ্চাশ। তবুও কন্যার পিতা বরের পা ছোঁয়। এ কি ব্যাপার? কন্যা অর্পণ করার ঐ কার্য কত পবিত্র। কন্যা যাহাকে অর্পণ করা হয় তাহাকে পরমেশ্বর জ্ঞান করা হয়। জামাতার প্রতি, বরের প্রতি এই যে ভাবনা পোষণ করা হয় তাহা আরও ঊর্ধ্বে লইয়া যাও, অগ্রসর করিয়া দাও।

কেহ কেহ বলিবেন, এরূপ বাজে কল্পনা করিয়া কি লাভ? সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন প্রথমেই তুলিও না। আগে যত্ন কর, উপলব্ধি হউক তখন সত্য-মিথ্যা বুঝা যাইবে। বর সত্য সত্যই পরমাত্মা এরূপ শাব্দিক ভাবনা-স্থলে যথার্থ ভাবনা কন্যাদান-ক্রিয়াতে আসিতে দাও, তারপরে দেখ ত দেখিতে পাইবে কত ব্যবধান হইয়া গিয়াছে। এই পবিত্র ভাবনা হেতু বস্তুর পূর্বরূপে ও উত্তররূপে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি হইবে। কুজন

সুজন হইবে। দুষ্ট শিষ্ট হইবে। এইভাবেই বাল্যাকোলের (দস্যু রত্নাকর) জীবনের পরিবর্তন হইয়াছিল না কি? বীণার তারে অঙ্গুলি নাচিতেছে, মুখে নারায়ণের নাম জপ চলিতেছে, আর মারিতে আসিলেও শান্তি টলিতেছে না, পক্ষান্তরে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে-ছেন—বাল্যা এরূপ দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই। তাহার কুড়াল দেখিয়া হয় লোকে ভয়ে পালাইয়াছে, নয়ত তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে—এতকাল ইহাই সে দেখিয়া আসিয়াছে। এ ক্ষেত্রে সে দেখিল নারদ আক্রমণ করিলেন না বা ভাগিয়াও গেলেন না। শান্তভাবে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাল্যার কুড়াল নামিল না। নারদের ভ্রূ কাঁপিল না। চক্ষু মুদিত হইল না। মধুর ভজন পূর্ববৎ চলিতেছিল। নারদ বাল্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুড়ুল যে নামল না?" বাল্যা বলিল, "তোমাকে শান্ত দেখে।" নারদ বাল্যাকে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন। ঐ রূপান্তর সত্য ছিল কি মিথ্যা?

বস্তুত কেহ দুষ্ট কিনা তাহা নির্ণয় করিবে কে? সত্য সত্যই যদি কোন দুষ্ট লোক সামনে আসে তাহা হইলেও মনে কর যে সে পরমাত্মা। দুষ্ট হইলেও সে সাধু হইয়া যাইবে। খামকা তবে এরূপ ভাবা কেন? আমি বলি, একথা কে জানে যে সে দুষ্ট? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "সজ্জনেরা নিজে ভাল তাই জগৎ দেখে ভাল। আসলে তা নয়।" এখানে জিজ্ঞাস্য, তোমার কাছে যেরূপ দেখায় তাহাই যে সত্য একথা কিরূপে মানিয়া লওয়া যায়? সৃষ্টির সম্যক্ জ্ঞান আহরণের উপকরণ যেন একমাত্র দুষ্টের হাতেই রহিয়াছে। একথাই বা কেন বলা হইবে না যে জগৎ ভাল, কিন্তু তুমি নিজে দুষ্ট, তাই তোমার কাছে জগৎ দুষ্ট দেখায়? আরে ভাই, সৃষ্টি ত দর্পণ। তুমি যেমন, সম্মুখের সৃষ্টিতে তেমনই তোমার প্রতিবিম্ব পড়িবে। যেমন দৃষ্টি তেমন সৃষ্টি। তাই ভাব, এই সৃষ্টি ভাল, এই জগৎ পবিত্র। সাধারণ কর্মেও এই ভাবের সঞ্চার কর। তখন দেখিবে রূপ কি চমৎকার।

"যা খাও, যা দেখ, যত কর হোম যাগতপ
যা কিছু কর কর্ম তা সব মোরে কর সমর্পণ।"

যাহা কিছু কর তাহা হুবহু ভগবানে অর্পণ করিয়া দাও।

আমার মা ছোটবেলায় একটি গল্প শুনাইতেন। গল্পটি মজার। কিন্তু তার তাৎপর্য অতি মূল্যবান। এক ছিল স্ত্রীলোক। যাহা কিছু করিবে তাহা কৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া দিবে ইহা সে নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সে করিত কি, না এঁটো নিকানোর পরে অবশিষ্ট গোবর তাল করিয়া নিক্ষেপ করিত আর বলিত—'কৃষ্ণার্পণমস্তু'। আর হইত কি—সে গোবর তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে উঠিয়া মন্দিরের মূর্তির মুখে গিয়া আটকাইয়া যাইত। মূর্তি ধুইয়া ধুইয়া পূজারী আর পারে না। কি করে? অবশেষে সে বুঝিতে পারিল যে, এই মহিমা হইতেছে ঐ স্ত্রীলোকের। স্ত্রীলোকটি যতদিন বাঁচিয়াছিল মূর্তি কখনও পরিষ্কার রাখা যায় নাই। স্ত্রীলোকটির অসুখ হইল। অন্তিম সময় উপস্থিত। মৃত্যুকেই সে কৃষ্ণার্পণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দেবালয়ের মূর্তি টুকরা টুকরা হইয়া গেল। চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। স্ত্রীলোকটিকে লইয়া যাওয়ার জন্য আকাশ হইতে বিমান আসিল। বিমানকেও সে কৃষ্ণার্পণ করিল। বিমান মন্দিরে গিয়া ধাক্কা খাইল, চুরমার হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের কাছে স্বর্গ ব্যর্থ।

তাৎপর্য, ভালমন্দ যে-কোন কর্ম আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে সে সব ঈশ্বরার্পণ করিয়া দিলে তাহাতে স্বতন্ত্র একরূপ সামর্থ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জোয়ারের দানা স্বভাবতই একটু পান্ডুবর্ণের, লাল রঙের। কিন্তু ভাজিলে তাহা হইতে কেমন সুন্দর খৈ হয়—সাদা, পরিষ্কার, আট-কোণা। ধোপ-দস্ত কাপড়ে সুদৃশ্য ঐ খৈ দানার পাশে রাখিয়া দেখ। কত ব্যবধান! কিন্তু ঐ দানারই যে সেই খৈ তাহাতে সংশয় নাই। এই ব্যবধানের মূলে একমাত্র অগ্নি। তদ্রূপ ঐ শক্ত দানা জাঁতায় পিষিলে, হইয়া যাইবে মসৃণ আটা। আগুনের সংস্পর্শে খৈ, জাঁতার চাপে মোলায়েম আটা। ঠিক তদ্রূপ আমাদের ক্ষুদ্র কর্মটিতে যদি হরিস্মরণরূপ সংস্কার করেন তবে তাহা অপূর্ব হইয়া যাইবে। ভাবনার কারণে মূল্য বাড়িয়া যায়। সাধারণ ঐ জবাফুল, ঐ বেলপাতা, ঐ তুলসীমঞ্জরী, ঐ দূর্বা—ইহাদের তুচ্ছ মনে করিও না :

"তুকা কহে স্বাদ পেয়েছে সে।
রামমিশ্রিত হয়ে গেছে যে॥"

প্রতিটি ব্যাপার ভগবানে মিলাইয়া দাও। আর তারপর অনুভব কর! রামরূপ এই সামগ্রীর মত আর কোন সামগ্রী আছে কি? এই দিব্য সামগ্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন্ সামগ্রী তুমি আনিবে? নিজের প্রতিটি কর্মে ঈশ্বররূপ মশলা মিলাইয়া দাও, দেখিবে সব কিছু সুন্দর ও রুচিকর হইয়া গিয়াছে।

রাত্রি আটটায় মন্দিরে যখন আরতি চলে, চারিদিক ধূপ-গন্ধে ভরিয়া যায়, দীপ জ্বলে, আরতি শেষ হইয়া আসে, তখন সত্য সত্যই মনে হয় আমরা পরমাত্মাকে দেখিতেছি। ভগবান দিবসভর জাগিয়াছিলেন, এখন তাঁর শয়নের সময় হইয়াছে। ভক্ত গাহে :

"সুখ নিদে এবে মগন হও গোপাল।"

কিন্তু সংশয়ী বলে, "রাখো, ভগবান কখনও নিদ্রা যান বুঝি?" আরে, কেন নয়? আচ্ছা লোক! ভগবান শোন না, জাগেন না, শোয় আর জাগে বুঝি ঐ পাথর? ভাই, ভগবানই শোন, ভগবানই জাগেন আর ভগবানই পান-আহার করেন। ভোরবেলা তুলসীদাস ভগবানকে জাগান, মিনতি করেন :

"জাগিয়ে রঘুনাথ কুঁঅর পংছী বন বোলে।"

নিজের ভাই-বোনদের, নর-নারীদের রামচন্দ্রের মূর্তি মনে করিয়া তিনি বলিতেছেন, "হে মোর রামচন্দ্র এবে ওঠ।" কিরূপ দিব্য ভাবনা! তদ্বিপরীত কোন বোর্ডিঙের কথা ধরুন। জাগানর সময়ে সেখানে তাড়নার স্বরে বলা হয়, "উঠবে, কি উঠবে না?" ভোরের মঙ্গল-বেলা। তখন রূঢ় কথা মানায় কি? রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আশ্রমে নিদ্রাগত। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে জাগাইতেছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে এই বর্ণনা আছে :

"রামেতি মধুরাং বাণী বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত।
উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে॥"

"বৎস রাম, এবার ওঠ।"—এমন মধুর সম্বোধনে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে জাগাইতেছেন। কত মাধুর্যে ভরা এই কর্ম। আর বোর্ডিঙের ঐ জাগানো কিদৃশ কর্কশ! বেচারা নিদ্রামগ্ন ছেলেদের মনে হয় জন্ম-জন্মান্তরের শত্রু যেন শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে মৃদু কণ্ঠে ডাক, পরে আর একটু জোরে। কিন্তু কঠোরতা, কর্কশতা যেন আদৌ না থাকে। ওঠে নাই, ত

দশ মিনিট পরে যাও। আজ ওঠে নাই, কাল উঠিবে এই ভরসা রাখ। ঘুম ভাঙানোর তান ধর, প্রভাতী গাও, স্তোত্র-শ্লোক আবৃত্তি কর। ঘুম ভাঙানো সাধারণ মামুলি কার্য। কিন্তু উহাকে আমরা কতই না কাব্যময়, প্রেমময় ও মাধুর্যপূর্ণ করিতে পারি। ধর, ভগবানকেই জাগাইতে হইবে। পরমেশ্বরের মূর্তিকেই আস্তে জাগাইতে হইবে। নিদ্রা হইতে জাগানো তাহাও এক শাস্ত্র।

সকল কর্মে সকল আচরণে এই ভাব আন। শিক্ষা-শাস্ত্রে এই ভাব ত আনা চাই-ই। বালক, সে ত প্রভু-মূর্তি। আমি দেবতার পূজা করিতেছি, গুরুর এই মনোভাব থাকা চাই। সেই স্থলে, "ঘরে চলে যা, দাঁড়িয়ে থাক ঘণ্টাভর, হাত লম্বা কর, আঃ কাপড় কি ময়লা, নাকে কত শিকনি"—এরূপ কথা তাঁহার মুখে আসিবে না, ভ্রূ কুঞ্চিত হইবে না। স্নেহ-কোমল হাতে তিনি তখন নাক পরিষ্কার করিয়া দিবেন, ময়লা কাপড় কাচিয়া দিবেন, ছেঁড়া সেলাই করিয়া দিবেন। শিক্ষক যদি তাহা করেন তবে অতি উত্তম ফললাভ হইবে। মার-ধর করিয়া কি ফল পাওয়া যায়? বালকেরও কর্তব্য অনুরূপ দিব্য ভাবনা হইতে গুরুকে দেখা। গুরু মনে করিবেন বালক হরিমূর্তি, আর বালক মনে করিবে গুরু হরিমূর্তি। এই ভাবনা হইতে পরস্পরের প্রতি আচরণ করিলে বিদ্যা তেজস্বী হইবে। বালকও ভগবান আর গুরুও ভগবান! গুরু নয় ত সাক্ষাৎ শঙ্করের মূর্তি, আমরা তাঁহার কাছ হইতে জ্ঞানামৃত পান করিতেছি, তাঁহার সেবা করিয়া জ্ঞান আহরণ করিতেছি, এই ভাব যদি বালকদের হয়, বল তাহা হইলে গুরুর প্রতি তাহাদের আচরণ কিরূপ হইবে?

(৪৭)

হরি সর্বত্র বিরাজমান এই ভাব যদি অন্তরে জন্মে, চিত্তে নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে পরস্পরের প্রতি আমাদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত, এই নীতিজ্ঞান স্বতঃই আমাদের অন্তঃকরণে স্ফূর্ত হইবে। শাস্ত্র অধ্যয়নের দরকারই থাকিবে না। তখন দোষ দূর হইয়া যাইবে। পাপ পলায়ন করিবে। দুরিতের অন্ধকার বিনষ্ট হইবে। তুকারাম বলেন :

"মুক্ত, নাহি বন্ধন। লে হরিনাম হরদম॥
ছোঁবে নাক পাপ। নিতে নাম হরি পাবে পাশ॥"

চল, তুমি মুক্ত। যত খুশি পাপ কর। পাপ করিতে করিতে তুমি হয়রান হও, কি পাপ মোচন করিতে করিতে হরি হয়রান হন তাহা আমি দেখিব। এমন দুরন্ত উদ্দাম পাপ কি থাকিতে পারে যাহা হরিনামের সামনে তিষ্ঠিবে? "যত ইচ্ছে পাপ কর।" যত পার পাপ কর। ঢালা অনুমতি পাইলে। চলুক হরিনামে আর তোমার পাপে কুস্তি! আরে, এই নামে কেবল এই জন্মেরই নহে, অনন্ত জন্মের পাপ মুহূর্তে নাশ করার শক্তি রহিয়াছে। অনন্ত যুগের অন্ধকার গুহায় জমিয়া থাকে। একটি কাঠি ধরাও, অমনি অন্ধকার অদৃশ্য। ঐ অন্ধকারই আলো হইয়া যায়। পাপ যত পুরাতন তত সহজে তাহা নষ্ট হয়; কারণ মরিবার জন্যই পাপের উৎপত্তি। পুরাতন লাকড়ি দেখিতে দেখিতে ছাই হইয়া যায়!

পাপ রামনামের কাছে তিষ্ঠিতে পারে না। ছোটরা বলে না কি, "ভূত ভাগে রামনামে।" ছোটবেলা আমরা রাত্রে শ্মশান ঘুরিয়া আসিতাম। বাজি রাখিয়া শ্মশানে খোঁটা পুঁতিতাম। রাত্রিকাল। চারিদিক অন্ধকার। সাপে কাটার ও কাঁটা ফোটার ভয় ত ছিলই। তবুও মনে কিছু হইত না। ভূতের সাক্ষাৎ কখনও মিলে নাই। ভূত ত কল্পনার সৃষ্টি। দেখা যাইবে কোথা হইতে? একটি দশ বৎসরের বালকের রাত্রিকালে একাকী শ্মশানে যাইয়া ফিরিয়া আসার সামর্থ্য কোথা হইতে আসিত? আসিত রামনাম হইতে। তাহা ছিল সত্যরূপ পরমাত্মার সামর্থ্য। হরি পাশে রহিয়াছেন এই ভাব অন্তরে থাকিলে সমস্ত জগৎ উল্টিয়া গেলেও হরির দাস ভীত হয় না। তাহাকে খাইবে এমন রাক্ষস কোথায়? রাক্ষসে তাহার দেহ খাইতে পারে, পরিপাক করিতে পারে। কিন্তু সত্য হজম করার শক্তি তার নাই। সত্য পরিপাক করিতে পারে এমন শক্তি জগতে নাই। ঈশ্বরের নামের সামনে পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। তাই ঈশ্বরে মন বসাও। তাঁর কৃপা লাভ কর। সর্ব কর্ম তাঁকে অর্পণ করিয়া দাও। তাঁরই হইয়া যাও। সকল কর্মের নৈবেদ্য প্রভুকে অর্পণ করা চাই—এই ভাব উত্তরোত্তর তীব্র করিয়া চল ত ক্ষুদ্র জীবন দিব্য হইবে, মলিন জীবন সুন্দর হইবে।

(৪৮)

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্" যাহাই হোক না। তার সঙ্গে ভক্তি মিলে ত পূর্ণ ষোল আনা। কতটা দিলে, কতটা চড়াইলে তাহা বিচার্য নহে। বিচার্য, কি ভাব হইতে দিলে। একবার কোন অধ্যাপকের সহিত আমার আলোচনা চলিতেছিল। শিক্ষা ছিল আলোচনার বিষয়। আমাদের দুই জনের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য ছিল। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক বলিলেন, "ভাই, আঠার বছর আমি এই কাজ করছি।" যুক্তিতে আমাকে খণ্ডন করা ছিল অধ্যাপকের কর্তব্য। তাহা না করিয়া তিনি বলিলেন, আমি এত বৎসর শিক্ষকতা করিতেছি। পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে আমি বলিয়াছিলাম, "কোন বলদ আঠার বছর যন্ত্রের সঙ্গে চলেছে বলেই সে যন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ হয়ে গেছে, একথা কি বলা চলে?" যন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ এক, ঘানির চারিদিকে পরিক্রমাকারী বলদ আর এক। শিক্ষাশাস্ত্রী এক, শিক্ষার ভারবাহী আর এক। শিক্ষা-শাস্ত্রী ছয় মাসে এরূপ জ্ঞান আহরণ করিয়া লইবে যাহা মোটবাহী মজুরের মগজে আঠার বৎসরেও দাগ কাটিবে না। তাৎপর্য, অধ্যাপক বড়াই করিয়া বলিলেন, আমি অত বছর কাজ করিয়াছি। কিন্তু বড়াইয়ে সত্য প্রমাণিত হয় না। তদ্রূপ, পরমেশ্বরের সম্মুখে কত বড় স্তূপ লাগানো হইয়াছে গুরুত্ব তার নয়। মূল্য নামের, আকারের নহে। মূল্য ভাবনার। কতটা অর্পণ করিলে তাহা বিচার্য নহে, বিচার্য কি ভাব হইতে করিলে তাহা। গীতায় সাত শত শ্লোক আছে। এমন বহিও আছে যাহাতে দশ হাজার শ্লোক রহিয়াছে। বস্তু বড় হইলেই যে তার কার্যকারিতা বেশী তাহা নয়। বিচার্য, বস্তুতে কতটা তেজ, কতটা সামর্থ্য আছে। জীবনে কত কর্ম করা হইয়াছে গুরুত্ব তার নয়। কিন্তু ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি হইতে যদি একটি কর্মও করা হয় তবে সেই এক ক্রিয়া হইতেই পূর্ণ উপলব্ধি লাভ হয়। সময়বিশেষে—কোন এক পবিত্র মুহূর্তে এত অনুভূতি আমাদের হয় যে বার বৎসরেও তাহা মিলিবার নহে।

তাৎপর্য, জীবনের সাধারণ কর্ম, সাধারণ ক্রিয়া পরমেশ্বরকে অর্পণ করিয়া দাও। তাহা হইতে জীবনে সামর্থ্য আসিবে। মোক্ষ হাতের মুষ্টিতে আসিবে। কর্ম ত করিবেই আর তার ফল ত্যাগ না করিয়া ঈশ্বরে

অর্পণ করিবে, এই হইতেছে রাজযোগ। এই রাজযোগ কর্মযোগ অপেক্ষা এক পা অধিক আগাইয়া গিয়াছে। কর্মযোগের কথা, "কর্ম কর ও ফল ত্যাগ কর। ফলের আশা রেখো না।" এখানে কর্মযোগের শেষ। রাজযোগ বলে, "কর্মের ফল ছেড়ো না। সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর। তা ফুল, তা তোমাকে অগ্রসর করে দেওয়ার উপকরণ। তা ঐ মূর্তির মাথায় চড়াও।" একদিক হইতে কর্ম, অন্যদিক হইতে ভক্তি, এই দুইয়ের মিলন ঘটাইয়া জীবন সুন্দর করিতে থাক। ফল ত্যাগ করিও না। ফল ফেলিয়া দেওয়ার নহে, ফল ঈশ্বরে যুক্ত করিয়া দেওয়ার। কর্মযোগে ফেলিয়া দেওয়া ফল রাজযোগে জুড়িয়া দেওয়া হয়। বোনার মধ্যে আর ছড়াইয়া ফেলার মধ্যে পার্থক্য আছে। যাহা বপন করা হয় তাহা তুচ্ছ হইলেও বাড়িয়া অনন্তগুণ ফল দান করে। ছিটাইয়া ফেলিলে যেখানে পড়ে সেখানেই নষ্ট হইয়া যায়। ঈশ্বরে যাহা অর্পণ করিবে তাহা বপন করিবে। তার ফলে জীবন অনন্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিবে, জীবনে অপার পবিত্রতা আসিবে।

রবিবার, ১৭-৪-৩২

দশম অধ্যায়

(৪৯)

বন্ধুগণ,

গীতার পূর্বার্ধ শেষ হইয়াছে। উত্তরার্ধে প্রবেশ করিব। তার আগে সমাপ্ত ভাগের সার সংক্ষেপে দেখিয়া লওয়া ভাল। মোহনাশ ও স্বধর্মে প্রবৃত্ত করার জন্য যে গীতার অবতারণা তাহা প্রথম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। কর্মযোগ ও স্থিতপ্রজ্ঞ, জীবনের এই দুই সিদ্ধান্তের দর্শন আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাইয়াছি। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম, বিকর্ম ও অকর্মের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কর্ম মানে স্বধর্মের আচরণ করা। স্বধর্মাচরণের বাহ্য কর্ম চলিতে থাকার কালে তার সহায়তার জন্য মানসিক যে কর্ম করা যায় তাহা বিকর্ম। কর্ম ও বিকর্ম একরূপ হইয়া যখন চিত্ত পূর্ণ শুদ্ধ হয়, সকল ময়লা ধুইয়া যায়, বাসনা ক্ষীণ হয়, বিকার শান্ত হয়, ভেদ-ভাব মিটিয়া যায়, ত সে অবস্থাকে অকর্ম অবস্থা বলে। এই অকর্ম অবস্থা আবার দুই প্রকারের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দিনরাত কাজ করিয়াও যেন লেশমাত্র কর্ম করিতেছি না এরূপ মনে হওয়া অকর্মের একরূপ। তার বিপরীত রূপ হইতেছে কিছু না করিয়াও অব্যাহত কর্ম করিয়া যাওয়া। এভাবে অকর্মদশা দুই প্রকারে পরিপূর্ণ হয়। এই দুই রূপ দেখিতে পৃথক মনে হইলেও তাহারা সম্পূর্ণ একরূপ। কর্মযোগ ও সন্ন্যাসরূপ পৃথক নামকরণ করা হইলেও, ভিতরের বস্তু দুইয়েরই এক। অকর্মদশা অন্তিমের অন্তিম সাধ্য। এ স্থিতিকে মোক্ষ বলা হইয়াছে। অতএব গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে জীবনের সমগ্র শাস্ত্রার্থ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ইহার পরে অকর্মরূপ সাধ্য সিদ্ধির জন্য বিকর্মের যে নানা মার্গ রহিয়াছে, মনকে ভিতর হইতে শুদ্ধ করার যে নানা সাধন রহিয়াছে, তার মধ্যে যেগুলি মুখ্য তার বর্ণনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আরম্ভ হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে চিত্তের একাগ্রতার জন্য ধ্যানযোগের কথা বলিয়া উহার সহিত অভ্যাস ও বৈরাগ্য জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে বিশাল ভক্তিরূপ উচ্চ সাধনের কথা বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের কাছে প্রেমভাব হইতেই

যাও, জিজ্ঞাসু বুদ্ধি হইতেই যাও, বিশ্বকল্যাণের ব্যাকুলতা হইতেই যাও অথবা ব্যক্তিগত কামনা লইয়াই যাও, যে কোন ভাবেই হোক, একবার তাঁর দরবারে ত যাও। এ অধ্যায়ের এ বিষয়ের নাম দিয়াছি আমি 'প্রপত্তি-যোগ' অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণ লওয়ার প্রেরণাদায়ী যোগ। সপ্তমে 'প্রপত্তি-যোগের' কথা বলিয়া অষ্টমে 'সাতত্য-যোগের' কথা বলা হইয়াছে। এই যে নামকরণ করিয়াছি তাহা কোন পুস্তকে আপনারা পাইবেন না। আমি আমার উপযোগী নাম দিতেছি। সাতত্য-যোগ মানে অন্তিম দিন পর্যন্ত নিজ সাধনা সতত চালু রাখা। যে রাস্তায় একবার পা বাড়ান গিয়াছে তাহা ধরিয়া সতত আগাইয়া যাইতে হইবে। এক দিন করিলাম, এক দিন করিলাম না এভাবে চলিলে গন্তব্যে পোঁছার আশা আদৌ থাকে না। আর কতকাল সাধনা করিব এরূপ নিরাশ বা ক্লান্ত হইলে কাজ হয় না। যতদিন ফল না মিলিবে ততদিন সাধনা করিয়া যাওয়া চাই।

এই সাতত্য-যোগের কথা বলার পরে নবম অধ্যায়ে ভগবান একটি অতি সাধারণ কথা বলিয়াছেন। কথাটি সহজ কিন্তু জীবনের সমগ্র রং পরিবর্তন-কারী। রাজযোগ হইতেছে সেকথা। অনুক্ষণ যে সকল কর্ম হইতেছে তাহা সবই ঈশ্বরার্পণ কর, নবম অধ্যায় একথা বলিতেছে। এই এক কথায় সব শাস্ত্র-সাধন, সকল কর্ম-বিকর্ম ডুবিয়া গিয়াছে। সর্ব কর্ম-সাধনা এই সমর্পণযোগে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সমর্পণযোগ মানে রাজযোগ। এখানে সমস্ত সাধন নিঃশেষ হইয়াছে। এই যে ব্যাপক ও সমর্থ ঈশ্বরার্পণ করার কথা, দেখিতে ত তাহা সহজ ও সাধারণ কিন্তু হইয়া উঠিয়াছে কঠিন। গাঁয়ের নেহাত অজ্ঞ লোক হইতে মহা বিদ্বান্ ব্যক্তি পর্যন্ত যে কেহ নিজ ঘরে বসিয়া বিশেষ আয়াস ব্যতিরেকে এই সাধনা করিতে পারে। তাই ইহা সহজ। কিন্তু সহজ হইলেও এই সাধনার জন্য মহা পুণ্যের দরকার।

না করলে অশেষ সুকৃতি। বিঠ্ঠলে কভু হয় না সুমতি।

অনন্ত জন্মের পুণ্য সঞ্চিত হইলেই না ঈশ্বরে রুচি জন্মে। কিছু একটু হইলে চোখ হইতে দরদর ধারা বহে। কিন্তু ভগবানের নাম নিতে ত চক্ষু কোণে দুই বিন্দু জল কখনও দেখা দেয় না। ইহার উপায় কি? সাধুদের কথানুসারে এক দিক হইতে এই সাধনা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু অন্যদিক

হইতে তাহা কঠিনই বটে। আর বর্তমান কালে ত আরও অধিক কঠিন হইয়া গিয়াছে।

আজ ত জড়বাদের পর্দায় আমাদের চোখ আচ্ছন্ন। ঈশ্বর আছে কি? একথাও আজ বলা হয়। কোথাও কাহারও কাছে সে প্রতীতই হয় না। সারা জীবন বিকারময়, বিষয়লোলুপ ও বিষমতায় ভরিয়া উঠিতেছে। কি করিলে সকলে ভর-পেট খাইতে পাইবে আজ এই মাত্র এক চিন্তা। উচ্চাতিউচ্চ চিন্তাশীল তত্ত্বজ্ঞানীদেরও চিন্তা ইহার অধিক অগ্রসর হয় না। দোষও তাহাদের নাই। কারণ অনেক খাইতেই পায় না, ইহাই আজিকার স্থিতি। ভাতের কথাই আজিকার বড় সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করিতে আজ সকল বুদ্ধি হয়রান। সায়ণাচার্য এভাবে রুদ্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

"বুভুক্ষমাণঃ রুদ্ররূপেণ অবতিষ্ঠতে"

অন্নহীন মানুষ রুদ্রের অবতার। তাহাদের ক্ষুধাশান্তির নিমিত্ত নানা তত্ত্বজ্ঞানের, নানা বাদের, নানা রাজকারণের উদ্ভব হইয়াছে। এ প্রশ্ন হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জো আজ নাই। ঝগড়া-ফ্যাসাদ না করিয়া খুশিমনে কিরূপে পেটের ক্ষুধা মিটান যায় এই দিকেই আজ আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিঃশেষ হইতেছে। এমনই অদ্ভুত আজিকার সমাজ ব্যবস্থা। এমতাবস্থায় ঈশ্বরার্পণের মত সহজ সরল কথাও যদি কঠিন মনে হয় ত আশ্চর্যের কি? ঈশ্বরার্পণ-যোগ কিভাবে আয়ত্ত করা যায়, সহজ করা যায়, সেই কথাই দশম অধ্যায়ে আজ আপনাদের বলিব।

(৫০)

ছোট শিশুদের লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা হয়? পরমাত্মাকে সর্বত্র দর্শন করার জন্য সেই উপায়ের কথাই এ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। শিশুদের দুই ভাবে অক্ষর শিখান হয়। প্রথমে অক্ষরগুলি বড় বড় করিয়া লিখিয়া দেখান হয়। পরে ঐ বড় অক্ষরই ছোট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয়। সেই 'ক', সেই 'গ'। পূর্বে ছিল বড়, এখন হইয়াছে ছোট। এই হইতেছে এক পদ্ধতি। দ্বিতীয় রীতিতে প্রথমে সাদাসিধা অক্ষর শিখান হয় আর জটিল যুক্তাক্ষর শিখান হয় পরে। পরমেশ্বরকে

হুবহু তেমন দেখিতে শেখা চাই। প্রথমে স্থূল পরমেশ্বরকে দেখুন। সমুদ্র, পর্বত ইত্যাদি মহান্ বিভূতিতে প্রকাশ পরমেশ্বর ঝট্ করিয়া চক্ষু আকর্ষণ করিয়া লয়। এই স্থূল পরমেশ্বর অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে ত জল-বিন্দুতে, মাটির কণাতেও যে সে আছে সেকথা পরে বুঝা যাইবে। বড় 'ক' আর ছোট 'ক' এ দুইয়ে কোন পার্থক্য নাই। যে স্থূলে, সেই সূক্ষ্মে। এই এক পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে অ-জটিল সোজা-সহজ পরমেশ্বরকে আগে দেখিয়া লও, তারপরে দেখ তাঁর জটিল রূপ। কোন ব্যক্তিতে স্বতঃব্যক্ত শুদ্ধ ঈশ্বরীয় আবির্ভাব হইলে তাহা মনে ঝট্ করিয়া রেখা পাত করে, যেমন রামে ব্যক্ত ঈশ্বরীয় আবির্ভাব ঝট্ করিয়া মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। রাম হইতেছে সরল অক্ষর। বিনা ঝঞ্ঝাটের পরমেশ্বর। কিন্তু রাবণ? সংযুক্তাক্ষর। তাহার কিছু-না-কিছু মিশ্রণ আছে। রাবণের তপস্যা মহান. কর্মশক্তি প্রচণ্ড। কিন্তু তাহাতে ক্রূরতা মিশ্রিত। প্রথমে রাম এই সরল অক্ষর শেখ। যাহাতে দয়া আছে, বৎসলতা আছে, প্রেম আছে এইরূপ যে রাম তিনি হইতেছেন সরল পরমেশ্বর। পট্ করিয়া তাঁকে ধরা যায়। রাবণে যে পরমেশ্বর বর্তমান তাঁকে বুঝিতে একটু সময় লাগিবে। প্রথমে সরল অক্ষর, পরে যুক্তাক্ষর। প্রথমে সজ্জনে পরমাত্মাকে দেখিয়া শেষে দুর্জনেও তাঁকে দেখার অভ্যাস করা চাই। সমুদ্রস্থিত বিশাল পরমেশ্বরই জলের ঐ বিন্দুতে রহিয়াছেন। রামচন্দ্রের হৃদয়স্থিত পরমেশ্বরই রাবণে বিদ্যমান। স্থূলে যিনি সূক্ষ্মেও তিনি, সহজে যিনি কঠিনেও তিনি। এই দুইভাবে জগৎগ্রন্থ আমাদের পাঠ করিতে শেখা চাই।

এই অপার সৃষ্টি যেন ঈশ্বরের পুস্তক। চোখে ভারি পর্দা পড়িয়াছে বলিয়া এই পুস্তক আমাদের কাছে বন্ধ মনে হয়। এই সৃষ্টিরূপ বহিতে সুন্দর অক্ষরে সর্বত্র পরমেশ্বরের লেখা রহিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই না। ঈশ্বরের দর্শন লাভের পক্ষে এক বড় বিঘ্ন আছে। তাহা এই, সহজ-সরল নিকটের ঈশ্বরস্বরূপ মানুষ অন্তরে ঠাঁই পায় না, আর দূরের প্রখর রূপ হজম হয় না। মায়ে ঈশ্বর দেখ বলিয়াছ ত সে বলিবে ঈশ্বর কি এতই সহজ, এতই সুলভ? কিন্তু প্রখর পরমাত্মা যদি প্রকাশ হন ত তোমার কি তাহা সহিবে? কুন্তীর মনে হইয়াছিল দূরের

সূর্য নিকটে আসিয়া মিলুক। কিন্তু নিকটে আসিতে থাকিলেই সে জ্বলিতে লাগিল। সহ্য হইল না। সকল ঐশ্বর্য লইয়া যদি ঈশ্বর আসিয়া দাঁড়ান ত হজম করা যাইবে না। মায়ের সৌম্যরূপে আসিলে মনে স্থান পান না। পেড়া-সন্দেশ পচে না, সুলভ দুধ রোচে না। ইহা দুর্ভাগ্যের কথা, মরণের লক্ষণ। এই রুগ্ন মনঃস্থিতি পরমেশ্বরের দর্শনের পক্ষে মহা বিঘ্ন। এই মনঃস্থিতি দূর করা চাই। আগে নিকটের স্থূল ও সহজ পরমাত্মাকে পড়িয়া লও, পরে সূক্ষ্ম ও জটিল পরমাত্মাকে পড়িবে।

(৫১)

আমাদের নিকটতম মা হইতেছেন আমাদের সর্বপ্রথম পরমেশ্বরের মূর্তি। শ্রুতি বলেন, "মাতৃদেবো ভব।" জন্মিবামাত্র মা ছাড়া শিশু আর কাহাকে দেখে? বাৎসল্যরূপে সেই পরমেশ্বরের মূর্তিই সেখানে দাঁড়ান। ঐ মাতারই ব্যাপ্তি আমরা বাড়াইয়া লই আর 'বন্দে মাতরম' বলিয়া দেশমাতার ও পরে অখিল ভূ-মাতা পৃথিবীর পূজা করি। কিন্তু প্রারম্ভে পরমেশ্বরের সর্বোচ্চ যে মূর্তি প্রথমে শিশুর সামনে আসে সে হইতেছে মায়ের মূর্তি। মায়ের পূজা দ্বারা মোক্ষলাভ অসম্ভব নহে। মায়ের পূজা মানে বাৎসল্যরূপে দণ্ডায়মান পরমেশ্বরের পূজা। মা নিমিত্ত মাত্র! আপন বাৎসল্য উহাতে ঢালিয়া দিয়া পরমেশ্বর তাঁকে নাচান। ভিতরে কেন যে এত মায়া সে অনুভব করে একথা বেচারা ভাবিয়া পায় না। বুড়া হইলে কাজে লাগিবে এই হিসাব করিয়া কি সে শিশুর লালন-পালন করে? রাম! ঐ সন্তান সে জন্ম দিয়াছে। প্রসব বেদনা সে ভুগিয়াছে। সেই বেদনা তাকে শিশুর জন্য পাগল বানায়। বৎসল বানায়। ভাল না বাসিয়া তার উপায় নাই। সে নাচার। মা মানে অপরিসীম সেবামূর্তি। মাতৃপূজা পরমেশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট পূজা। 'মা' এ নামেই ঈশ্বরকে ডাক। মা অপেক্ষা অধিক উচ্চ শব্দ কিছু আছে কি? 'মা'-ই প্রথম স্থূল অক্ষর। তাঁহাতে ঈশ্বর দেখিতে শেখ। পরে, পিতা, গুরু এঁদের মধ্যেও দেখ। গুরু শিক্ষা দেন। পশু হইতে আমাদের মানুষ বানান। অপার তাঁর অনুগ্রহ! প্রথমে মাতা, তারপরে পিতা, গুরু, দয়ালু সাধু-সন্ত। অতীব স্থূলরূপে বিদ্যমান

এই পরমেশ্বরকে আগে দেখ। এতে যদি পরমেশ্বর না দেখিবে ত দেখিবে কোথায়?

মা, বাপ, গুরু, সাধু এ'দের মধ্যে পরমেশ্বরকে দেখ। তদ্রূপ ছোট বালকদের মধ্যেও যদি পরমাত্মাকে দেখিতে পাই ত কী চমৎকার! ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নচিকেতা, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার—এরা সকলেই ছোট বালক ছিল। বালক হইলেও, তাহাদের যে কোথায় রাখিবেন, কি করিবেন তাহা পুরাণ-কারগণ ও ব্যাসাদি ঠিক করিয়া ধরিতে পারেন নাই। শুকদেব ও শংকরাচার্য বাল্যকাল হইতেই বিরক্ত ছিলেন। জ্ঞানদেবও ছিলেন তাহাই। সকলেই বালক। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পরমেশ্বর যতটা শুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অন্য কোথাও ততটা শুদ্ধরূপে প্রকাশ হন নাই। খৃস্ট বালকদের খুব ভালবাসিতেন। এক সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি যখন-তখন ভগবানের রাজ্যের কথা বলেন। ভাল, ভগবানের ঐ রাজ্যে যেতে অধিকারী কে?" পাশেই ছিল এক শিশু। খৃস্ট তাহাকে টেবিলের উপর দাঁড় করিয়া দিয়া বলিলেন, "যারা এ শিশুর মত তারাই তথায় যেতে পারবে।" খৃস্টের কথা পুরা সত্য। একদিন দেখা গেল রামদাসস্বামী বালকদের সঙ্গে খেলিতেছেন। ইহাতে বড়দের, বুড়োদের কেহ কেহ আশ্চর্য বোধ করিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "এ কী করছেন আপনি আজ?" সমর্থ বলিলেন :

"রহে যে কনিষ্ঠ, হয় সে জ্যেষ্ঠ
রহে যে জ্যেষ্ঠ হয় সে চোর-শ্রেষ্ঠ।"

বয়স বাড়ে, শিং গজায়। তখন আর ঈশ্বরের কথা মনে ঠাঁই পায় না। শিশু-দের মনে কোন ছোপ নাই। বুদ্ধি তাদের নির্মল। শিশুদের আমরা বলি, "মিথ্যা বলো না।" সে জিজ্ঞাসা করে, "মিথ্যা কাকে বলে," তখন নীতির কথা বলা হয়, "কথা যেমন তেমনই বলা চাই।" বালক ধাঁধায় পড়ে। যাহা যেমন তাহা তেমন বলা ছাড়া বলার অন্য রীত আছে কি? যাহা নাই তাহা বলে কিভাবে? চৌকোণকে চৌকোণ বলিবে, গোল বলিবে না—এ যেন তাই। বালকের আশ্চর্য লাগে। শিশু, সে ত শুদ্ধ পরমাত্মার মূর্তি। বয়স্কেরা তাদের ভুল শিক্ষা দেয়। সারাংশ, মা, বাপ, গুরু, সাধু, শিশু এদের মধ্যে

যদি পরমেশ্বর না দেখিতে পাই ত তাঁকে দেখিতে পাইব কোন রূপে? ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রূপ পরমেশ্বরের আর নাই। পরমেশ্বরের এই সহজ সৌম্যরূপ আগে জান। এদের মধ্যে পরমেশ্বর বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছেন॥

(৫২)

প্রথমে মানবের সৌম্য ও পাবন মূর্তিতে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে শেখ। তদ্রূপ এই সৃষ্টিতে যে সকল বিশাল ও মনোহর রূপ আছে তাহাতেও তাঁকে প্রথমে দেখিতে শেখ।

ঐ উষা। সূর্যোদয়ের পূর্বেকার ঐ দিব্য প্রভা। এই উষা-দেবতার গান গাইতে গাইতে ঋষি নাচিতে থাকেন। "হে উষে, তুই পরমেশ্বরের সন্দেশ বহনকারিণী দিব্য দ্যুতিকা, হিমকণায় স্নান করে তুই এসেছিস্, অমৃতের তুই পতাকা।" ঋষিরা উষার এরূপ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করিয়াছেন। বৈদিক ঋষি বলেন, "পরমেশ্বরের সন্দেশ বাহিকা, তোকে দেখে যদি ঈশ্বরের রূপ আমার মনে ভেসে না ওঠে, তাঁকে যদি না বুঝি তবে পরমেশ্বরের পরিচয় আমায় আর কে দেবে?" এমন দিব্য রূপে সজ্জিত হইয়া উষা ওখানে দণ্ডায়মানা, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি ওদিকে যায় তবে না?

তদ্রূপ ঐ সূর্য দেখ। তার দর্শন নয় ত পরমাত্মার দর্শন। আকাশে সে নানা রঙবেরঙ-এর চিত্র আঁকে। চিত্রকার খুব মিহি তুলি বুলাইয়া সূর্যোদয়ের চিত্র বানায়, রঙ ধরায়। কিন্তু প্রভাতে উঠিয়া পরমেশ্বরের ঐ কলা একবার দেখ ত। ঐ দিব্য কলার, অনন্ত সৌন্দর্যের উপমা দেওয়া যাইবে কি? কিন্তু দেখে কে? ওদিকে সুন্দর ভগবান খাড়া, আর এদিকে গায়ে লেপটা আরও একটু জড়াইয়া আমরা ঘুমাই। সূর্য বলে, "ওরে, আসলে তুই ত ঘুমোবি, কিন্তু আমি তোকে জাগাব।" এই বলিয়া নিজ জীবনদায়ী কিরণ জানালা দিয়া পাঠাইয়া ঐ আলসেকে জাগাইয়া দেয়।

"সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"

সূর্য স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা। চরাচরের আধার। ঋষিরা তাকে 'মিত্র' নাম দিয়াছেন।

"মিত্রো জনান্ যাতযাতি ব্রুবাণো
মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্।"

এ মিত্র মানুষকে ডাকে, তাদের কাজে লাগায়। স্বর্গ ও পৃথিবীকে সে ধারণ করে আছে। ঐ সূর্য সত্যসত্যই জীবনের আধার। তাহাতে পরমাত্মা দর্শন কর।"

অর ঐ পাবন গঙ্গা! কাশীতে যখন ছিলাম, গঙ্গার তীরে গিয়া বসিতাম। রাত্রের নীরবতায় যাইতাম। কেমন সুন্দর ও নির্মল ঐ প্রবাহ। ঐ দিব্য গম্ভীর প্রবাহ আর তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত অনন্ত তারকা। আমি নির্বাক হইয়া যাইতাম। শঙ্করের জটাজুট হইতে অর্থাৎ হিমালয় হইতে বহমানা গঙ্গা, রাজপাট তৃণের মত নিক্ষেপ করিয়া রাজারা যাহার তীরে তপশ্চর্যার জন্য আসিত সেই গঙ্গা দেখিয়া আমি মনে অসীম শান্তি পাইতাম। সেই শান্তির বর্ণনা আমি কিরূপে করিব? ভাষা সেখানে পরাস্ত। মরিয়া গেলে অস্থি গঙ্গায় যেন বিসর্জন করা হয় এ বাসনা হিন্দু মাত্রেই কেন যে করে সে কথা আমি বুঝিতে পাই। হাসিবেন। হাসুন। তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমার কাছে এই ভাবনা একান্ত পবিত্র, সঞ্চয় করিয়া রাখার মত। মরণ-কালে মুখে দুই ফোঁটা গঙ্গাজল দেয়। দুই ফোঁটা গঙ্গাজল নয়, স্বয়ং পরমেশ্বর মুখে অবতীর্ণ হন। ঐ গঙ্গা, গঙ্গা নহে, পরমাত্মা। সে পর-মেশ্বরের করুণা বহন করিয়া আনিতেছে। তোমার অন্তর্বাহ্য সমস্ত ধুলো-ময়লা গঙ্গা মা ধুইয়া চলিয়াছে। গঙ্গা-মাতায় যদি পরমেশ্বরের প্রকাশ না দেখি ত দেখিব কোথায়? সূর্য, নদী, ধু-ধু করিয়া উছলিয়া পড়া এ বিশাল সমুদ্র—এসব পরমেশ্বরেরই মূর্তি।

আর ঐ হাওয়া! কোথা হইতে আসে, কোথা যায় তার ঠিক-ঠিকানা নাই। হাওয়া ভগবানের দূত। ভারতবর্ষে কিছু হাওয়া আসে স্থির হিমাচল হইতে, আর কিছু আসে গম্ভীর সাগর হইতে। এই পবিত্র হাওয়া আমাদের বুক স্পর্শ করে। আমাদের জাগ্রত করে। কিন্তু এই হাওয়া যে সন্দেশ বহন করে তাহা শোনে কে? চারি-ছত্রে লেখা পত্র জেলর যদি আমাদের না দেয় ত আমাদের বিরক্তির অবধি থাকে না। আরে, অভাগা, আছে কি সেই চিঠিতে? পরমেশ্বরের এই যে প্রেম বার্তা হাওয়া প্রতি মুহূর্তে বহিয়া আনিতেছে তাহা শোন।

আর ধরুন আমাদের নিত্য কাজের পশুর কথা। গাভী। কেমন বৎসল, কত তার মমতা, কত তার প্রেম। বন-জঙ্গল হইতে বাছুরের জন্য দুই-তিন মাইল সে ছুটিয়া আসে। পাহাড়-পর্বত হইতে কল-কল করিয়া বহমানা নদী দেখিয়া বৈদিক ঋষিদের মনে পড়ে দুধ-ভরা স্তন লইয়া হাম্বা রবে বাছুরের জন্য ধাবমানা গাভীর কথা। নদীকে সম্বোধন করিয়া ঋষি বলেন, "হে দেবী, দুধের মত পবিত্র পাবন মধুর জল তুমি বয়ে আন। তুমি ধেনু-সদৃশ। গাভী বনে থাকতে পারে না। তেমনি নদী তোমরাও পাহাড়ে থাকতে পার না। উছলে পড়ে পিপাসায় কাতর বালকদের কাছে দৌড়ে আস।"

"বাশ্রা ইব ধেনব : স্যংদমানাঃ"

বৎসল গাভীরূপে ভগবান দরজায় খাড়া।

আর ঐ ঘোড়া। কেমন সুন্দর, বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত। ঘোড়া আরবের লোকদের কাছে কতই না প্রিয়। সেই আরবের গল্প তোমাদের জানা নাই কি? বিপদে পড়িয়া ঐ আরব ক্রেতার কাছে ঘোড়া বেচিতে যাইতেছে। হাতে মোহরের থলি। আস্তাবলে সে গিয়াছে। তাহার নজর পড়িল ঘোড়ার গম্ভীর, প্রেমভরা চোখের উপর। সঙ্গে সঙ্গে টাকার থলি ফেলিয়া দিয়া সে বলিল, "জীবন যায় যাবে। ঘোড়া বেচব না। যা হয় হোক। আহার না মেলে ক্ষতি নেই। দেখবেন খোদা।" পিঠে থাবড় মারিয়াছ ত সে প্রেমে অধীর হয়, পুলকিত হয়। কেমন সুন্দর তার কেশর! ঘোড়াতে সত্য-সত্যই অমূল্য গুণ রহিয়াছে। ঐ সাইকেলে কি আছে? দলাই-মলাই কর ত ঘোড়া তোমার জন্য জান দিবে। তোমার সাথী হইয়া যাইবে! আমার এক বন্ধু ঘোড়ায় চড়া শিখিতেছিল। ঘোড়া তাকে ফেলিয়া দিত। সে আমার কাছে আসিয়া বলিল, "ঘোড়া পিঠে বসতেই দেয় না।" তাকে আমি বলিয়াছিলাম, "ঘোড়ার পিঠেই বসতে যাও, সেবা তার কর কি,? সেবা করে অপরে, আর তুমি যাও পিঠে বসতে। তা কি হয়? নিজে তুমি তাকে দানা-পানি দাও, দলাই-মলাই কর। তারপর বস।" বন্ধু তাহাই করিতে লাগিল। দিন কয়েক পরে সে আসিয়া বলিল, "ঘোড়া এখন ফেলে দেয় না।" ঘোড়া ত পরমেশ্বর। ভক্তকে সে ফেলিতে পারে? তার ভক্তি

দেখিয়া ঘোড়া নরম হইয়া গিয়াছিল। ঘোড়া জানিতে চাহে এ ভক্ত কি আর কিছু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দলাই-মলাই করিতেন, পীতাম্বরের কোঁচড় হইতে দানা খাওয়াইতেন। টিলা, খাল, কাদা রাস্তায় পড়ে ত সাইকেল অকম্মা। কিন্তু ঘোড়া লাফ দিয়া পার হইয়া যায়। সুন্দর এই প্রেমময় ঘোড়া পরমেশ্বরেরই মূর্তি।

ধরুন ঐ সিংহের কথা। বরোদায় ছিলাম। ভোরে গম্ভীর গর্জন শুনিতাম। ঐ শব্দ এমন গম্ভীর, এমন চমৎকার যে হৃদয় নাচিয়া ওঠে। মন্দিরের গর্ভগৃহে যেমন শব্দ গুমগুম করে তেমনি গম্ভীর উহার হৃদয়-গহ্বরের ধ্বনি। আর সিংহের ঐ ধীরোদাত্ত নির্ভীক মুদ্রা! তার ঐ রাজকীয় প্রতাপ, বাদশাহী বৈভব! ঐ ভব্য সুন্দর কেশর! বনরাজের উপর যেন চামর দোলান হইতেছে! বরোদার বাগানে সিংহ ছিল। স্বাধীন মুক্ত তথায় সে ছিল না। পিঞ্জরে সে পাক খাইত। তার চক্ষে ক্রূরতার লেশও ছিল না। তার মুদ্রা ও দৃষ্টি ছিল করুণাভরা। জগতে যেন সে পরোয়াহীন। মনে হইত, আপন ধ্যানে সে নিমগ্ন। সিংহ পরমেশ্বরের পাবন বিভূতি, সত্যসত্যই একথা মনে হইত। এণ্ড্রোক্লিস্ ও সিংহের গল্প আমি বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম। কেমন সুন্দর সে কাহিনী। ঐ ক্ষুধার্ত সিংহ এণ্ড্রোক্লিসের পূর্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাহার বন্ধু হইয়া গেল, পা চাটিতে লাগিল। কী এই ব্যাপার! এণ্ড্রোক্লিস সিংহে বিরাজমান পর-মেশ্বরকে দর্শন করিয়াছিল। সিংহ সদা শঙ্করের কাছে থাকে। সিংহও ভগবানের দিব্য বিভূতি। আর ঐ বাঘই কি কম! উহাতে বেশ খানিকটা ঐশ্বরিক তেজ ব্যক্ত। উহার প্রতি বন্ধুভাব রক্ষা করা অসম্ভব নহে। ভগবান পাণিনি অরণ্যে শিষ্যদের পড়াইতেছিলেন। সে সময়ে বাঘ আসিল। ভয়ে ছেলেরা চিৎকার করিয়া উঠিল, "ব্যাঘ্রঃ ব্যাঘ্রঃ।" পাণিনি বলিলেন, "আচ্ছা, ব্যাঘ্র মানে কি? ব্যাজিঘ্রতীতি ব্যাঘ্র : যার ঘ্রাণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ সে ব্যাঘ্র।" বালকেরা ব্যাঘ্র হইতে কিছুটা ভয় ত পাইয়াছিল বটেই। কিন্তু ভগবান পাণিনির কাছে বাঘ ছিল এক নিরুপদ্রব আনন্দময় শব্দ। বাঘ দেখিয়া ঐ শব্দের ব্যুৎপত্তি তিনি দিতে লাগিলেন। পাণিনিকে বাঘে খাইয়া ফেলিল। খাইল কিন্তু হইল কি? পাণিনির দেহের মিঠা গন্ধ সে পাইল।

তাঁহার ঘাড় মটকাইল। কিন্তু পাণিনি পালাইলেন না। তিনি ছিলেন শব্দব্রহ্মের উপাসক। তাঁহার কাছে সব কিছু অদ্বৈতময় হইয়া গিয়াছিল। ব্যাঘ্রে তাঁহার শব্দব্রহ্মের অনুভব হইয়াছিল। পাণিনির এই মহনীয়তার কারণেই ভাষ্যসমূহে যেখানেই তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানেই পূজ্যভাব হইতে তাঁহাকে "ভগবান পাণিনি" বলা হইয়াছে। তাঁহারা পাণিনির কাছে মহা কৃতজ্ঞ।

অজ্ঞানান্ধস্য লোকস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥

এইরূপই ছিলেন ভগবান পাণিনি। তিনি ব্যাঘ্রে পরমাত্মা দর্শন করিতেন। জ্ঞানদেব বলিয়াছেন :

ঘরে আসুক স্বর্গ, বা চরুক ব্যাঘ্র
আত্মশুদ্ধিতে তবু কভু নাহি ভঙ্গ।

এইরূপ হইয়া গিয়াছিল ভগবান পাণিনির অবস্থা। ব্যাঘ্র দৈব বিভূতি একথা তিনি বুঝিয়াছিলেন।

সাপের কথাও তাই। লোকে সাপকে ভয়ানক ভয় করে। কিন্তু সাপ যেন কঠোর শুচি-শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। কেমন পরিষ্কার, কেমন সুন্দর। অপরিচ্ছন্নতার লেশও তার কাছে অসহ্য। নোংরা ব্রাহ্মণ তবুও দেখা যায়। কিন্তু অপরিচ্ছন্ন সাপ কেহ কখন দেখিয়াছেন? যেন একান্তবাসী ঋষি। নির্মল, উজ্জ্বল, মনোহর হারের মত ঐ সাপ। তাহাকে আবার ভয়? আমাদের পূর্বজেরা ত উহার পূজার বিধান দিয়া গিয়াছেন। আপনারা বলিবেন, হিন্দুধর্মে কত যে আজে-বাজে জিনিষ রহিয়াছে! তা হোক, নাগ পূজার বিধান উহাতে ত আছেই। বাল্যকালে মাকে পিটুলি দিয়া নাগ বানাইয়া দিতাম, মাকে বলিতাম, "মা, বাজারে ভাল নাগ পাওয়া যায়।" মা বলিতেন, "না, ওগুলি বিশ্রী। তাতে আমার দরকার নেই। নিজ সন্তানের তৈরি জিনিষ ভাল।" তারপরে নাগের পূজা হইত। এ কি পাগলামি? একটু ভাবিয়া দেখুন। ঐ সাপ শ্রাবণ মাসে অতিথিরূপে আমাদের ঘরে আসে। শ্রাবণের ধারায় ঐ বেচারার গর্ত একেবারে ভাসিয়া যায়। সে তখন কি করে? দূর একান্তবাসী ঋষি সে। অযথা আপনার অসুবিধা না হয় তাই এক-চালার

নীচে লাকড়ির মধ্যে চুপচাপ পড়িয়া থাকে। যত পারে কম জায়গা সে নেয়। কিন্তু আমরা লাঠি লইয়া দৌড়াই। সংকটে পড়িয়া অতিথি ঘরে আশ্রয় লইলে কি তাকে মারে? সেণ্ট ফ্রান্সিস্ সম্বন্ধে কথিত আছে যে জংগলে সাপ দেখিলেই তিনি বলিতেন, "এস, ভাই, এস।" সাপ তাঁহার কোলে খেলিত, গায়ে এদিক-ওদিক চলাফেরা করিত। বাজে কথা মনে করিবেন না। প্রেমে এই শক্তি আছে। বলা হয় সাপ বিষধর। কিন্তু মানুষের বিষ কি কম? সাপে কখন কখন কামড়ায়। খামকা সে কামড়ায় না। শতে নব্বুইটি সাপ বিষধর নহে। সে আপনার ক্ষেত রক্ষা করে। ক্ষেত নাশ করে এমন অসংখ্য কীট ও প্রাণী খাইয়া সে বাঁচিয়া থাকে। এইরূপ উপকারী শুচি-শুদ্ধ উজ্জ্বল-শ্রী, একান্ত-প্রিয় সর্প, সে ভগবানের রূপ নয় ত কি? আমাদের সকল দেবতায় কোথাও না কোথাও সাপ আছে। গণেশকে আমরা দিয়াছি সাপের কোমরপাটা। শংকরের গলায় সাপ জড়ান। আর ভগবান বিষ্ণু নাগশয্যায় শায়িত। ইহার মাধুর্য লক্ষ্য কর। নাগে ঈশ্বরের মূর্তি ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাই এ সকলের ভাবার্থ। সর্পস্থ পরমেশ্বরকে চিন।

(৫৩)

এরূপ কত কথা বলিব? আমি আভাস দিতেছি মাত্র। এইরূপ মনোরম কল্পনাতেই রামায়ণের সব কিছু মাধুর্য। রামায়ণে পিতা-পুত্রের ভালবাসা, মা-ছেলের ভালবাসা, ভাইয়ে ভাইয়ে ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীতে ভালবাসা, এসবই আছে। কিন্তু এ কারণে রামায়ণ আমার প্রিয় নয়। বানরের সহিত রামের বন্ধুত্ব হইয়াছিল এ কারণে রামায়ণ আমার ভাল লাগে। এখন বলা হয় যে বানরেরা ছিল নাগ-জাতির মানুষ। পুরাতত্ত্বের গবেষণা ঐতিহাসিকের কাজ। সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নাই। কিন্তু রাম সত্যসত্যই বানরের সহিত বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ইহাতে অসম্ভব কি আছে? রাম আর বানরে বন্ধুত্ব হইয়াছিল এখানেই ত রামের যথার্থ রামত্ব, মাধুর্য। গাইয়ের সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধও তদ্রূপ। ইহাই যে কোন কৃষ্ণপূজার আধার। কৃষ্ণের যে কোন ছবি ধরুন, দেখিবেন তাঁহার আশে-পাশে রহিয়াছে গাই। গোপাল কৃষ্ণ! গোপাল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ হইতে গাই সরাইয়া নিন, কৃষ্ণের আর

থাকে কি? আর রাম হইতে বানর সরাইলে কি রামে রামত্ব থাকে? রাম বানরে পরমাত্মা দর্শন করিয়াছিলেন ও তাদের সহিত প্রেমের, ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। ইহাই রামায়ণের চাবি। এই চাবি খোয়াইলেন কি মাধুর্য খোয়াইলেন। পিতা-পুত্রের, মাতা-পুত্রের ভালবাসা অন্যত্রও পাওয়া যাইবে। কিন্তু নর-বানরের অনন্যমধুর মৈত্রী কেবল রামায়ণেই মিলে, অন্য কোথাও না। বানরে স্থিত ভগবানকে রামায়ণ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। বানরদের দেখিয়া ঋষিরা আনন্দ অনুভব করেন। মাটিতে পা না ছোঁয়াইয়া, এক গাছ হইতে অন্য গাছে লাফাইয়া কুঁদিয়া ঐ বানরেরা রামটেক হইতে কৃষ্ণাতট পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইত, খেলিত। ঐ নিবিড় ঘন বন আর উহাতে খেলায় মত্ত বানরদের দেখিয়া ঐ সহৃদয় ঋষিদের মনে কাব্যের স্ফুরণ হইত। আনন্দে তাঁহারা মজিতেন। ব্রহ্মার চক্ষু কি রূপ, একথা বলিতে গিয়া উপনিষদে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মার চক্ষু বানরের চক্ষুর মত। বানরের চোখ চঞ্চল। চারিদিকে নজর। তদ্রূপই হওয়া চাই ব্রহ্মার চক্ষু। ঈশ্বরের চোখ স্থির থাকিলে চলে না। আপনি-আমি ধ্যানস্থ হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু ঈশ্বর ধ্যানে বসিলে সৃষ্টির উপায়? তাই ঋষিরা বানরে সকলের কল্যাণকামী ব্রহ্মার আঁখি দেখেন। বানরে পরমাত্মা দেখিতে শিখুন।

আর ঐ ময়ূর! মহারাষ্ট্রে ময়ূর বেশী নাই। গুজরাটে অনেক। আমি গুজরাটে ছিলাম। দশ বার মাইল হাঁটা আমার অভ্যাস। বেড়াইবার সময়ে ময়ূর দেখিতাম। আকাশে যখন মেঘ জমে, রঙ যখন ঘন কাল হয়, বৃষ্টি যখন পড়-পড় হয়, ময়ূর তখন ডাকে। তার হৃদয়-নিঙড়ান সেই কেকা শোন ত বুঝিবে। আমাদের সমগ্র স্বরগ্রাম ময়ূরের এই কেকা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। ময়ূরের কেকাই ষড়্জ, "ষড়্জং রৌতি।" এই প্রথম ষড়্জ ময়ূরের কাছ হইতে আমরা পাইয়াছি। আর তাহা কমাইয়া-বাড়াইয়া অপর স্বর আমরা সৃষ্টি করিয়াছি। মেঘে-নিবন্ধ তার ঐ দৃষ্টি, তার ঐ গম্ভীর ধ্বনি, আর মেঘের গড়গড় গর্জন শোনামাত্র ঐ তার পুচ্ছ বিস্তার। অহো হো! তার পুচ্ছের কাছে মানুষের সকল ঐশ্বর্য ম্লান হইয়া যায়। রাজা বেশভূষা করে। কিন্তু ময়ূরের পুচ্ছের কাছে সে আর কি সাজিবে? কেমন ভব্য সেই পুচ্ছ, সেই সহস্র চক্ষু, সেই বিবিধ রঙের

খেলা, সেই অনন্ত ছটা, সেই অদ্ভূত সুন্দর মৃদু রমণীয় রচনা, সেই বিচিত্র কারুকার্য! দেখুন, দেখুন ঐ পুচ্ছ, আর তাতে পরমাত্মাকেও দেখুন। এই সারা সৃষ্টি এইরূপেই সাজিয়া রহিয়াছে। দর্শন দেওয়ার জন্য পরমাত্মা সর্বত্র দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু আমরা দেখি না। এমনই আমরা অভাগা। তুকারাম কহিয়াছেন :

"প্রভুর সর্বত্র সুকাল অভাগার সর্বত্র অকাল।"

সাধুদের পক্ষে সর্বত্র সুকাল। কিন্তু আমাদের অভাগাদের পক্ষে সর্বত্র দুষ্কাল।

বেদে অগ্নির উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। অগ্নি হইতেছে নারায়ণ। কিরূপ দেদীপ্যমান তার মূর্তি! দুইখানি কাঠ ঘর্ষণ করিলেই তার প্রকাশ। আগে কোথায় লুকাইয়াছিল তাহা কে বলিবে। কেমন গরম, কেমন তেজস্বী! অগ্নির উপাসনা উপলক্ষ্যে বেদের প্রথম ধ্বনি উৎসারিত হইয়াছিল

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।"

যে অগ্নির উপাসনা দ্বারা বেদের আরম্ভ সেই দিকে তাকাও। তার ঐ জ্বালা দেখিয়া জীবাত্মার ছট্‌ফটানির কথা আমার মনে পড়িয়া যায়। ঐ সব শিখা তাহা ঘরের উনুনেরই হোক বা বনের দাবাগ্নিরই হোক, বৈরাগীর ঘর-দুয়ারের মত তনয়ই। যেখানেই সে শিখা, সেখানেই মহা ধড়ফড় লাগিয়া যায়। তার ছট্‌ফটানির বিরাম নাই। আরও উপরে উঠার জন্য সেই শিখা অধীর-অস্থির। বিজ্ঞানবিদ আপনারা বলিবেন এই সব শিখা ইথরের ক্রিয়ায়, হাওয়ার চাপে দোলে। কিন্তু সে যাহাই হোক, আমি এই অর্থে তাহা দেখি : উপরে যে পরমাত্মা আছেন, ঐ যে তেজঃসমুদ্র সূর্যনারায়ণ রহিয়াছেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উহা নিরন্তর ঊর্ধ্বে ঝাঁপ দিতেছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমানে উহার ছট্‌ফটানি চলে। সূর্য হইতেছেন অংশী আর এই সব জ্বালা হইতেছে অংশ। অংশ অংশীর কাছে যাওয়ার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে। নিভিয়া গেলেই ঐ জ্বালার নিবৃত্তি। তার আগে নয়। সূর্য হইতে তার ব্যবধান অনেক একথা তার মনে হয় না।

নিজ শক্তিভরে পৃথিবী হইতে উড়লিয়া, কুঁদিয়া চলিয়া যাইব, একথাই মাত্র সে জানে। কী ঐ অগ্নি? অগ্নির রূপে জাজ্বল্যমান বৈরাগ্য যেন প্রকট হইয়া গিয়াছে। তাই বেদের প্রথম নিঃসৃত ধ্বনি ছিল, "অগ্নিমীলে"।

আর ঐ কোকিলকেই বা কিরূপে ভুলি? কাহাকে সে ডাকে? গ্রীষ্ম-কালে নদী-নালা শুখাইয়া গিয়াছে। কিন্তু বৃক্ষে পল্লব অংকুরিত হইয়াছে। কে দিল ঐ বৈভব, কোথায় আছেন সেই বৈভবদাতা, একথাই কি সে জিজ্ঞাসা করে? কেমন তীব্র মধুর আওয়াজ! হিন্দুধর্মে কোকিল-ব্রতের বিধানই আছে। স্ত্রীলোকেরা ব্রত লয়, কোকিলের কুহু না শোনা পর্যন্ত খাইবে না। এই ব্রত কোকিলের রূপে প্রকাশ পরমাত্মাকে দর্শন করিতে শিক্ষা দান করে। কোকিলা কী সুন্দর ধ্বনি করে! যেন উপনিষদই গান করে। তার ধ্বনি কানে আসে, কিন্তু তাকে দেখা যায় না। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তার জন্য পাগল হইতেন, তার খোঁজে বনে বনে ঘুরিতেন। ইংলণ্ডের মহান কবি কোকিলকে খুঁজিতেন, পরন্তু ভারতের সাধারণ ঘরের বউ কোকিল না দেখিয়া অন্ন গ্রহণ করে না। এই কোকিল-ব্রতের দ্বারা ভারতীয় নারী মহান কবির পদবী লাভ করিয়াছে। যে কোকিল পরম আনন্দময় মধুর কুহু শোনায় তার রূপ ধরিয়া সুন্দর পরমাত্মাই প্রকট হইয়াছেন।

কোকিল সুন্দর আর কাক কি হেলার? কাকেরও প্রশংসা করুন। আমার ত তাকে খুব ভাল লাগে। তার কাল কুচকুচে রঙ, ঐ তীব্র আওয়াজ! ঐ শব্দ কি খারাপ? তাহাও মিষ্টি। পাখা ফড়ফড় করিয়া সে আসে; কেমন ভাল লাগে। শিশুদের চিত্ত সে হরণ করিয়া লয়। বন্ধ ঘরে শিশুরা খায় না। তাদের খোলা আঙিনায় নিয়া খাওয়াইতে হয়। ঐ কাক, ঐ চিল বলিয়া মুখে গ্রাস দিতে হয়। শিশুরা কাক ভালবাসে বলিয়া কি তারা পাগল? পাগল তারা নয়। জ্ঞানের তারা আকর। কাক-রূপে ব্যক্ত পরমেশ্বরের সহিত তারা ঝট্ করিয়া একরূপ হইয়া যায়। মা ভাতে দই দেন, দুধ দেন, গুড় মাখেন। শিশুর সেদিকে লক্ষ্য নাই। কাক ফড়ফড় করে, মুখ-ভংগী করে, তাতে তার আনন্দ। সৃষ্টির প্রতি ছোট বাচ্চাদের এই যে মহা আকর্ষণ তাহা অবলম্বন করিয়াই গোটা 'ঈসপস্ ফেবলস্' রচিত

হইয়াছে। ঈসপ সর্বত্র ঈশ্বর দেখিতেন। আমার প্রিয় গ্রন্থের তালিকায় সর্বাগ্রে ঈসপস্ ফেবল্সের নাম আমি করিব। এবিষয়ে আমার ভুল হইবে না। ঈসপের রাজ্যে কেবল দুই-হাত আর দুই-পা বিশিষ্ট জীব মানুষই আছে তা নয়। সেখানে শিয়াল-কুকুর, হরিণ-খরগোশ, কাক-কচ্ছপ ইত্যাদি সকল রকম প্রাণী আছে। সকলেই কথা বলে, হাসে। তাহা এক মহা সম্মেলনই বটে। সমস্ত চরাচর ঈসপের সহিত কথা বলে। দিব্য দর্শন তিনি লাভ করিয়াছেন। রামায়ণও এই তত্ত্বের উপর, এই দৃষ্টি হইতে রচিত। তুলসীদাস রামের বাললীলার বর্ণনা করিয়াছেন। উঠানে রাম খেলিতেছে। সামনেই কাক। রাম আস্তে তাকে ধরিতে যায়। কাক একটু দূরে সরে। অবশেষে রাম ক্লান্ত হইয়া যায়। কিন্তু একটা উপায় রামের মাথায় আসে। হাতে পেড়ার টুকরা লইয়া সে কাকের কাছে যায়। টুকরাটা রাম একটু আগাইয়া ধরে। কাক একটু নিকটে আসে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তুলসীদাস এরূপ বর্ণনায় ভরিয়াছেন কারণ ঐ কাক পরমেশ্বর। রামের মূর্তিতে যে অংশ কাকেও সে অংশই বিদ্যমান। রাম ও কাককে এভাবে দেখা মানে পরমাত্মা দ্বারা পরমাত্মার দর্শন লাভ করা।

(৫৪)

সারাংশ, এরূপে সমগ্র সৃষ্টিতে বিবিধ রূপে পবিত্র নদীরূপে, বিশাল পর্বতরূপে, গম্ভীর সাগররূপে, বৎসল গাভী রূপে, সুদর্শন ঘোড়ারূপে, বৈভবশালী সিংহরূপে, মধুর কোকিলরূপে, সুন্দর ময়ূররূপে, পরিচ্ছন্ন একান্তপ্রিয় সর্পরূপে, ডানা ফড়ফড়কারী কাকরূপে, দৌড়ঝাঁপকারী অস্থির অগ্নিশিখারূপে, প্রশান্ত তারকারাজিরূপে পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজমান। তাহা চোখে দেখার অভ্যাস করিতে হইবে। প্রথমে স্থূল সরল অক্ষর, তারপরে সূক্ষ্ম যুক্তাক্ষর শিখিতে হইবে। যুক্তাক্ষর না শেখা পর্যন্ত পাঠ অগ্রসর হইবার নয়। পদে পদে যুক্তাক্ষর আসিবে। দুর্জনে অবস্থিত পরমাত্মাকেও দেখিতে শেখা চাই। রাম বুঝা যায়, কিন্তু রাবণকেও বুঝিতে হইবে। প্রহ্লাদ ভাল লাগে ত হিরণ্যকশিপুকেও ভাল লাগা চাই। বেদে

বলা হইয়াছে :

"নমোনমঃ স্তেনানাং পতয়ে নমোনমঃ
নমঃ পুঞ্জিষ্টেভ্যো নমো নিষাদেভ্যঃ"
"ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা
ব্রহ্মৈবেমে কিতবাঃ"

"ঐ ডাকাতদের সর্দারকে নমস্কার; ঐ ক্রূরদের ঐ হিংসকদের নমস্কার। হে ঠগ, হে দুষ্ট, হে চোর, সবই তোমরা ব্রহ্ম। সবকে নমস্কার।"

এর অর্থ কি? অর্থ এই যে সরল অক্ষর শিখিয়া গিয়াছ, এবার কঠিন অক্ষর শেখ। গ্রন্থকার কারলাইল 'বিভূতি-পূজা' নামক বই লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি নেপোলিয়ানকেও বিভূতি বলিয়াছেন। এখানে পরমাত্মা শুদ্ধ পরমাত্মা নহেন, মিশ্র পরমাত্মা। কিন্তু এই যে পরমেশ্বর তাঁকেও চেনা চাই। তাই তুলসীদাস রাবণকে রামের বিরোধী ভক্ত বলিয়াছেন। এই ভক্তের ধরনধারন একটু আলাদা। আগুনে পা পোড়ে, ফোস্কা পড়ে। কিন্তু যে স্থানে ফোস্কা পড়িয়াছে তাতে সেঁক্ দিলে ফোস্কা দূর হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেখাইলেও রাম ও রাবণে একই পরমেশ্বরের আবির্ভাব।

স্থূল ও সূক্ষ্ম, সরল ও মিশ্র, সহজ অক্ষর ও যুক্তাক্ষর, সব শেখ। এবং অন্তে, পরমেশ্বর ছাড়া কোন স্থান নাই এরূপ অনুভব কর। অণু-রেণুতে তিনি আছেন। পিঁপড়া হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত পরমাত্মা সর্বত্র ব্যাপ্ত। সকলকে যিনি সমান চোখে দেখেন সেই দয়ালু, জ্ঞানমূর্তি, বৎসল, সমর্থ, পাবন, সুন্দর, এই যে পরমাত্মা তিনি সর্বদিকে খাড়া রহিয়াছেন।

রবিবার, ২৪-৪-৩২

একাদশ অধ্যায়

(৫৫)

বন্ধুগণ,

এ বিশ্বের অনন্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে কিভাবে চেনা যায়, এই যে বিরাট প্রদর্শনী আমাদের চক্ষের সামনে খাড়া তাহা কিভাবে আত্মসাৎ করা যায় সেকথার আলোচনা গতবার আমরা করিয়াছি। প্রথমে স্থূল পরে সূক্ষ্ম, প্রথমে সরল পরে মিশ্র, এরূপে সর্ব বস্তুতে পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে, তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে, অহর্নিশ যত্ন করিয়া সমস্ত বিশ্বকে আত্মরূপ দেখিতে শিখিতে হইবে, পূর্ব অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা করা গিয়াছে।

আজ একাদশ অধ্যায়ের আলোচনা করা যাইতেছে। এই অধ্যায়ে ভগবান নিজ প্রত্যক্ষ রূপ দেখাইয়া অর্জুনের প্রতি পরম কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্জুন ভগবানকে বলিলেন, "ভগবান, তোমার ঐ পূর্ণরূপ দেখতে চাই। যেরূপে তোমার সকল মহান প্রভাব প্রকাশ হয়েছে সেরূপ চক্ষে দেখতে বাসনা।" অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আমরা 'বিশ্ব', 'জগৎ', ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করি। এই 'জগৎ' বিশ্বের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই ছোটখাট টুকরার ধারণাই আমরা করিয়া উঠিতে পারি না। জগত যাহা এত বিশাল মনে হয় বিশ্বের তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ মনে হইবে। রাত্রিকালে আকাশের দিকে একবারটি দেখেন ত দেখিতে পাইবেন অনন্ত গোল। আকাশ আঙিগনায় ঐ যে সাজসজ্জা, ঐ যে সব ছোট ছোট সুন্দর ফুল, ঐ যে লাখো তারা ঝিকমিক করিতেছে তাহাদের স্বরূপ জান কি? ঐ ছোট তারকা মহান প্রচণ্ড। তাতে অনন্ত সূর্যের সমাবেশ হইতে পারে। ধকধকে তেজোময় জ্বলন্ত ধাতুর পিণ্ড ওগুলি। ঐ যে অনন্ত পিণ্ড তার হিসাব কে করিবে? না আছে অন্ত, না আছে পার। খালি চোখেই হাজারো দেখা যায়। দূরবীন দিয়া দেখিলে কোটি দেখা যাইবে। আরও বড় দূরবীন দিয়া দেখিলে পরার্ধ পর্যন্ত দেখা যাইবে আর শেষটায়, ইহার অন্ত যে কোথায় ও কিসে তাহা ধারণা করা যায় না।

এই যে অনন্ত সৃষ্টি উপরে নীচে ব্যাপ্ত, তার ছোটখাট টুকরা আমাদের এই জগত। কিন্তু এই জগতই কত বিশাল দেখা যায়।

এই বিশাল সৃষ্টি পরমেশ্বরের স্বরূপের এক দিক মাত্র। এবার উহার অপর দিক নিন। তাহা হইতেছে কাল। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইতিহাসের সীমার মধ্যে বড় জোর হাজার দশেক বর্ষ পর্যন্ত পাওয়া যায়। তার আগেকার কাল কল্পনায়ও ধরা যায় না। ইতিহাস-কাল দশ হাজার বৎসরের আর আমাদের নিজ জীবনকাল কষ্টে-সৃষ্টে শত বর্ষের হইবে। বস্তুত কালের বিস্তার অনাদি, অনন্ত। কত কাল গিয়াছে তার হিসাব নাই। আগে কত আছে তার ধারণা নাই। আমাদের জগত যেমন বিশ্বের তুলনায় তুচ্ছ, তেমনই ঐতিহাসিক দশ হাজার বৎসর অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নহে। অতীতকাল অনাদি, ভবিষ্যৎকাল অনন্ত। ক্ষুদ্র-প্রায় বর্তমান কাল দেখিতে না দেখিতে অতীত কালে লীন হইয়া যায়। বর্তমান কাল কোথায় আছে ইহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতেছেন ত ইতিমধ্যে তাহা অতীতে ডুবিয়া গিয়াছে। এইভাবে অত্যন্ত চপল বর্তমানকালের আমরা কর্তা। আমি এই মুহূর্তে বলিতেছি, শব্দ মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই তাহা অতীত কালে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এইরূপে কাল-নদী একটানা বহিয়া চলিয়াছে। তাহার উদ্‌গমের ঠিক ঠিকানা নাই, অন্তেরও নাই। মধ্যেকার একটু প্রবাহ মাত্র আমরা দেখিতে পাই।

এই প্রকারে একদিকে স্থলের প্রচণ্ড বিস্তার ও অপর দিকে কালের প্রচণ্ড প্রবাহ, এই দুই দিক হইতে সৃষ্টির দিকে তাকান ত দেখা যাইবে কল্পনা শক্তিকে যতই প্রসারিত করুন না কেন ইহার কোনও পার পাওয়া যাইবে না। তিন কালে, তিন স্থলে, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে, তদ্রূপ উপরে নীচে, এখানে সর্বত্র ব্যাপ্ত বিরাট পরমেশ্বর এক সময়ে একবারে দেখা দেন, এই বিরাট পরমেশ্বরের দর্শন লাভ হউক, এই ইচ্ছা অর্জুনের হইল। এই ইচ্ছা হইতে একাদশ অধ্যায়ের সূচনা।

অর্জুন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কিরূপ প্রিয়? এতটা যে দশম অধ্যায়ে কোন কোন স্বরূপে তাঁর ধ্যান করা চাই এই কথা বলিতে গিয়া ভগবান বলিতেছেন, "পাণ্ডবদের মধ্যে যে অর্জুন তাঁর রূপে আমার

ধ্যান কর।" শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয়।" ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম-পাগলপনা প্রেমোন্মাদনা কি হইতে পারে? প্রেম যে কতদূর পাগল হইতে পারে ইহা তাহার উদাহরণ। অর্জুনের প্রতি ভগবানের অপার প্রীতি। এই একাদশ অধ্যায় সেই প্রীতির প্রসাদ। অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়া ভগবান তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিলেন। অর্জুনকে তিনি প্রেমের প্রসাদ দিলেন।

(৫৬)

সেই দিব্য রূপের সুন্দর বর্ণনা, ভব্য বর্ণনা এই অধ্যায়ে আছে॥ যদ্যপি এসবই সত্য তথাপি এ বিশ্বের বিষয়ে আমি বিশেষ লোভ দেখাইতে পারি না। আমি ক্ষুদ্র রূপ লইয়াই সন্তুষ্ট। যে ছোটখাট সুন্দর প্রিয় রূপ চক্ষে ধরা পড়ে তাহার মাধুরী অনুভব করিতে আমি শিখিয়াছি। পরমেশ্বর টুকরা টুকরা নহেন। পরমেশ্বরের যে রূপ দেখিতেছি উহা তাঁহার এক টুকরা আর বাকি পরমেশ্বর বাহিরে রহিয়াছেন এরূপ আমি মনে করি না। যে পরমেশ্বর বিরাট বিশ্বে ব্যাপ্ত, তিনি সেই পূর্ণ রূপেই ছোট মূর্তিতে, মাটির একটি কণাতেও ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, কম নহেন। অমৃতের সমুদ্রে যে মিষ্টতা, এক বিন্দুতেও সেই মিষ্টতা। অমৃতের যে ছোটমত বিন্দু আমি পাইয়াছি তাহার মধুরতা আমি চাখিতে থাকিব। ইহাই আমার বাসনা॥ ভাবিয়া চিন্তিয়াই আমি অমৃতের দৃষ্টান্ত লইতেছি। জলের বা দুধের লই নাই। এক বাটি দুধে যে স্বাদ, এক ঘটি দুধেও সেই স্বাদ। কিন্তু স্বাদ তেমন হইলেও পুষ্টি তেমন নহে। এক বিন্দু দুধে যে পুষ্টি, এক বাটি দুধে তাহা অপেক্ষা অধিক পুষ্টি। কিন্তু অমৃতের দৃষ্টান্তে তাহা নহে। অমৃত-সমুদ্রের মিষ্টতা অমৃতের এক বিন্দুতেও থাকে, তা ছাড়া তেমনই তাহা পুষ্টিকর। বিন্দু পরিমাণ অমৃতও গলার নীচে গেলে অমৃতে সব অমৃতময় হয়।

তদ্রূপ যে দিব্যতা, যে পবিত্রতা, পরমেশ্বরের বিরাট স্বরূপে বিরাজমান তাহা ছোটখাট মূর্তিতেও বিরাজমান। এক মুঠ ধান আমায় আনিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া যদি আমি ধান চিনিতে না পারি ত বস্তা-ভরা ধান আমার সামনে রাখিলেই কি আমি তাহা চিনিতে পারিব? ঈশ্বরের ক্ষুদ্র

নমুনা যাহা আমার চক্ষের সামনে রহিয়াছে তাহা হইতে যদি ঈশ্বরকে আমি না চিনিলাম ত বিরাট পরমেশ্বরকে দেখিয়া আমি কিরূপে চিনিব? ছোট-বড়তে কি আছে, ছোটর পরিচয় হইয়াছে ত বড়র পরিচয় আগেই হইয়া গিয়াছে। অতএব ঈশ্বর বিরাট রূপ দেখান এই আগ্রহ আমার নাই। অর্জুনের মত বিশ্বরূপ-দর্শনের প্রার্থনা করার যোগ্যতা আমার নাই। তা ছাড়া যা কিছু আমি দেখি তা বিশ্বরূপের টুকরা মাত্র নহে। ছবির কোন ছেঁড়া টুকরা আনিলেন, তাহা হইতে গোটা ছবির ধারণা হয় না। কিন্তু পরমেশ্বর ত এরূপ টুকরায় তৈরী নহেন। পরমেশ্বর খণ্ডিত নহেন। অংশে বিভক্ত নহেন। ছোটখাট স্বরূপেও ঐ অনন্ত পরমেশ্বর পূর্ণ রূপে ব্যাপ্ত আছেন। ছোট ফটো আর বড় ফটোতে পার্থক্য কি? বড়তে যাহা ছোট অপেক্ষা ছোটতেও হুবহু তাহা। ছোট ফটো মানে বড় ফটোর এক টুকরা নয়। অক্ষর আকারে ছোট হইলেও অর্থ সে একই। বড় টাইপের অক্ষর হইলেও সেই অর্থ। বড় টাইপে বড় অর্থ, আর ছোট টাইপে ছোট অর্থ এরূপ ত নহে।

এই বিচার-পদ্ধতি মূর্তিপূজার আধার। মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে অনেক আক্রমণ হইয়াছে। বাহিরের আর এখানকারও অনেক সমালোচক মূর্তিপূজাকে দোষের বলিয়াছেন। কিন্তু যতই আমি চিন্তা করি ততই মূর্তিপূজার দিব্যতা আমার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ে। মূর্তিপূজার অর্থ কি? ছোট কোনও বস্তুতে সকল বিশ্ব অনুভব করার যে শিক্ষা তার নাম মূর্তি-পূজা। ক্ষুদ্র গ্রামে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখার শিক্ষা কি মন্দ? ইহা কল্পনা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভবের কথা। বিরাট স্বরূপে যাহা আছে তাহা ছোট মূর্তিতে, এক কণা মাটিতেও আছে। ঐ মাটির ঢেলার নীচে আম, কলা, ধান, সোনা, তামা রূপা সবই আছে। সারা সৃষ্টি ঐ কণাতে আছে। কোন ছোট নাটক-পার্টিতে যেমন একই লোক বার বার ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে আসে পরমেশ্বরকেও তদ্রূপ মনে কর। অথবা যেরূপ কোন নাট্যকার নিজেই নাটক লিখে ও নিজেই নাটকে কাজ করে সেইরূপ পরমাত্মাও অনন্ত নাটক লিখেন ও নিজে অনন্ত পাত্র সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। এই অনন্ত নাটকের কোন এক পাত্রকে দেখিলে সব কিছু দেখা হইল।

কাব্যের উপমা-দৃষ্টান্তের যাহা আধার মূর্তিপূজারও ত তাহাই

আধার। যে কোন গোল বস্তু দেখিলে আমাদের আনন্দ হয়। কারণ তাহাতে ব্যবস্থিততা রহিয়াছে। ব্যবস্থিততাই ঈশ্বরের স্বরূপ। ঈশ্বরের সৃষ্টি সর্বাঙ্গ সুন্দর। তাহাতে ব্যবস্থিততা রহিয়াছে। ঐ গোল বস্তু মানে ঈশ্বরের ব্যবস্থিত মূর্তি। কিন্তু জঙ্গলে বর্ধিত আঁকা-বাঁকা গাছ তাহাও ঈশ্বরের মূর্তি। তাহাতে রহিয়াছে ঈশ্বরের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ। ঐ বৃক্ষে বন্ধন নাই। ঈশ্বরকে বন্ধনে বাঁধিবে কে? ঐ বন্ধনাতীত পরমেশ্বর ঐ আঁকা-বাঁকা গাছে রহিয়াছেন। ঐ যে সরল স্তম্ভ তাহা ঈশ্বরের সমতার সাক্ষ্য। নক্সা করা যে স্তম্ভ দেখিতেছেন তাহা আকাশে নক্ষত্র দিয়া ফুল-পত্র অঙ্কনকারী পরমেশ্বরের প্রতীক। কাটা-ছাঁটা ব্যবস্থিত বাগানে ঈশ্বরের সংযমরূপ দেখা যায়। আর বিশাল বনে ঈশ্বরের ভব্যতা ও স্বতন্ত্রতার সাক্ষাৎ মিলে। জঙ্গলে আনন্দ মিলে, ব্যবস্থিত বাগানেও মিলে। আমরা কি তবে পাগল? পাগল নহি। উভয়েতেই আনন্দ। কারণ প্রত্যেকেই ঐশ্বরিক গুণের প্রকাশ। মসৃণ শালগ্রাম শিলাতে যে ঐশ্বরিক তেজ, তাহা নর্মদার এবড়ো-থেবড়ো ঐ 'শঙ্করে'ও বিদ্যমান। ঐ বিরাট রূপের দর্শন যদি আলাদাভাবে আমার না মিলে ক্ষতি নাই।

পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন গুণের দ্বারা সর্বত্র প্রকট হইয়াছেন বলিয়া আমাদের আনন্দ হয়। ঐ বস্তুর সম্বন্ধে আত্মীয়তার ভাব জন্মে। আনন্দ যে হয় তাহা অকারণ নহে। আনন্দ কেন হয়? কোন-রূপ সম্বন্ধ আছে তাই আনন্দ হয়। সন্তানকে দেখিয়া মায়ের আনন্দ হয়। কারণ সম্বন্ধ তার জানা আছে। প্রত্যেক বস্তুর সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ জড়িত। আমার মধ্যে যে পরমেশ্বর তিনি ঐ বস্তুতেও আছেন। এইভাবে সম্বন্ধ বাড়ানো মানে আনন্দ বাড়ানো। আনন্দের অন্য কোন উপপত্তি নাই। ভালবাসার সম্বন্ধ সর্বত্র পাতাইতে থাকুন, দেখিবেন কি আনন্দ। তখন অনন্ত সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত পরমাত্মা অণুরেণুতেও দেখা দিবেন। এই দৃষ্টি একবার লাভ হইয়াছে ত আর কি চাই? পরন্তু এই জন্য ইন্দ্রিয়সমূহের মোড় ঘুরানো দরকার। ভোগ বাসনা দূর হইয়া প্রেমের পবিত্র দৃষ্টি লাভ হইলে প্রত্যেক বস্তুতে ঈশ্বর দেখা দিবেন। আত্মার রঙ কিরূপ ইহার সুন্দর বর্ণনা উপনিষদে আছে। আত্মার রঙ কি ভাবে বর্ণনা করা যায়? ঋষি

সপ্রেমে বলিয়াছেন :

"যথা অয়ং ইন্দ্রগোপঃ"

এই যে লাল লাল রেশমমোলায়েম মৃগ-কীট আত্মার রূপ তাহারই মত। ঐ মৃগ-কীট দেখিলে কতই না আনন্দ হয়। কোথা হইতে আসে এই আনন্দ? আমাতে যে ভাব তাহাই ঐ ইন্দ্রগোপে বিদ্যমান। তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ না থাকিলে আমার আনন্দ হইত না। আমার মধ্যে যে সুন্দর আত্মা তাহা ইন্দ্রগোপেও আছে। তাই ত উহার উপমা দিলাম। উপমা কেন দিই? উহা হইতে আনন্দ হয় কেন? সেই দুই বস্তুতে সাম্য আছে বলিয়া আমরা উপমা দিই আর তার জন্যই আনন্দ হয়। উপমেয় ও উপমান যদি একান্তই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হয় তবে আনন্দ হইবে না। 'লবণ লঙ্কার মত' একথা কেহ যদি বলে ত তাহাকে আমরা পাগল বলি। কিন্তু 'তারা ফুলের মত' একথা যখন কেহ বলে ত সমতা আছে বলিয়া আনন্দ হয়। লবণ ঝালের মত একথা বলিলে সাদৃশ্য অনুভব হয় না। লবণে যে পরমাত্মা, ঝালেও সেই পরমাত্মা। এই দর্শন, এই বিশাল দৃষ্টি যাহার লাভ হইয়াছে, 'লবণ কিরূপ? না, ঝালের মত', এই উক্তিতেও সে আনন্দ অনুভব করিবে। তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরীয় রূপ প্রত্যেক বস্তুতে ওতপ্রোত ভরা আছে। তাহার জন্য বিরাট দর্শনের দরকার নাই।

(৫৭)

তা ছাড়া বিরাট দর্শন আমার সহ্য হইলে ত? ছোট সগুণ রূপের প্রতি যে প্রেমের অনুভূতি, যে মমত্ব বোধ জাগে, যে মধুরতার আভাস আসে, বিশ্বরূপ দর্শনে তাহা কখনও হইবার নয়। ঠিক তাহাই হইয়াছিল অর্জুনের অবস্থা। থরথর কাঁপিতে কাঁপিতে অবশেষে তিনি বলিতেছেন, "ভগবান, তোমার পূর্বের সে মনোহর রূপ দেখাও।" বিরাট স্বরূপ দেখার ইচ্ছা করিও না, নিজ অভিজ্ঞতা হইতে অর্জুন একথাই বলিতেছেন। ঈশ্বর যে তিন কাল ও তিন স্থানে ব্যাপ্ত আছেন তাহাই ভাল। ঐ সব তারা মিলিয়া গিয়া জ্বলন্ত পিণ্ডের আকারে যদি আমার সামনে আসে ত আমার দশা কি হইবে? তারাগুলি দেখিতে কেমন শান্ত-স্নিগ্ধ। মনে হয় তাহারা দূর হইতে আমার সহিত কথা বলিতেছে। কিন্তু দৃষ্টিস্নিগ্ধকারী ঐ তারকাই যদি

নিকটে আসিয়া যায় ত? একেবারে ধক্‌ধকে জ্বলন্ত আগুন। পুড়িয়া আমি ছাই হইয়া যাইব। ঈশ্বরের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যথায় যেমন তথায় তেমনি থাকিতে দিন। ঐ সবকে এক ঘরে জমা করাতে আনন্দ কোথায়? বোম্বাইয়ের ঐ কবুতরের খোপে হাজারো কবুতর থাকে। কি স্বাধীনতা সেখানে তাহাদের আছে? অদ্ভুত লাগে ঐ দৃশ্য। এই সৃষ্টি আকাশ, পাতাল, পৃথিবী এই তিন ভাগে বিভক্ত। মজা ত এখানেই। স্থলাত্মক সৃষ্টি সম্বন্ধে যেকথা, কালাত্মক সৃষ্টি সম্বন্ধেও তাই। অতীতের স্মৃতি যে আমাদের থাকে না, আর ভবিষ্যতের জ্ঞান যে আমাদের নাই তাহা আমাদের কল্যাণেরই জন্য। অস্তিত্ব এক পরমেশ্বরেরই আছে। মানুষের সত্ত্বা আদৌ নাই। যে বস্তুতে একমাত্র পরমেশ্বরেরই সত্ত্বা বর্তমান, মনুষ্য-প্রাণীর সত্ত্বা আদৌ নাই এরূপ পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ কোরানে আছে। তার একটি হইতেছে, 'ভবিষ্যৎকালের জ্ঞান'। আমরা আন্দাজ করি। কিন্তু আন্দাজ, জ্ঞান নহে। ভবিষ্যতের কথা যে জানি না তাহাতে আমাদেরই কল্যাণ। তদ্রূপ অতীত কালের স্মৃতি যে থাকে না তাহাও সত্যসত্যই উত্তম। কোন দুর্জন লোক ভাল হওয়ার পরেও যদি আমার কাছে আসে, তাহার অতীত কথা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতি আমার আদর ভাব আসে না। যতই বলুক তাহার অতীত পাপ আমি সহসা ভুলিতে পারি না। মরিয়া অপর রূপে আসিলেই কেবল সংসার তাহার ঐ পাপ ভুলে।

পূর্ব স্মৃতি হইতে বিকার বৃদ্ধি পায়। পূর্বের এই সকল জ্ঞান যদি নষ্ট হইয়া যায় ত সব শেষ। পাপ-পুণ্য ভুলিয়া যাওয়ার কোন পথ থাকা চাই। মৃত্যু সেই উপায়। এ জন্মের বেদনাই যখন অসহ্য, তখন গত জন্মের আবর্জনা খুঁজিতে যাই কেন? এই জন্মরূপ ঘরে আবর্জনার কি কিছু কমতি আছে? বাল্যকালের কথা আমরা অনেকটা ভুলিয়া যাই। এই বিস্মৃতি লাভদায়ক। অতীতের বিস্মৃতিই হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ। ঔরঙ্গজেব অত্যাচার করিয়াছিল সেকথা আর কত কাল রটনা করা হইবে? রতনবাঈয়ের একটি গুজরাটি গরবা গান আছে। এখানে তাহা সময় সময় শুনিতে পাই। গানের অন্তে বলা হইয়াছে, "সংসারে শেষটায় লোকের কীর্তিই থাকবে। পাপ ভুলে যাবে।" চালনীতে কাল ছাঁকিতেছে।

ইতিহাসে যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করা চাই। পাপ ফেলিয়া দেওয়া চাই। মন্দ ছাড়িয়া লোকে কেবল ভাল দেখে ত কি ভালই না হয়। কিন্তু তাহা হয় না। তাই বিস্মরণের খুব দরকার আছে। তাই ত ভগবান মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জগৎ যেরূপ সেরূপেই তাহা মঙ্গলময়। কালস্থলাত্মক জগতকে এক জায়গায় নিকটে জড় করিতে যাইও না। অতি পরিচয়ে মাধুর্য নাই। কোন কোন জিনিষের সহিত মাখামাখি করিতে হয় ত অপর কতক জিনিষ দূরে রাখিতে হয়। গুরু হইলে নম্রতাপূর্বক দূরে বসি। মা হইলে কোলে বসি। যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা দরকার, সেরূপ করা চাই। ফুল কাছে রাখি, আগুন হইতে দূরে থাকি। তারকা দূর হইতেই সুন্দর। সৃষ্টি সম্বন্ধেও সেই কথা। অতি দূরের ঐ সৃষ্টি অতি নিকটে আনিলে যে অধিক আনন্দ হইবে তাহা নহে। যে বস্তু যেখানে আছে সেখানেই তাহা থাকিতে দিন। তাতেই মাধুর্য। দূরে যে বস্তু দেখি, তাহা নিকটে আনিলেই সুখাবহ হইবে তাহা নহে। সেই দূরে রাখিয়াই তার রস আস্বাদ করা চাই। অশিষ্ট হইয়া ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া অতি পরিচয় করাতে সার নাই।

সারাংশ, তিনকাল যে আমাদের সামনে খাড়া নহে তাহা ভালই। তিন কালের জ্ঞান হইলে আনন্দের কিংবা কল্যাণের হইত একথা বলা চলে না। অর্জুন প্রেমবশে জিদ ধরিলেন, প্রার্থনা করিলেন, ভগবান তাহা পূর্ণ করিলেন। ভগবান নিজের সেই বিরাট রূপ তাঁহাকে দেখাইলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের ক্ষুদ্র রূপই আমার কাছে যথেষ্ট। এই ছোটরূপ মানে ঈশ্বরের টুকরা নহে। আর যদি টুকরাই হয় ত ঐ অপার বিশাল পুতুলের একখানি পা কিংবা এক পায়ের একটি অঙ্গুলিই যদি দেখিতে পাই ত আমি বলিব "অহো, কি ভাগ্যবান আমি!" উপলব্ধি হইতে আমার এই জ্ঞান হইয়াছে। যমুনালালজী যখন ওয়ার্ধায় লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হরিজনদের জন্য খুলিয়া দেন তখন আমি দর্শনের জন্য গিয়াছিলাম। পনর বিশ মিনিট সেই রূপ এক-দৃষ্টিতে দেখিলাম। সমাধি লাগার মত অবস্থা হইল। ভগবানের সেই মুখ, সেই বক্ষ, সেই হাত দেখিতে দেখিতে চরণে আসিলাম আর শেষটায় দৃষ্টি

চরণে নিবদ্ধ হইয়া গেল। অবশেষে 'মধুর তোর চরণসেবা' এ ভাব মনে থাকিয়া গেল। ছোট রূপে যদি ঐ মহান প্রভুকে আঁটান না যায় তবে ঐ মহান পুরুষের চরণ দর্শনই পর্যাপ্ত। ঈশ্বরের কাছে অর্জুন প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অধিকার ছিল অধিক। কত না ঘনিষ্ঠতা, কত না প্রেম, আর কত না সখ্যভাব ছিল! আমার যোগ্যতা কি? আমার পক্ষে চরণই যথেষ্ট। ততটুকুতেই আমার অধিকার।

(৫৮)

পরমেশ্বরের সে দিব্যরূপের বর্ণনার উপর বুদ্ধি খাটাইতে যাওয়ার প্রবৃত্তি আমার নাই। ওখানে বুদ্ধি চালনা করিতে যাওয়া পাপ। যেসকল শ্লোকে বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে সেগুলি পড়া আর দিন দিন পবিত্র হওয়া ইহাই আমাকে সাজে। বুদ্ধি চালনা করিয়া পরমেশ্বরের সে রূপের টুকরা করার সাধ আমার নাই। তাহা হইবে অঘোর উপাসনা। অঘোরপন্থীরা শ্মশানে যাইয়া শব চিরে ও তন্ত্রোপাসনা করে। ইহা তদ্রূপই হইবে। পরমেশ্বরের ঐ দিব্য রূপ

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ॥"

এরূপই সে বিশাল অনন্তরূপ। ঐ সকল বর্ণনাত্মক শ্লোক গাহিতে হইবে, গাহিয়া নিষ্পাপ হইতে হইবে, পবিত্র হইতে হইবে।

পরমেশ্বরের এই সমস্ত বর্ণনার কেবল এক জায়গায় বুদ্ধি বিচারে প্রবৃত্ত হয়। অর্জুনকে পরমেশ্বর বলিতেছেন, "অর্জুন, এরা সবে মরেই আছে। তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও। যা কিছু করার সে ত আমি করব।" এই ধ্বনি মনে গুঞ্জরিত হইতে থাকে। ঈশ্বরের হাতে আমাদের হাতিয়ার হইতে হইবে। এভাব যখন আসে তখন কিভাবে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হওয়া যায় বুদ্ধি সে বিচারে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বরের হাতের মুরলী কিরূপে হইব? আমাকে ঠোঁটে লাগাইয়া আমার ভিতর হইতে মধুর সুর তিনি বাহির করিবেন, আমাকে বাজাইবেন, কি করিলে তাহা হইবে? মুরলী হওয়া মানে ফাঁপা হওয়া, কিন্তু বিকার-বাসনায় আমি ভরতি। তবে আমা হইতে মধুর

সুর বাহির হইবে কিরূপে? আমার স্বর বন্ধ। আমি ত নিরেট বস্তু। অহংকারে আমি ভরতি। নিরহংকার আমাকে হইতে হইবে। পূর্ণ মুক্ত, পূর্ণ শূন্য হইলেই কেবল পরমেশ্বর আমাকে বাজাইবেন। কিন্তু পরমেশ্বরের ঠোঁটে মুরলী হওয়া বড়ই সাহসের ব্যাপার। তাঁহার পায়ের জুতা হইতে চাহি ত তাহাও সহজ কাজ নয়। পরমেশ্বরের পায়ে না লাগে এমন নরম ত হইতে হইবে। পরমেশ্বরের চরণ ও কাঁটা-কঙ্কর এ দুইয়ের মধ্যে আমার পড়িতে হইবে। নিজকে আমার পাকাইয়া লইতে হইবে। নিজ চামড়া ছাড়াইয়া উহাকে পাকাইতে হইবে, মোলায়েম বানাইতে হইবে। অতএব পায়ের জুতা হওয়াও সহজ নহে। পরমেশ্বরের হাতের অস্ত্র হইতে হইলে আমাকে দশ সের ওজনের লোহার বল হইতে হইবে তাহা নয়। ধারাল করার জন্য তপশ্চর্যার শানে নিজকে চড়াইতে হইবে। আমার জীবন-তরবারি ঈশ্বরের হাতে ঝক্‌ঝক করা চাই। এই ধ্বনি আমার বুদ্ধিতে গুঞ্জরিত হইতেছে। ভগবানের হাতে অস্ত্র হইতে হইবে এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যাই। তাহা কিভাবে করা যায়, হওয়া যায় অন্তিম শ্লোকে সেকথা ভগবান নিজেই বলিয়াছেন। এই শ্লোককে শঙ্করাচার্য নিজ ভাষ্যে 'সর্বার্থসার', সমস্ত গীতার সার বলিয়াছেন। কি সে শ্লোক?

"মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ
নির্বৈর সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

মোর তরে করে কর্ম, মৎপরায়ণ ভক্ত যে
অনাসক্ত নির্বৈর আমাতে এসে মিলে সে॥

জগতে কাহারও সহিত যাহার বৈর নাই, অনাসক্তভাবে যে জগতের নিরপেক্ষ সেবা করে, সব কিছু কর্ম আমাতে অর্পণ করে, নিঃসঙ্গ, বিরক্ত, প্রেমময় এমন যে ভক্ত সে পরমেশ্বরের হাতের হাতিয়ার হয়। এই-রূপই এই সার।

রবিবার, ১-৫-৩২

দ্বাদশ অধ্যায়

(৫৯)

বন্ধুগণ,

এমনি ত গঙ্গার প্রবাহ সর্বত্র পাবন ও পবিত্র। কিন্তু হরিদ্বার, কাশী, প্রয়াগের মত স্থান অধিক পবিত্র। তাহা সমস্ত সংসারকে পবিত্র করিয়া দিয়াছে। ভগবদ্‌গীতার সম্বন্ধেও সেই কথা। ভগবদ্‌গীতা আরম্ভ হইতে অন্ত পর্যন্ত সর্বত্রই পবিত্র। কিন্তু মধ্যস্থলের কয়েকটি অধ্যায় তীর্থক্ষেত্র হইয়া গিয়াছে। যে অধ্যায়ের আজ আলোচনা করা হইবে তাহা অতি পবিত্র, তীর্থস্বরূপ। স্বয়ং ভগবানই এই অধ্যায়কে অমৃতধারা কহিতেছেন, "যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।" অধ্যায়টি ছোট, মাত্র বিশটি শ্লোক, কিন্তু অমৃতের ধারা। অমৃতের মত মধুর, অমৃতের মত সঞ্জীবন। এই অধ্যায়ে ভগবানের মুখ হইতে ভক্তিরসের মহিমাতত্ত্ব গীত হইয়াছে।

বস্তুত ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে ভক্তিতত্ত্ব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত জীবনশাস্ত্রের প্রতিপাদন হইয়াছে। স্বধর্মাচরণরূপ কর্ম, তার সহায়ক মানসিক সাধনরূপ বিকর্ম, এই দুই সাধনের দ্বারা সম্পূর্ণ কর্ম-ভস্মকারী অন্তিম অকর্মের ভিত্তি—এ সবের বিচার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে করা হইয়াছে। এখানে জীবনশাস্ত্র সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরে এক অর্থে ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত ভক্তিতত্ত্বের বিচার চলিয়াছে। একাগ্রতা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। চিত্তের একাগ্রতা কিভাবে হইতে পারে, তাহার সাধন কি কি, চিত্তের একাগ্রতার আবশ্যকতা কোথায়, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহা বলা হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে সমগ্রতার কথা বলা হইয়াছে। একাগ্রতা হইতে সমগ্রতা পর্যন্ত দীর্ঘপথ আমরা কিভাবে আসিয়াছি তাহা এখন দেখিয়া লওয়া যাক।

আরম্ভ হইয়াছে চিত্তের একাগ্রতা হইতে। একাগ্রতা সিদ্ধ হইলে পর মানুষ যে কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে পারে। চিত্তের একাগ্রতার

উপযোগ আমার প্রিয় বিষয় গণিতের অধ্যয়নে করা যাইতে পারে। ফল লাভ অবশ্যই হইবে। কিন্তু তাহা চিত্তের একাগ্রতার সর্বোত্তম সাধ্য নহে; গণিতের অধ্যয়ন হইতে একাগ্রতার পূর্ণ পরীক্ষা হয় না। গণিতে বা তদ্রূপ কোন জ্ঞানের ক্ষেত্রে চিত্তের একাগ্রতা হইতে সফলতা ত মিলিবে। কিন্তু যথার্থ পরীক্ষা তাহা নহে। তাই সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে ভগবৎ চরণে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া দরকার। ভগবানের চরণে চিত্ত সতত একাগ্র থাকে, আমাদের বাণী, কান, চক্ষু, সতত তাঁর চরণে নিবদ্ধ থাকে, আমরণ সে চেষ্টা করা চাই একথা অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সমূহকে ইহাতে অভ্যস্ত করিতে হইবে। "অভ্যাস জন্মেছে ইন্দ্রিয়ের যবে। ভাবনা আর কিছু নাইকো এবে॥"—এরূপ হওয়া চাই। ইন্দ্রিয় সকলের ভগবানে মজা চাই। পাশে বিলাপ করুক বা ভজন গান করুক, বাসনার জালই বুনুক অথবা বিষয় বিরাগী সাধু-সজ্জনের সমাগমই হোক, সূর্য উঠুক বা অন্ধকার ঘেরুক, মরণকালে পরমেশ্বর চিত্তে বিরাজ করিবেন, ইন্দ্রিয়সমূহকে চিরজীবন এইরূপ অভ্যস্ত করিবার নিত্যযোগের শিক্ষা অষ্টম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে একাগ্রতা, সপ্তমে ঈশ্বরাভিমুখী একাগ্রতা অর্থাৎ 'প্রপত্তি', অষ্টমে সাতত্যযোগ, নবমে সমর্পণতা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। দশমে ক্রমিকতা দেখান হইয়াছে। এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া ঈশ্বরের রূপ কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, পিঁপড়া হইতে ব্রহ্মদেবে ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে আত্মসাৎ করা যায় তাহা বলা হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে সমগ্রতা দেখান হইয়াছে। বিশ্বরূপ দর্শনকেই আমি সমগ্রতাযোগ বলি। বিশ্বরূপ দর্শন মানে সামান্য ধূলিকণাতেও সমগ্র বিশ্ব ভরা রহিয়াছে এই অনুভব। ইহাই বিরাট-দর্শন। ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তিরসকে এইভাবে বিভিন্ন চালুনিতে চালা হইয়াছে।

(৬০)

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিতত্ত্বের সমাপ্তি করিতে হইবে। অর্জুন সমাপ্তি-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। জীবনবিষয়ক সমগ্র শাস্ত্রের বিচার সমাপ্ত হইলে পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুন যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন এখানেও

তেমন প্রশ্ন করিলেন। অর্জুন প্রশ্ন করিলেন, "কেহ বা সগুণের ভজনা করে, আবার কেহ বা নির্গুণের উপাসনা করে। এ দুয়ের মধ্যে কে আপনার প্রিয়?"

ভগবান কি উত্তর দেন? এ যেন কোন মাকে তাহার দুই ছেলের সম্বন্ধে প্রশ্ন করার মত। দুইয়ের একটি শিশু। মা ছাড়া সে কিছু জানে না। মাকে দেখিলেই তার আনন্দ। চক্ষের আড়াল হইলেই সে ব্যাকুল। মার কাছ হইতে দূরে সে থাকিতে পারে না। মাকে ছাড়িতে পারে না। মা নাই ত সংসার তার কাছে শূন্য। এমনই এই শিশু। অপরটি বড়। সেও তেমনি প্রেমভাবে ভরপুর, কিন্তু সমঝদার হইয়াছে। মার কাছ হইতে সে দূরে থাকিতে পারে। ছয় মাস, এক বছর মাকে না দেখিয়াও সে থাকিতে পারে। মার সে সেবা করে। সকল দায়িত্ব মাথায় লইয়া কাজ করে। কাজেকর্মে থাকিলে মায়ের বিয়োগ-ব্যথা সহ্য হয়। লোকের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এবং চারিদিকে তাহার নাম হইতেছে দেখিয়া মা খুশি। এইরূপ হইতেছে দ্বিতীয় পুত্র। এইরূপ দুই ছেলের মাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন ত তিনি কি উত্তর দিবেন? আপনি তাঁহাকে বলিলেন, "মা, দু'জনের এক-জনকে আপনাকে দেওয়া হবে, বলুন কাকে চাই?" মাতা কি উত্তর দিবেন? কোন্ ছেলেকে তিনি পছন্দ করিবেন? দাঁড়িপাল্লায় কি তিনি তাহাদের ওজন করিতে যাইবেন? মায়ের মন দিয়া দেখুন। তাহার স্বাভাবিক উত্তর কি হইবে? "বিয়োগ যদি সইতেই হয় ত বড় ছেলেরই সইব।" বেচারী মা ইহাই বলিবেন। ছোট ছেলেকে তিনি বুকে ধরিয়াছেন। তিনি তাহাকে নিজের কাছ ছাড়া করিবেন না। ছোটর প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ দেখা যাইবে এবং বড় গেলে তবুও চলিবে এইরূপ কোন উত্তর তিনি দিবেন। কিন্তু অধিক প্রিয় কে এ প্রশ্নের উত্তর ইহাকে বলা যাইবে না। কিছু একটা বলিতে হয় বলিয়া, তাঁহার মুখ হইতে দুই-চারিটি শব্দ বাহির হইয়া গেল। কিন্তু ঐ শব্দ হইতে যদি বিশেষ অর্থ বাহির করিতে যাই ত তাহা ঠিক হইবে না।

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে মা যেমন দো-টানায় পড়েন ভগবানের মনের অবস্থাও ঠিক তেমন হইয়াছিল। অর্জুন বলিতেছেন,

"ভগবান, তোমার ভক্ত দু' রকমের। এক তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, সতত তোমার স্মরণ করে। তার চক্ষু তোমার দর্শনপিয়াসী, কান তোমার গুণগান শুনিতে উৎকর্ণ, হাত-পা তোমার সেবা, তোমার পূজা করার জন্য উদগ্রীব। এ হচ্ছে এক। অপর, স্বাবলম্বী, সতত ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারী, সর্বভূতের হিতে রত, সমাজের নিষ্কাম সেবায় দিনরাত এমন নিমগ্ন যে ভগবান তোমাকে স্মরণ করার মত ফুরসত্‌ও যেন তার নেই। এ হচ্ছে তোমার দ্বিতীয় ভক্ত। এ দু'য়ের মধ্যে কে তোমার প্রিয়? আমায় বল।" অর্জুন ভগবানের কাছে এই প্রশ্ন করিলেন। ঐ মা যেকথা বলিয়াছিলেন, ভগবান ঠিক তেমন উত্তর দিলেন, "ঐ সগুণ ভক্ত আমার প্রিয়। আর ঐ যে দ্বিতীয় সেও আমারই।" ভগবান দো-টানায় পড়িয়াছিলেন। কিছু একটা উত্তর দিতে হয় দিলেন। আর সত্য সত্য কথাও তাই। দুই ভক্তই অক্ষরে অক্ষরে একরূপ। উভয়ের যোগ্যতা একরূপ। তুলনা করিতে যাওয়া মানে তুলনার সীমা লঙ্ঘন করা। পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মের সম্বন্ধে যেরূপ প্রশ্ন অর্জুন করিয়াছিলেন ভক্তি সম্বন্ধে এখানে তদ্রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, কর্ম ও বিকর্মের সহায়তায় মনুষ্য অকর্ম দশা প্রাপ্ত হয়। ঐ অকর্মাবস্থা দুই প্রকারে প্রকাশ হয়—এক, দিনরাত কর্ম করিয়াও লেশমাত্র কর্ম না-করা, আর দুই, চব্বিশ ঘণ্টায় একটি কর্ম না করিয়াও যেন দুনিয়া তোলপাড় করা। অকর্ম দশার প্রকাশ এই দুই রূপে হয়। ইহাদের তুলনা করুন। একই বলের দুই দিক। তাদের তুলনা কিরূপে করা যায়? দুই দিকই সমান, দুই দিকই একরূপ। অকর্মাবস্থার বিবেচনা করিতে গিয়া ভগবান একেকে বলিয়াছেন সন্ন্যাস, অপরকে বলিয়াছেন যোগ। শব্দ দুই কিন্তু অর্থ একই। সন্ন্যাস ও যোগ এ দুইয়ের মীমাংসা শেষটায় সরলতার সুগমতার দিক হইতে করিয়াছেন। সগুণ-নির্গুণের প্রশ্নও তদ্রূপ। সগুণ ভক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমেশ্বরের সেবা করে। দ্বিতীয়, নির্গুণ ভক্ত মন দিয়া বিশ্বের হিত চিন্তা করে। প্রথমোক্ত বাহ্য সেবায় মগ্ন আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভিতরে তাহার অনুক্ষণ চিন্তা চলিতে থাকে। দ্বিতীয়কে প্রত্যক্ষ কোন সেবা করিতে দেখা যায় না। কিন্তু তাহার অন্তরে মহাসেবা চলিতেছে। এই দুই প্রকার ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? দিনরাত

কর্ম করিয়াও যে লেশমাত্র কর্ম করে না সে সগুণ ভক্ত। নির্গুণ উপাসক অন্তরে সকলের হিতের কথা চিন্তা করে। অন্তরে এই দুই ভক্ত একই রূপ। ভ্রমবশতঃ বাহিরে ভিন্ন দেখা যায়। উভয়েই সমান। উভয়েই ভগবানের প্রিয়। কিন্তু সগুণ ভক্তি অধিক সুলভ। যে উত্তর পঞ্চম অধ্যায়ে দিয়াছেন এখনও সেই উত্তরই দিলেন।

(৬১)

সগুণ-ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কাজ করাইয়া লওয়া যায়। ইন্দ্রিয়সমূহ সাধন, বিঘ্ন বা দুই-ই হইতে পারে। তারা মারক আবার তারকও—যে যেমন দেখে। মনে কর কাহারও মা মৃত্যুশয্যায়। ছেলে তাকে দেখিতে যাইবে। পনর মাইল পথ। রাস্তা মোটর চলার যোগ্য নয়। পায়ে-হাঁটা ভাঙ্গা-চোরা পথ। এই অবস্থায় ঐ পথ সাধন কি বিঘ্ন? এক জন বলিবে, "কি বিশ্রী এ রাস্তা। অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। নয়ত কখন গিয়ে পৌঁছতাম মার কাছে।" এরূপ মানুষের কাছে ঐ রাস্তা শত্রু। না চলিলে নয় তাই সে চলে। রাস্তাকে সে অভিশাপ দেয়। যাহাই হোক মাকে দেখিতে হইলে দ্রুতপদে তাহাকে যাইতেই হইবে। রাস্তাকে শত্রু মনে করিয়া সে যদি মাটিতে বসিয়া যায় ত শত্রু বলিয়া বিবেচিত রাস্তার জয় হইবে। কেবল দ্রুত চলিয়াই সে শত্রুকে হারাইতে পারে। অন্য জন বলিবে, "এমন জঙ্গল তবুও চলবার মত পথ আছে। রাস্তা ভাল। এ আমায় মার কাছে পৌঁছে দেবে। এ রাস্তা না থাকলে ত পাহাড় পেরোতে হত? কি করে যেতাম?" একথা সে বলে আর ঐ পথকে সাধন মনে করিয়া দ্রুত সে চলে। রাস্তার সম্বন্ধে তাহার মনে সন্তোষের ভাব। তার কাছে তাহা মিত্র। রাস্তাকে শত্রু বা মিত্র, বিঘ্ন বা সহায়, যাহাই মনে কর, দ্রুত পা ফেলিয়া তোমাকে ত চলিতেই হইবে। রাস্তা বিঘ্নরূপ কিংবা সাধনরূপ তাহা নির্ভর করে মনের অবস্থা ও দৃষ্টির উপর। ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও ঐ কথা। তাহা বিঘ্নরূপ কি সাধনরূপ তাহা তোমার দৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

সগুণ উপাসকের পক্ষে ইন্দ্রিয়সমূহ সাধনস্বরূপ। ইন্দ্রিয়গুলি

যেন ফুল। তাহা পরমাত্মাকে নিবেদন করার জন্য। চোখ দিয়া হরির রূপ দেখে, কানে হরিকথা শোনে, জিভে হরিনাম করে, পায়ে তীর্থযাত্রা করে, হাতে সেবাকার্য করে, এভাবে সকল ইন্দ্রিয় সে পরমেশ্বরকে অর্পণ করে। ইন্দ্রিয়সমূহ তখন আর ভোগের সাধন নয়। ফুল ভগবানকে নিবেদন করার জন্য। ফুলের মালা নিজ গলায় পরার জন্য নয়। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যবহার ঈশ্বরের সেবার জন্য করিতে হইবে। ইহাই সগুণোপাসকের দৃষ্টি। কিন্তু নির্গুণোপাসকের কাছে ইন্দ্রিয়সমূহ বিষস্বরূপ মনে হয়। উহাদের সে বন্দী করে, সংযমে বাঁধে, খোরাক বন্ধ করিয়া দেয়। উহাদের উপর পাহারা বসায়। সগুণোপাসকের তাহা করিতে হয় না। সে ইন্দ্রিয়সমূহকে হরিচরণে অর্পণ করে। দুইটিই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বিধি। দুইটিই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের পথ। যেটিকেই আশ্রয় কর, ইন্দ্রিয়কে নিজ বশে রাখিতে হইবে। ধ্যেয় একই। ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ে ঘুরপাক খাইতে দিতে নাই। এক পথ সহজ, অন্য পথ কঠিন।

নির্গুণ উপাসক সর্বভূতহিতে রত, ইহা সাধারণ কথা নয়। সারা বিশ্বের কল্যাণ করিতে হইবে একথা বলা সহজ, করা অতি কঠিন। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ-চিন্তা যাহার চিত্তে, সে তাহা ছাড়া আর কিছু করিতে পারে না। তাই নির্গুণ উপাসনা কঠিন। সগুণ উপাসনা নিজ নিজ শক্তি অনুসারে নানাভাবে করা যায়। যেখানে আমাদের জন্ম হইয়াছে সেই ক্ষুদ্র গ্রামের সেবা করা কিংবা মা-বাপের সেবা করা সগুণ পূজা। দেখিতে হইবে তোমার ঐ সেবা বিশ্বহিতের বিরোধী না হয়। যত ছোট আকারেই সেবা কর না কেন, অপরের হিতের ঘাতক না হইলে, তাহা ভক্তির পর্যায়ে অবশ্য পৌঁছিয়া যাইবে। অন্যথায় সে সেবা হইবে আসক্তি। মা-বাপ, বন্ধু-বান্ধব, সাধু-সন্ত, পরমেশ্বর জ্ঞানে ইঁহাদের সেবা করিতে হইবে। ইঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে পরমেশ্বরের মূর্তি কল্পনা করিয়া সন্তোষ মানিতে হইবে। এই সগুণ পূজা সহজ। নির্গুণ পূজা কঠিন। অন্য সব বিষয়ে দুইয়েরই অর্থ এক। সুলভতার দৃষ্টিতে সগুণ শ্রেষ্ঠ। বস্, এই মাত্র।

সুলভতা এক দিক। আর এক দিকও আছে। নির্গুণে ভয় আছে। নির্গুণ জ্ঞানময়। সগুণ প্রেমময়, ভাবনাময়। সগুণে আর্দ্রতা

আছে। ভক্তি তাহাতে অধিক সুরক্ষিত। নির্গুণে কিছুটা ভয় আছে। এক সময়ে জ্ঞানের উপর আমার অধিক ভর ছিল। কিন্তু এখন আমার অনুভব হইয়াছে যে কেবল জ্ঞান দ্বারা আমার কাজ চলিবে না। মনের স্থূল ময়লা জ্ঞানে পুড়িয়া ছাই হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম ময়লা দূর করার শক্তি জ্ঞানে নাই। স্বাবলম্বন, বিচার, বিবেক, অভ্যাস, বৈরাগ্য—এ সকল সাধনের আশ্রয় লওয়া সত্ত্বেও মনের সূক্ষ্ম ময়লা মুছিয়া ফেলা যাইবে না। ভক্তির জল ছাড়া এই ময়লা ধোয়া যায় না। এই শক্তি ভক্তি-জলে আছে। পরাবলম্বন ইহাকে বলিতে হয় বল। কিন্তু 'পর'-এর অর্থ 'অপর' না করিয়া 'সেই শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা'র অবলম্বন কর। পরমাত্মাতে আশ্রয় লওয়া ব্যতীত চিত্তের ময়লা নষ্ট হইবার নয়।

কেহ কেহ বলিবেন, "জ্ঞান শব্দের অর্থ এখানে সংকুচিত করা হয়েছে। জ্ঞানের দ্বারা চিত্তের ময়লা যদি ধোয়া না যায় ত জ্ঞান নিম্নস্তরের সাব্যস্ত হয়।" এ অভিযোগ আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমি বলিতে চাই যে এই মাটির পুতুলে শুদ্ধ জ্ঞান হওয়া কঠিন। এই দেহ-পিঞ্জরে উৎপন্ন জ্ঞান সে যতই শুদ্ধরূপ হোক না কেন, তবুও কিছুটা অপূর্ণ ত থাকিবেই। দেহে উৎপন্ন জ্ঞানের শক্তি সীমাবদ্ধ হইবেই। জ্ঞানের উদয় হইলে সকল ময়লা ভস্ম করিয়া ফেলার শক্তি জ্ঞানে আছে। কিন্তু এই বিকারী দেহস্থিত যে জ্ঞান তার তেজ কম। তাই তাহা দ্বারা সূক্ষ্ম ময়লা দূর করা যায় না। ভক্তির আশ্রয় লওয়া ছাড়া সূক্ষ্ম ময়লা সাফ্ করার উপায় নাই। তাই ভক্তিতে মানুষ অধিক সুরক্ষিত। এখানে 'অধিক' শব্দটি আমি জুড়িয়া দিতেছি। সগুণ ভক্তি সুলভ। ইহাতে ঈশ্বরাবলম্বন আছে। নির্গুণে স্বাবলম্বন রহিয়াছে। ইহাতে 'স্ব'-এর অর্থই বা কি? স্বাবলম্বন মানে নিজ অন্তঃকরণস্থিত পরমাত্মার অবলম্বন—ইহাই স্বাবলম্বনের অর্থ। কেবল বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হইয়াছে এরূপ লোক দেখা যায় না। স্বাবলম্বন দ্বারা অর্থাৎ অন্তঃকরণস্থিত আত্ম-জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ হইবে। সারাংশ, নির্গুণ ভক্তির স্বাবলম্বনের আধারও এই আত্মা।

(৬২)

আমি যেমন সগুণের পাল্লায় সুলভতা ও সুরক্ষিততারূপ বাটখারা চাপাইয়াছি, নির্গুণের বেলায়ও তেমনি চাপাইতে পারি। নির্গুণ এক সীমায় নিবন্ধ। উদাহরণার্থ, ভিন্ন ভিন্ন কর্মের জন্য, সেবার জন্য আমরা সংস্থার প্রতিষ্ঠা করি। সংস্থা স্থাপিত হয় ব্যক্তি কর্তৃক। সে ব্যক্তি উহার মুখ্য আধার। প্রথমে সংস্থা ব্যক্তিনিষ্ঠ থাকে। কিন্তু বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিনিষ্ঠ হইতে উহাকে তত্ত্বনিষ্ঠ হইতে হইবে। এরূপ তত্ত্বনিষ্ঠা যদি উহাতে না আসে প্রেরণাদানকারী ব্যক্তির অভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে সংস্থা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। আমার প্রিয় উদাহরণ দিতেছি। চরখার মাল ছিঁড়িয়া গেলে সুতা কাটা ত বন্ধ হয়ই, সুতা গুটাইতে চাহিলেও গুটান যায় না। ব্যক্তির অবলম্বন চলিয়া গেলে সংস্থারও তদ্রূপ দশা হয়। সংস্থা অনাথ হইয়া যায়। ব্যক্তিনিষ্ঠা হইতে তত্ত্বনিষ্ঠা উৎপন্ন হইলে তাহা হয় না। নির্গুণের সহায়তা সগুণের চাই। কোন না কোন দিন ব্যক্তি হইতে, আকার হইতে বাহির হইয়া আসার শিক্ষা লইতেই হইবে। হিমালয় হইতে, শংকরের জটাজুট হইতে, গংগা নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু সেখানেই থাকে নাই। সেই জটাজুট হইতে বাহির হইয়া, হিমালয়ের সেই গুহা-গহ্বর, উপত্যকা-অধিত্যকা ছাড়িয়া, বন-জংগল পার হইয়া সমতলভূমিতে যখন কলকল, ছলছল করিয়া বহিতে লাগিল তখন না গংগা বিশ্বজনের কাজে লাগিয়াছে। তদ্রূপ ব্যক্তির আধার নষ্ট হইলেও তত্ত্বের স্তম্ভরূপ অবলম্বরেন উপর দাঁড়াইয়া থাকার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বাড়ী তৈরির সময় ঠেক দিতে হয়। কিন্তু পরে তাহা দূর করিতে হয়। ঠেক অপসারণের পরে যদি দেখা যায় যে গাঁথুনি ঠিক আছে তবে বোঝা যাইবে যে আধার ঠিক ছিল। স্ফূর্তির প্রবাহের উৎপত্তি যদি আগে সগুণ হইতে হয় ত ভাল। কিন্তু অন্তিম পরিপূর্ণতা তত্ত্বনিষ্ঠায়, নির্গুণে হওয়া চাই। ভক্তির উদর হইতে জ্ঞানের উদম হওয়া চাই। ভক্তির লতায় জ্ঞানের ফুল ফোটা চাই।

বুদ্ধদেব একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি তিন প্রকার নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। প্রথমে ব্যক্তিনিষ্ঠা, পরে তাহা হইতে তত্ত্বনিষ্ঠা আর তত্ত্বনিষ্ঠা যদি সরাসরি না আসে ত নিদানপক্ষে সংঘনিষ্ঠা উৎপন্ন হওয়া

চাই। যে আদর এক ব্যক্তির প্রতি ছিল তাহা দশ-পনর ব্যক্তির প্রতি হওয়া চাই। সংঘের প্রতি যদি সাম্প্রদায়িক টান না থাকে তবে পরস্পরের মধ্যে খটাখটি, ঝগড়া-ঝাটি দেখা দিবে। ব্যক্তি-শরণতা লোপ পাইয়া সংঘ-শরণতা আসা চাই। এবং পরে সিদ্ধান্ত-শরণতা আসা চাই। তাই বৌদ্ধধর্মে

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। সংঘং শরণং গচ্ছামি।
ধম্মং শরণং গচ্ছামি।"

এরূপ তিন প্রকারের শরণাগতির কথা বলা হইয়াছে। প্রথমে ব্যক্তির প্রতি প্রীতি। তারপরে সংঘের প্রতি প্রীতি। কিন্তু এই দুই নিষ্ঠাই দুর্বল। অন্তে সিদ্ধান্তনিষ্ঠা উৎপন্ন হওয়া চাই। তবেই সংস্থা স্থায়ী হইবে, ফলপ্রসূ হইবে। প্রেরণার উৎস-ধারার উৎপত্তি সগুণে হইলেও নির্গুণ-সাগরে গিয়া তার মেশা চাই। নির্গুণের অভাবে সগুণই সদোষ হইয়া যায়। নির্গুণের সীমাবদ্ধতা সগুণকে সমতুল রাখে। তার জন্য সগুণ নির্গুণের কাছে ঋণী।

হিন্দু, খৃস্টান, ইসলাম আদি সকল ধর্মে কোন না কোন আকারে মূর্তিপূজা প্রচলিত আছে। মূর্তিপূজা নিম্নস্তরের বলিয়া পরি-গণিত, তবু তাহা মান্য হইয়া গিয়াছে, আর তাহা মহানও বটে। কিন্তু মূর্তিপূজা যতক্ষণ নির্গুণের সীমায় থাকে ততক্ষণ তাহা নির্দোষ। সীমা লংঘন করিলেই সগুণ সদোষ হইয়া যায়। নির্গুণের সীমা লংঘন করিয়া সকল ধর্মের 'সগুণ' অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্বে যাগ-যজ্ঞে পশুহত্যা হইত। শক্তিদেবীর কাছে আজও বলি দেওয়া হয়। ইহা মূর্তিপূজার অত্যাচার। মূর্তিপূজা সীমা ছাড়াইয়া ভুল পথে চলিয়াছে। কিন্তু নির্গুণনিষ্ঠার সীমা যদি রক্ষিত হয় তবে ভয় থাকে না।

(৬৩)

সগুণ সুলভ ও সুরক্ষিত। কিন্তু সগুণের পক্ষে নির্গুণের আবশ্যকতা রহিয়াছে। সগুণের বিকাশ হইতে হইতে তাহাতে নির্গুণের, তত্ত্বনিষ্ঠার ফুল ফোটা চাই। নির্গুণ ও সগুণ পরস্পর পরস্পরের পূরক, বিরোধী নহে। সগুণ হইতে নির্গুণ গন্তব্যে পৌঁছিতে হইবে আর নির্গুণেরও

চিত্তের সূক্ষ্ম ময়লা ধোয়ার জন্য সগুণের আর্দ্রতা চাই। একটি আর একটির শোভা। এই দুই প্রকারের ভক্তি রামায়ণে অতি সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে এই ভক্তির প্রকারভেদ দেখা যায়। এই দুই ভক্তির বিস্তার রামায়ণে আছে। ভরতের ভক্তি প্রথম প্রকারের আর লক্ষ্মণের ভক্তি দ্বিতীয় প্রকারের। এই দুই উদাহরণ হইতে সগুণ-ভক্তি ও নির্গুণ-ভক্তির স্বরূপ বুঝা যাইবে।

বনবাসে যাওয়ার সময়ে রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইতে চান নাই। লক্ষ্মণকে সঙ্গে লওয়ার কোন কারণ রাম দেখিতে পান নাই। লক্ষ্মণকে তিনি বলিলেন, "লক্ষ্মণ, আমি বনে যাচ্ছি। বাবার আদেশ। তুমি বাড়ী থাক। আমার সঙ্গী হয়ে মা-বাবার দুঃখ বাড়িও না। মা-বাবা ও প্রজাদের সেবা কর। তাঁদের কাছে তুমি থাক ত আমি নিশ্চিন্ত থাকব। আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। বনে যাচ্ছি। তার মানে এ নয় যে আমি বিপদে পড়ছি। ঋষিদের আশ্রমে আমি যাচ্ছি।" রামচন্দ্র এভাবে লক্ষ্মণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ এক শব্দে রামের সব কথা ঝট্ করিয়া উড়াইয়া দিলেন। এক ঘায়ে দুই টুকরা করিলেন। তুলসীদাস ইহার দিব্য চিত্র আঁকিয়াছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, "তুমি আমায় উৎকৃষ্ট নিগম-নীতি বললে। এ নীতি অনুসারে আমার বস্তুত চলাও উচিত। কিন্তু রাজনীতির এ বোঝা বহন করা আমার সাধ্যের অতীত। তোমার প্রতিনিধি হওয়ার শক্তি আমার নাই। আমি বালক।

"দীন্‌হি মোহি সিখ নীকি গোসাঁঈ।
লাগি অগম অপনী কদরাঈ॥
নরবর ধীর ধরম-ধুর-ধারী।
নিগম-নীতিকে তে অধিকারী॥
ম্যঁয় সিসু প্রভু-সনেহ-প্রতিপালা।
মন্দরু মেরু কি লেহি' মরালা॥

হংস কি মেরুমন্দরের ভার তুলিতে পারে? রামচন্দ্র, আমি তোমার স্নেহে প্রতিপালিত হয়ে এসেছি। তোমার ঐ রাজনীতি অন্যকে বল। আমি শিশু।" ইহা বলিয়া লক্ষ্মণ সে সব ঝট্ করিয়া খণ্ডন করিলেন।

মাছ জল ছাড়া থাকিতে পারে না। লক্ষ্মণের অবস্থাও সেইরূপ। রাম হইতে দূরে থাকার শক্তি তাঁহার ছিল না। তাঁহার রোমে-রোমে সহানুভূতি ব্যাপ্ত ছিল। রাম ঘুমান। তিনি জাগিয়া থাকেন, সেবা করেন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। আমাদের লক্ষ্য করিয়া কেহ ঢিল ছোঁড়ে ত হাত সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তাহা ঠেকায়। লক্ষ্মণ ছিলেন রামের সেরূপ হাত। রামের উপর আঘাত আসে ত আগাইয়া আসিয়া লক্ষ্মণ তাহা সামলান। লক্ষ্মণের প্রসঙ্গে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলসীদাস দিয়াছেন। পতাকা ঐ উড়িতেছে। গান-বন্দনা সবই ঐ পতাকার। উহার রং বর্ণনা করা হয়। আকার ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সিধা খাড়া ঐ দণ্ডের কথা কে বলে? রামের খ্যাতিরূপ যে পতাকা উড়িতেছে লক্ষ্মণ ছিলেন তার দন্ডরূপ অবলম্বন। সোজা, একেবারে সোজা খাড়া ছিলেন। পতাকা-দণ্ডের নত হইতে নাই। রামের খ্যাতিরূপ পতাকা-দণ্ড লক্ষ্মণও কখন নোয়ান নাই। খ্যাতি কাহার? রামের। জগৎ পতাকাকেই দেখে, দণ্ডকে দেখে না। শিখর দেখে, পাদদেশে দেখে না। রামের যশ ছড়াইতেছে, লক্ষ্মণের পাত্তাই নাই। চৌদ্দ বছর এই দণ্ড অবনমিত হয় নাই। নিজে পেছনে থাকিয়া রামের খ্যাতি সে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছে। দুরূহ দুরূহ বড় কাজ রাম লক্ষ্মণকে দিয়া করাইয়াছেন। সীতাকে বনে রাখিয়া আসার কাজ শেষটায় লক্ষ্মণের উপর দেওয়া হইয়াছিল। বেচারা লক্ষ্মণ সীতাকে বনে রাখিয়া আসিলেন। স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই লক্ষ্মণের ছিল না। তিনি হইয়া গিয়াছিলেন রামের চোখ, রামের হাত-পা, রামের মন। নদী চলে সমুদ্রে মেশার জন্য। লক্ষ্মণ তেমনি রামে মিশিয়া গিয়াছিলেন। তিনি রামের ছায়া হইয়া গিয়াছিলেন। লক্ষ্মণের ভক্তি ছিল সগুণ।

ভরত ছিলেন নির্গুণ ভক্তির অনুসরণকারী। তাঁরও সুন্দর ছবি তুলসীদাস আঁকিয়াছেন। রামের বনে গমনের সময়ে ভরত অযোধ্যায় ছিলেন না। ভরত আসিলেন। তার আগেই দশরথের মৃত্যু হইয়াছিল। গুরু বশিষ্ঠ তাঁহাকে রাজকার্য পরিচালনা করিতে বলিলেন। ভরত বলিলেন, "রামের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে।" রামের সহিত দেখা করার জন্য তিনি ভিতরে-ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। কিন্তু সে অবস্থায়ও তিনি

রাজকার্যের বিধি-ব্যবস্থা করিতেছিলেন। রাজ্য রামেরই আর তার ব্যবস্থা করাও রামেরই কাজ করা, ইহাই ছিল তাঁহার ভাবনা। সব সম্পত্তি মালিকের। তার ব্যবস্থা করাই আমার কর্তব্য এরূপ তিনি মনে করিলেন। লক্ষ্মণের মত ভরতের মুক্ত হওয়ার জো ছিল না। এই ছিল ভরতের অবস্থা। রামে ভক্তি মানে রামের কাজ করা। নয়ত সে ভক্তি কি কাজের? সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ভরত রামের সহিত দেখা করার জন্য বনে গেলেন। "রাম, এ রাজ্য তোমার। তুমি......" এটুকু বলিতেই রাম তাঁহাকে বলিলেন, "ভরত, তুমিই রাজত্ব কর।" ভরত সসংকোচে দাঁড়াইলেন ও বলিলেন, "তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য।" রামের কথা মান্য। ভরত সব কিছু রামে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফিরিয়া গেলেন। রাজকাজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু মজা দেখুন। অযোধ্যা হইতে দুই মাইল দূরে ভরত তপস্যা করিতেন। তপস্বী থাকিয়া রাজ্য চালাইতেন। অবশেষে রাম যখন ভরতের কাছে উপস্থিত হইলেন, তখন ঠাহর করা কঠিন ছিল কে বস্তুত বনবাসী তপস্বী, রাম না ভরত। আকৃতি উভয়ের এক, ব্যবধান কেবল বয়সের। চোখেমুখে সেই তপস্যার ছাপ। দুইয়ের কাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না কে রাম আর কে ভরত। এই চিত্র যদি কেহ আঁকিত ত তাহা কতই না মধুর চিত্র হইত! ভরত দেহে রামের কাছ হইতে দূরে ছিলেন। কিন্তু মনে রামের কাছ হইতে ক্ষণিকের জন্যও দূরে ছিলেন না। যদ্যপি এক দিকে রাজকাজ করিয়া যাইতেছিলেন তথাপি মনে তিনি রামের পাশেই ছিলেন। নির্গুণে সগুণ-ভক্তি ঠাসা ভরা ছিল। তাঁহার মুখে বিয়োগের ভাষা আসিবে কেন? তাই ভরতে রামের বিয়োগ বোধ ছিল না। তিনি নিজ প্রভুর কাজ করিয়া যাইতেছিলেন।

যুবকদের আজকাল বলিতে শোনা যায়, "রামের নাম, রামের ভক্তি, রামের উপাসনা, এসব আমরা বুঝি না। ভগবানের কাজ আমরা করব।" ভগবানের কাজ কিরূপে করিতে হয় তাহা দেখাইয়াছেন ভরত। ভগবানের কাজ করিয়া ভরত বিয়োগ হজম করিয়াছিলেন। ভগবানের কাজ করিতে করিতে ভগবানের বিয়োগ অনুভব করার সময় না পাওয়া এক কথা, আর ভগবানের ধার যারা ধারে না তাহাদের বুলি অন্য রকম। ভগবানের কার্য

করিতে করিতে সংযমপূর্ণ জীবন যাপন করা অতি দুর্লভ জিনিষ। ভরতের যদিও নির্গুণে বুদ্ধিতে কাজ করার বৃত্তি ছিল, তথাপি সগুণের আধার সেখানে অটুট ছিল। "প্রভু রাম, তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য। তোমার কোন কথায় আমার সংশয় নাই", ইহা বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন ত ভরত পিছনে ফিরিলেন আর রামকে বলিলেন, "রাম, সমাধান ত হল না, কোথাও যেন একটু খট্কা বাধছে।" রাম বুঝিলেন ও বলিলেন, "এ পাদুকা নিয়ে যাও।" শেষ পর্যন্ত সগুণের আদর থাকিলই। নির্গুণকে শেষ পর্যন্ত সগুণ আর্দ্র করিয়া দিল। ঐ পাদুকাতে লক্ষ্মণের সমাধান হইত না। তাঁহার দৃষ্টিতে তাহা হইত দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটানোর মত। ভরতের ভূমিকা ছিল অন্যরূপ। বাহ্যত তিনি দূরে থাকিয়া কার্য করিতেছিলেন কিন্তু মনে ছিলেন রামময়। রামের কাজ করাকেই ভরত রামভক্তি মনে করিতেন। তবু পাদুকার আবশ্যকতা তিনি খুব অনুভব করিয়াছিলেন। ঐ পাদুকা না হইলে রাজকার্য তিনি চালাইতে পারিতেন না। ঐ পাদুকার আজ্ঞা জ্ঞানে তিনি কর্তব্য করিয়া যাইতেছিলেন। লক্ষ্মণ যেমন রামের ভক্ত ছিলেন, ভরতও তেমন রামের ভক্ত ছিলেন। বাহ্যত দুইয়ের ভূমিকা আলাদা। ভরত কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, তত্ত্বনিষ্ঠ ছিলেন। তবুও তাঁহার তত্ত্বনিষ্ঠার পক্ষে পাদুকার আর্দ্রতা আবশ্যক মনে হইয়াছিল।

(৬৪)

হরিভক্তিরূপ আর্দ্রতা অবশ্য থাকা চাই। তাই ত ভগবান অর্জুনকে বার বার বলিতেছেন, "'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ'—অর্জুন আমাতে আসক্ত থাক, আমার আর্দ্রতার আশ্রয় লও আর তারপর আমার কাজ কর। যে আসক্তি শব্দে ভগবদ্‌গীতার অনাদর, অরুচি, যে ভগবদ্‌গীতা পুনঃ পুনঃ বলে, অনাসক্ত থাকিয়া কর্ম কর, রাগদ্বেষ ত্যাগ করিয়া কর্ম কর, নিরপেক্ষ কর্ম কর, অনাসক্তি, নিঃসঙ্গতা যে ভগবদ্‌গীতার ধ্রুপদ ও ধুয়া, সেই ভগবদ্‌গীতাই বলে, "অর্জুন আমাতে আসক্তি রাখ।" কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ভগবানে আসক্তি রাখা অতীব উচ্চ বস্তু। তাহা কোন পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্তির মত আদৌ নহে। সগুণ ও নির্গুণ একে অন্যেতে গাঁথা।

সগুণ নির্গুণের আশ্রয় পুরাপুরি ছিন্ন করিতে পারে না, আর নির্গুণের চাই সগুণের আর্দ্রতা। যে অনুক্ষণ কর্তব্য কর্ম করে, কর্মরূপে সে পূজাই করিয়া থাকে। কিন্তু পূজাতে আর্দ্রতা থাকা চাই। "মামনুস্মর যুধ্য চ"— আমাকে স্মরণে রাখিয়া কর্ম কর। কর্ম নিজেই পূজা কিন্তু অন্তরে ভাবনা জাগ্রত থাকা চাই। যেমন তেমন ভাবে মাথায় ফুল চড়ানোই পূজা নহে। তাহাতে ভাবনা থাকা চাই। মাথায় ফুল চড়ানো এক প্রকারের পূজা, সৎ কর্মের দ্বারা পূজা করা আর এক প্রকারের। কিন্তু উভয় স্থলেই ভাবের আর্দ্রতা থাকা চাই। ভাববিহীন ফুল চড়ানো পাথরের উপর ফুল চড়ানোরই শামিল। তাই ত এই ভাবনার কথা। সগুণ ও নির্গুণ, কর্ম ও প্রীতি, জ্ঞান ও ভক্তি এই সবই একরূপ। উভয়ের অন্তিম অনুভবও একই।

উদ্ধব ও অর্জুনের কথা ধরুন। রামায়ণ হইতে সটান মহাভারতে আসিয়া গেলাম। সে অধিকার আমার আছে। কারণ রাম ও কৃষ্ণ একই রূপ। ভরত ও লক্ষ্মণ যেমন, উদ্ধব ও অর্জুন তেমন। যেখানে কৃষ্ণ সেখানে উদ্ধব আছেন। কৃষ্ণের বিয়োগ উদ্ধবের কাছে মুহূর্তের জন্যও অসহ্য। সতত তিনি কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত। কৃষ্ণ বিনা সারা সংসার তাঁহার কাছে ফিকা। অর্জুনও কৃষ্ণের সখা ছিলেন। কিন্তু তিনি থাকিতেন দূরে, দিল্লীতে। অর্জুন কৃষ্ণের কাজ করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণ দ্বারকায় আর অর্জুন হস্তিনাপুরে। এই ছিল দুইয়ের সম্বন্ধ। দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন, "উদ্ধব, আমি চললাম।" উদ্ধব বলিলেন, "আমায় সঙ্গে নেবেন না? একসঙ্গেই দু'জনে যাব।" কিন্তু কৃষ্ণ বলিলেন, "তা আমার ভাল লাগছে না। সূর্য নিজ তেজ অগ্নিতে রেখে যায়, আমার তেজ তেমনি তোমাতে রেখে যাচ্ছি।" এইরূপে ভগবান উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা করিলেন। আর উদ্ধবকে জ্ঞান দিয়া রওনা হইলেন। পরে প্রবাসে উদ্ধব মৈত্রেয় ঋষির কাছে জানিলেন যে ভগবান নিজধামে চলিয়া গিয়াছেন। উদ্ধবের মনে ঐ সংবাদের কোন ক্রিয়া হইল না। কিছুই যেন হয় নাই। "গুরু মরলো, চেলা কাঁদলো। দু'য়ের জ্ঞান ব্যর্থ হলো।" উদ্ধবের এরূপ হইল না। বিয়োগই যেন হয় নাই। জীবনভর তিনি সগুণ উপাসনা করিয়াছেন, পরমেশ্বরের কাছে থাকিয়াছেন। এখন তাঁহার নির্গুণে আনন্দ

অনুভব হইতে লাগিল। এইভাবে নির্গুণের রাস্তা তাঁহাকে ধরিতে হইল। প্রথমে সগুণ কিন্তু পরে নির্গুণ আসা চাই। তাহা ছাড়া পূর্ণতা লাভ হয় না।

অর্জুন ইহার উল্টা। কৃষ্ণ তাঁহাকে কি করিতে বলিয়াছিলেন? সকল স্ত্রীদের রক্ষার ভার তিনি অর্জুনের উপর সঁপিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে অর্জুন আসিলেন আর দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীদের লইয়া চলিলেন। রাস্তায় হিসারের কাছে পাঞ্জাবের চোরেরা তাঁহাকে লুটিয়া লইল। যে অর্জুন সে সময় একমাত্র নর বলিয়া কথিত হইতেন, শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া খ্যাত ছিলেন, পরাজয় কি জানিতেন না বলিয়া 'জয়' নামে যিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, প্রত্যক্ষ শঙ্করের সহিত যিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নতি স্বীকার করাইয়াছিলেন, সেই অর্জুন আজমীরের নিকট হইতে পালাইতে পালাইতে বাঁচিলেন। কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে কৃষ্ণবিয়োগের অতিশয় প্রভাব পড়িল। তাঁহার প্রাণই যেন উড়িয়া গেল, পড়িয়া থাকিল কেবল নিস্ত্রাণ, নিষ্প্রাণ শরীর। সারাংশ, সতত কর্মকারী, কৃষ্ণ হইতে দূরে অবস্থানকারী, নির্গুণ উপাসক অর্জুনের কাছে এই বিয়োগ অন্তে দুঃসহ হইল। তাঁহার নির্গুণ শেষ পর্যন্ত নেহাৎ অপদস্থ হইল। সর্ব কর্মও তাঁহার শেষ হইল। সারাংশ, সগুণের নির্গুণে যাইতে হয়। নির্গুণের সগুণে আসিতে হয়। একটি অপরটির পরিপূরক।

(৬৫)

অতএব, সগুণ উপাসক ও নির্গুণ উপাসক এ দুইয়ের পার্থক্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ভাষা কুণ্ঠিত হয়। সগুণ ও নির্গুণ অন্তে এক হইয়া যায়। ভক্তির ধারা প্রথমে সগুণ হইতে উৎসারিত হয় বটে কিন্তু মিশে গিয়া নির্গুণে। পুরানো কথা। ভাইকম সত্যাগ্রহ দেখিতে গিয়াছিলাম। শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান মালাবারের সন্নিকটে ভূগোলে সেকথা পড়িয়াছিলাম। মনে হইল, যে দিকে যাইতেছিলাম তারই কাছাকাছি কোথাও ভগবান শঙ্করাচার্যের 'কালড়ী' গ্রাম হইবে। সঙ্গী মালয়ালী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "এখান থেকে দশ-বার

মাইল হবে। যাবেন?" বলিলাম, "যাব না।" আমি গিয়াছিলাম সত্যাগ্রহ দেখার জন্য। অতএব পথিমধ্যে আর কোথাও যাওয়া আমার সঙ্গত মনে হইল না। ঐ গাঁ আর তখন দেখিতে যাই নাই। আজও আমার মনে হয় ঠিক কাজই আমি করিয়াছিলাম। কিন্তু রাত্রিতে যখন শুইলাম তখন ঐ কালড়ী গ্রাম আর শঙ্করাচার্যের সেই মূর্তি আমার চক্ষে ভাসিতে লাগিল। ঘুম আসিল না। সেই অনুভব আজও তেমন সুস্পষ্ট। শঙ্করাচার্যের জ্ঞানের সেই প্রভা, তাঁহার সেই দিব্য অদ্বৈতনিষ্ঠা, তাঁহার সেই অলৌকিক জ্বলন্ত বৈরাগ্য যাহা সম্মুখে প্রসারিত সংসারকে মিথ্যা গণনা করিয়াছিল, তাঁহার সেই গম্ভীর ভাষা আর তাঁহার কাছ হইতে যে অনন্ত উপকার পাইয়াছি সে সব কথা থাকিয়া থাকিয়া আমার মনে আসিতে লাগিল। রাত্রে এ সব ভাব চোখের সামনে ভাসে। নির্গুণে সগুণ কিরূপ আকণ্ঠ ভরা থাকে তাহা আমি অনুভব করিয়াছিলাম। প্রত্যক্ষ দর্শনেও এত প্রেম জন্মে না। নির্গুণেও সগুণের পরমোৎকর্ষ ঠাসা ভরা থাকে। আমি পত্র বড় একটা লিখি না। কিন্তু কোন বন্ধুকে পত্র না লিখিলেও সতত তাহার কথা মনে হয়। পত্র না লিখিলেও তাহার স্মৃতি মনের আনাচে-কানাচে ভরা থাকে। এইভাবে নির্গুণে সগুণ লুকাইয়া থাকে। সগুণ ও নির্গুণ দুইই একরূপ। প্রত্যক্ষ মূর্তি আনিয়া পূজা করা, প্রকট রূপে সেবা করা, আর অন্তরে সতত সংসারের কল্যাণ চিন্তা করিতে থাকিলেও, বাহ্যত তাহা পূজা মনে না হওয়া—এ দুইয়েরই মূল্য এক, গুরুত্ব সমান।

(৬৬)

পরিশেষে আমার বক্তব্য, সগুণ কি আর নির্গুণ কি তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা সহজ নহে। এক দৃষ্টিতে যাহা সগুণ অন্য এক দৃষ্টিতে তাহা নির্গুণ মনে হইতে পারে। সগুণের সেবা কোন পাথর আশ্রয় করিয়া করা যাইতে পারে। ঐ পাথরে ভগবান কল্পনা করিয়া লই। কিন্তু মাতাতে, সাধুতে প্রত্যক্ষ চৈতন্যের প্রকাশ রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, হৃদ্যতা প্রকট রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে পরমাত্মা আছেন একথা মনে করিয়া পূজা করি না। এই সব চৈতন্যময় লোকদের সকলেই

দেখিতে পায়। তাই তাঁহাদের সেবা করা চাই, তাই তাঁহাদের মধ্যে সগুণ পরমাত্মাকে দেখা চাই। কিন্তু তাহা না করিয়া লোকে পরমেশ্বর দেখে পাথরে। ভাল, পাথরে পরমেশ্বর দেখাও এক দিক হইতে নির্গুণের পরাকাষ্ঠা। সাধু-সন্ত, মা-বাপ, প্রতিবেশী ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, উপকার-বুদ্ধি ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সহজ। পাথরে ঈশ্বর ভাবা কঠিন। নর্মদার পাথরকে আমরা শঙ্কর জ্ঞান করি। ইহা নির্গুণ পূজা নয় ত কি? উল্টা একথাই মনে হয় যে পাথরে পরমেশ্বর কল্পনা করিব না ত করিব কোথায়? ঐ পাথরই ত ভগবানের মূর্তি হওয়ার উপযুক্ত। তাহা নির্বিকার, তাহা শান্ত। আলো-আঁধার, শীত-গ্রীষ্ম সব সময়ই ঐ পাথর একরূপ। এরূপ নির্বিকার পাথরই পরমেশ্বরের প্রতীক হওয়ার যোগ্য। মা-বাপ, জনসাধারণ, পাড়া-প্রতিবেশী ইঁহারা সকলেই বিকারযুক্ত। অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে কোন না কোন বিকার দেখা যাইবেই। অতএব পাথরের পূজা অপেক্ষা তাঁহাদের পূজা এক অর্থে কঠিন।

তাৎপর্য, সগুণ নির্গুণ একে অন্যের পূরক। সগুণ সুলভ, নির্গুণ কঠিন। কিন্তু সগুণই কঠিন আর নির্গুণই সহজ। দুইয়ের দ্বারা একই ধ্যেয় লাভ হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে যে চব্বিশ ঘণ্টা কর্ম করিয়াও কর্ম করে না, আর চব্বিশ ঘণ্টা কিছু না করিয়াও সব কিছু করে এইরূপ যোগী ও সন্ন্যাসী উভয়েই একরূপ। এখানেও ঠিক তাহাই। সগুণ কর্মদশা ও নির্গুণ সন্ন্যাসযোগ দুইই একরূপ। সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ, কি যোগ শ্রেষ্ঠ? ইহার উত্তর দিতে গিয়া ভগবান যেমন অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন, এখানেও তেমন অসুবিধায় পড়িলেন। অবশেষে সরলতার ও কঠিনতার তারতম্য দৃষ্টে উত্তর দিতে হইয়াছে। অন্যথায় কি যোগ কি সন্ন্যাস, কি সগুণ কি নির্গুণ দুইই একরূপ। পরিশেষে, ভগবান বলিতেছেন, "অর্জুন, সগুণই তুমি হও বা নির্গুণ হও, ভক্ত তোমায় হতেই হবে। পাথরের মত জড় হয়ো না।" একথা বলার পরে অবশেষে ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। অমৃত মধুর বটেই। কিন্তু উহার মাধুর্য আমরা আস্বাদ করি নাই। এ সব লক্ষণ প্রত্যক্ষ মধুর। কল্পনার এখানে দরকার নাই। এ সব লক্ষণ আমাদের

অনুভব করিতে হইবে। দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্ত-লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের মতই আমাদের নিত্য সেবন করা চাই, মনন করা চাই ও নিজ নিজ জীবনে তাহার অল্প অল্প আচরণ করিয়া পুষ্টি আহরণ করা চাই। এভাবে ধীরে ধীরে আমাদের জীবন পরমেশ্বরের কাছে লইয়া যাইতে হইবে।

রবিবার, ৮-৫-৩২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(৬৭)

বন্ধুগণ,

ব্যাসদেব নিজ জীবনের সার ভগবদ্‌গীতায় ঢালিয়া দিয়াছেন। আরও অনেক কিছু তিনি বিস্তারপূর্বক লিখিয়াছেন। মহাভারতের সংহিতা সংখ্যাই লাখ সওয়া লাখ হইবে। সংস্কৃতে 'ব্যাস' শব্দের অর্থই হইয়া গিয়াছে বিস্তার। কিন্তু ভগবদ্‌গীতায় বিস্তার করার বৃত্তি তাঁহার ছিল না। জ্যামিতিতে ইউক্লিড্ যেমন তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত দেখাইয়াছেন, গীতায় ব্যাসদেব তেমনি জীবনের উপযোগী তত্ত্বসমূহ লিখিয়া গিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতায় চর্চা বিশেষ নাই, বিস্তার নাই, বাহুল্য নাই। ইহার মুখ্য কারণ এই যে, গীতায় যে বস্তু প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা যে কেহ জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। আর প্রত্যেকে আচরণে তাহা পরীক্ষা করুক এ উদ্দেশ্যেই তাহা বলা হইয়াছে। জীবনের যাহা আবশ্যক বস্তু তার কথাই গীতায় ধরা হইয়াছে। ততটাই মাত্র তাঁহার বলার উদ্দেশ্য ছিল তাই অল্প কথায় তত্ত্ব বলিয়া তিনি সন্তোষ মানিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই সন্তোষবৃত্তিতে সত্য ও আত্মানুভবের উপর তাঁহার যে মহান্ বিশ্বাস ছিল তাহা দেখিতে পাই। যে বস্তু সত্য তার সমর্থনের জন্য বিশেষ যুক্তি দিতে হয় না।

গীতার দিকে আমরা যে তাকাইয়া থাকি তার মুখ্য কারণ এই যে জীবনে যখনই আমাদের সহায়তার আবশ্যকতা বোধ হইবে তখনই যেন গীতা হইতে তাহা আমরা পাইতে পারি। আর তাহা আমরা সদা পাইও। গীতা জীবনোপযোগী শাস্ত্র। তাই গীতায় স্বধর্মের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। স্বধর্মাচরণ মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আধার। গোটা ইমারত এই স্বধর্মাচরণ-রূপ ভিত্তিতে খাড়া করা চাই। এই ভিত্তি যত মজবুত হইবে ইমারত ততই দৃঢ় হইবে। এই স্বধর্মাচরণকে গীতা 'কর্ম' বলিয়াছে। এই স্বধর্মাচরণরূপ কর্মের আশে-পাশে অনেক বস্তু দাঁড় করান হইয়াছে। তার রক্ষার জন্য বহু

বিকর্ম রচনা করা হইয়াছে। স্বধর্মাচরণকে কার্যোপযোগী করার জন্য, সাজাইয়া সুন্দর করার জন্য, সফল করার জন্য যে সব সহায়তা দরকার সে সব সহায়তা, সে সব অবলম্বন স্বধর্মাচরণরূপ কর্মকে দিতেই হইবে। তাই এ পর্যন্ত বহু জিনিষ আমরা দেখিয়াছি। তার বেশীর ভাগ ছিল ভক্তিরূপে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আজ যে কথার আলোচনা করিব স্বধর্মাচরণের পক্ষে তাহা খুবই উপযোগী। বস্তুটি বিচারমুখী।

স্বধর্মাচরণকারীকে ফলত্যাগ করিতে হইবে, গীতার সর্বত্র এই মুখ্য কথার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কর্ম কর, আর তার ফল ছাড়। গাছে জল দিবে, দেখাশুনা করিবে কিন্তু নিজে তার ছায়ার, ফলফুলের প্রত্যাশা রাখিবে না। ইহাই হইতেছে স্বধর্মাচরণরূপ কর্মযোগ। কর্মযোগ মানে কেবল কর্ম নহে। সৃষ্টির সর্বত্র ত কর্ম চলিতেছেই। তাহা বলার দরকার নাই। কিন্তু স্বধর্মাচরণরূপ কর্ম—গতানুগতিক কর্ম নয়—উত্তমরূপে করিয়া তার ফল ত্যাগ করিবে একথা বলিতে সহজ, শুনিতে সহজ কিন্তু আচরণ করা কঠিন। কারণ বস্তুত ফলবাসনা প্রেরক-শক্তি বলিয়া গণ্য হইয়া গিয়াছে। ফলবাসনা ছাড়িয়া কর্ম করাই বরং উল্টা কথা। এই ক্রিয়া ব্যবহারিক ও সাংসারিক রীতির বিপরীত। কেহ বহু কর্ম করিলে আমরা বলি ইহার জীবন কর্মযোগময়। কিন্তু ইহার মূলে আছে ভাষা-দৈন্য। গীতার ব্যাখ্যা অনুসারে ইহা কর্মযোগ নহে। কর্ম করে এমন লাখো লোকের মধ্যে—গতানুগতিক কর্মকারীর কথা ত ছার—লাখো স্বধর্মাচরণকারীর মধ্যে গীতার কর্মযোগী একজনও মেলা ভার। কর্মযোগকে সূক্ষ্ম ও সঠিক অর্থে ধরিলে পূর্ণ কর্মযোগী পাওয়া দুরূহ। কর্ম করা ও তার ফলত্যাগ করা এ ব্যাপার একান্তই অসাধারণ। এই বিশ্লেষণই এ পর্যন্ত গীতায় করা হইয়াছে।

সেই বিশ্লেষণ বা পৃথক্করণেরই উপযোগী আর এক পৃথক্করণের কথা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। কর্ম কর ও ফলের আসক্তি ছাড়—এই পৃথক্করণের উপযোগী অনুরূপ আর এক মহা পৃথক্করণ হইতেছে 'দেহ ও আত্মা'র পৃথক্করণ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই পৃথক্করণ করা হইয়াছে। আমরা চোখে রূপ দেখি। সে রূপকে আমরা মূর্তি, আকার, দেহ বলি। বাহ্য

মূর্তির পরিচয় চোখের দ্বারা হইলেও, বস্তুর অন্তরে আমাদের প্রবেশ করিতে হয়। ফলের খোসা ছাড়াইয়া ভিতরের শাঁস খাইতে হয়। নারিকেলের কথা ধরেন ত তাহা ভাঙিয়া ভিতরে কি আছে দেখিতে হয়। কাঁঠাল বাহিরে কাঁটায় ভরতি, তাহা হইলে কি হয়, ভিতরে তার মধুর রসাল কোয়া। কি নিজের সম্বন্ধে কি পরের, ভিতর-বাহিরের এই পৃথক্করণ আবশ্যক। খোসা ছাড়ানোর অর্থ কি? অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুর বাহ্যরূপ ও ভিতরের শাঁস পৃথক করিয়া দেখা চাই। বাহিরে দেহ আর ভিতরে আত্মা—সব বস্তুরই এ রকম দ্বিবিধ রূপ। কর্মেরও তাহাই। বাহ্য ফল কর্মের দেহ আর কর্মের ফলে যে আত্মশুদ্ধি হয় তাহা হইতেছে ঐ কর্মের আত্মা। স্বধর্মাচরণের বাহ্য ফল এ দেহকে ত্যাগ করিতে হইবে আর চিত্তশুদ্ধিরূপ ভিতরে যে সারভূত আত্মা তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। এভাবে দেখার অভ্যাস করিতে হইবে; দেহ-ভাবনা দূর করিয়া প্রত্যেক বস্তুর সার গ্রহণ করার দৃষ্টি আমাদের লাভ করিতে হইবে। চোখকে, মনকে, বিচারকে এই শিক্ষা, এই স্বভাব ও এই অভ্যাস আমাদের দিতে হইবে। সর্বক্ষেত্রে দেহকে পৃথক করিয়া আত্মার পূজা করা চাই। আমাদের ভাবিয়া দেখার জন্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই পৃথক্করণের কথা বলা হইয়াছে।

(৬৮)

সারগ্রাহী দৃষ্টি রাখার ভাব অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাল্যকাল হইতে যদি ইহা অভ্যাস করি ত কতই না ভাল হয়। এ বিষয় পরিপাক করিয়া লওয়ার মত, এ দৃষ্টি আত্মসাৎ করিয়া লওয়ার মত। অনেকে মনে করেন, জীবনের সহিত অধ্যাত্মবিদ্যার কোন সম্পর্ক নাই। আর যদি থাকেও ত না থাকাই শ্রেয়। দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক মনে করার শিক্ষা যদি বাল্যকাল হইতে দেওয়া যায় ত কতই না ভাল হয়। তাহা শিক্ষার বিষয়। কুশিক্ষার ফলে আজকাল অতি মন্দ সংস্কার জন্মিতেছে। 'আমি কেবল দেহরূপ' স্রেফ্ এই শিক্ষাই আমরা পাইতেছি। কেবল দেহের কথা, দেহের বড়াই চলিতেছে। তাহা হইলেও দেহের যে স্বরূপ হওয়া উচিত, যে স্বরূপ পাওয়া উচিত, তাহা ত কোথাও দেখা যায় না। এমনই ব্যর্থ পূজা এ দেহের

চলিতেছে। আত্মার মাধুর্যের দিকে নজর নাই। বর্তমান শিক্ষার ইহা ফল। দিনরাত দেহপূজার শিক্ষা চলিতেছে।

স্রেফ্ বাল্যকাল হইতে দেহ-দেবতার পূজা অর্চনার শিক্ষা সুরু হয়। পায়ে কোথাও একটু চোট লাগিয়াছে, মাটি লাগাইলেই চুকিয়া যায়। শিশুর ব্যথা থাকে না। এমন কি, মাটি লাগানোরও প্রয়োজন হয় না। একটু আঁচড়াইয়া গিয়াছে ত সে দিকে তার লক্ষ্যই নাই। কিন্তু অভিভাবকের, প্রতিপালকের এতটুকুতে চলে না। শিশুকে সে কাছে ডাকে আর বলে, "দেখি, কোথায় লেগেছে? কতটা লেগেছে? বড্ড লেগেছে না? রক্ত বের হয়েছে?" এ ত সবে সুরু। বাচ্চা কাঁদে না ত তাকে না কাঁদাইয়া ছাড়ে না। কাঁদিবে না যে, তাকে এই যে কাঁদানো এ লক্ষণকে কি বলা যাইবে? 'লাফিও না, খেলতে যেও না। লাগবে, আঁচড়ে যাবে।' এরূপ কেবল দেহের উপর নজরদানকারী একাঙ্গী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

শিশুদের আদর-পিয়ারের ব্যাপারেও তাহাই। দৃষ্টি কেবল দেহের দিকে। নিন্দা করিবে, তাহাও দেহকে উপলক্ষ করিয়া। বলে, "কেমন নোংরা!" শিশুর কত বড় আঘাত যে লাগে! কিরূপ মিথ্যা আরোপ! নোংরা ত বটেই আর তাহা পরিষ্কার করা চাই একথাও সত্য। কিন্তু কর্তব্য জ্ঞানে তাহা পরিষ্কার না করিয়া শিশুকে আঘাত করা হয়। আর কীদৃশ সে আঘাত! শিশুর কাছে তাহা অসহ্য। সে ব্যথা পায়। তার অন্তরাত্মা পরিচ্ছন্নতায়, নির্মলতায় ভরতি। তথাপি বেচারার উপর কিরূপ বৃথা আরোপ! বস্তুত ঐ শিশু নোংরা নয়। অতীব সুন্দর, মধুর, পবিত্র। প্রিয় যে পরমাত্মা, সে তাহাই। তাঁহার অংশ তাহাতে বিদ্যমান। কিন্তু তাহাকে বলে, 'নোংরা'। ঐ নোংরাপনার সহিত শিশুর সম্বন্ধ কি? শিশুর সে বোধই নাই। তাই ঐ আঘাত সে সহিতে পারে না। তাহার চিত্তে ক্ষোভ জন্মে। আর ক্ষোভ জন্মার অর্থ সংশোধনের পথ বন্ধ হওয়া। তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া-সুঝাইয়া পরিষ্কার রাখা চাই। তাহা ত আমরা করিই না, বরং ইহার বিপরীত কর্ম করিয়া ঐ শিশুর মনে এই ছাপ দিয়া দিই যে সে দেহ মাত্র। দেহ হইতে আত্মা পৃথক, ইহাকে মহত্ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলিয়া শিক্ষা-শাস্ত্রের গ্রহণ করা চাই।

যাহাকে আমি পড়াইতেছি সে সর্বাঙ্গসুন্দর এই ভাব গুরুর মনে রাখা চাই। অঙ্কে ভুল হইল ত মারিল গালে থাপ্পড়। থাপ্পড় মারার সহিত অঙ্কে ভুল হওয়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি? স্কুলে দেরিতে আসে ত লাগা চড়। চপেটাঘাতের ফলে তাহার গালে রক্তের প্রবাহ জোরে বহিবে বটে, তা বলিয়া কি সে আগে আসিবে? কয়টা বাজিয়াছে সেকথা ঐ রক্তের সঞ্চালন বলিয়া দিবে এরূপ কার্যকারণ সম্বন্ধ কিছু আছে কি? বস্তুত এইরূপ মারধর করিয়া ঐ শিশুর পশুবৃত্তি আমি বাড়াইয়া দিতে থাকি। তুমি মানে তোমার ঐ দেহ, এই ভাব দৃঢ় করিয়া দিতে থাকি। ভয়ের ভিত্তিতে তাহার জীবন খাড়া করা হইতেছে। বাস্তবিক সংশোধন যদি করিতে চাই ত তাহা এইরূপ জবরদস্তি দ্বারা, দেহাসক্তি বাড়াইয়া কখনও হইবার নহে। দেহ হইতে আমি ভিন্ন একথা যখন আমি বুঝিব তখনই কেবল আমার সংশোধন হইবে।

দেহে বা মনে স্থিত দোষের বোধ হওয়া কিছু দোষের নহে। সেই দোষ দূর করার পক্ষে তাহা সহায়ক। কিন্তু আমি যে দেহ নহি ইহা সুস্পষ্ট বোঝা চাই। এই যে 'আমি' সে আমি দেহ হইতে একেবারে পৃথক, অতীব সুন্দর, উজ্জ্বল, পবিত্র। ত্রুটিরহিত আমি। আপন দোষ সংশোধনের নিমিত্ত যে আত্মপরীক্ষা করে, দেহকে নিজ হইতে পৃথক করিয়াই তাহাকে সেই আত্মপরীক্ষা করিতে হয়। কেহ দোষ দেখাইয়া দিলে তাহার রাগ হয় না। রাগ না করিয়া সে দেখে এই শরীররূপ, এই মনোরূপ যন্ত্রে কোথায় দোষ আছে, আর তাহা সে দূর করে। উল্টা, দেহকে যে নিজ হইতে পৃথক দেখে না সে সংশোধন করিতেই পারে না। এ দেহ, এ পিন্ড, এ মাটির পুতলা এই ত আমি, এরূপ যে মনে করে সে আত্ম-সংশোধন করিবে কিরূপে? সাধনস্বরূপে এ দেহ পাইয়াছি একথা যখন মনে করিব তখনই মাত্র সংশোধন হইবে। কেহ চরখার ত্রুটি দেখাইলে আমার রাগ হয় না। ত্রুটি দেখি ত তাহা দূর করি। এ দেহের ব্যাপারেও তাহাই। এ যেন চাষ আবাদের যন্ত্র, পরমেশ্বরের বাড়ীর চাষ আবাদের হাতিয়ার। এ হাতিয়ার যদি খারাপ হয় ত নিশ্চয়ই মেরামত করিতে হইবে। সাধনরূপে এ দেহ বিদ্যমান। এ দেহ হইতে পৃথক থাকিয়া দোষ হইতে মুক্ত হওয়ার প্রযত্ন করিতে হইবে। এ

দেহরূপ সাধন হইতে আমি স্বতন্ত্র। আমি স্বামী, আমি মালিক; এ দেহ দ্বারা কাজ করাইয়া লওয়া, তার কাছ হইতে উৎকৃষ্ট সেবা আদায় করা আমার কাজ। বাল্যকাল হইতেই এই ভাবে দেহ হইতে আলাদা থাকার বৃত্তি জাগ্রত করা চাই।

খেলার দর্শক তৃতীয় ব্যক্তি যেমন খেলার দোষগুণ ভালরূপে দেখিতে পায় তদ্রূপ দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে নিজেকে আলাদা রাখিলেই আমরা উহাদের দোষ-গুণ ঠিক বিচার করিতে পারি। কেহ কেহ বলে, "আমার স্মরণশক্তি এখন কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে। উপায় কিছু বলতে পারেন?" একথা যখন কেহ বলে তখন স্পষ্ট বুঝা যায় যে স্মরণশক্তি হইতে সে আলাদা হইয়া গিয়াছে। "আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে" বলার মানে লোকটির কোন সাধন, কোন যন্ত্র বিগড়াইয়া গিয়াছে। কেহ ছেলে হারায়, কেহ বহি হারায়। কিন্তু কেহ নিজেকে হারাইয়াছে এ ত হয় না। অন্তে মরণকালে তাহার এই দেহই সব দিক হইতে নাশ হয়, রদী হয়; কিন্তু ভিতরে সে নিজে লেশ-মাত্রও বিকৃত হয় না। সে অব্যঙ্গ* থাকে, নীরোগ থাকে। একথা বুঝিয়া লওয়ার মত। আর বুঝিলে অনেক কিছু ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যায়।

(৬৯)

দেহই আমি এই ভাব সর্বত্র বিস্তার হইতেছে। তার ফলে মনুষ্য বিনা বিচারেই দেহের পুষ্টির জন্য নানাবিধ সাধন প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। তাহা দেখিয়া বড় ভয় হয়। দেহ প্রাচীন হইয়াছে, জীর্ণ হইয়াছে তবু যে কোন প্রকারে তাহা টিকাইয়া রাখিতে হইবে। লোকের ইহাই মনের ভাব। কিন্তু এ দেহ, এ খোসা কতদিন আপনি টিকাইয়া রাখিবেন? মৃত্যু পর্যন্ত! মরণের ঘণ্টা যখন বাজিবে, ক্ষণকালও তখন এ দেহ রক্ষা করা যাইবে না। মৃত্যুর পরে সকল গর্ব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। এ তুচ্ছ দেহের জন্য নানা সাধন মানুষ তৈরি করে। দিনরাত দেহের কথা ভাবে। দেহ রক্ষার জন্য মাংস খাওয়া দোষের নয় একথা পর্যন্ত শোনা যাইতেছে। মনুষ্য দেহ কি এতই মূল্যবান যে তাহা রক্ষা করার জন্য মাংস খাইতে হইবে? পশুদেহের মূল্য

* অব্যঙ্গ—ত্রুটিরহিত; সর্বাঙ্গে পূর্ণ।

কম। কম কেন? মনুষ্যদেহ কিরূপে মূল্যবান স্থির হইল? কি কারণে? পশু যাকে ইচ্ছা খায়। স্বার্থ ছাড়া অন্য চিন্তা তার নাই। মানুষের আচরণ সেরূপ নহে। মানুষ আপনার আশেপাশের সৃষ্টি রক্ষা করে। তাই না মনুষ্যদেহের মূল্য। আর তাই ত তাহা মূল্যবান। কিন্তু যে কারণে মনুষ্যদেহ মূল্যবান সাব্যস্ত হইল, মাংস খাইয়া সে কারণ তুমি নষ্ট করিয়া ফেল। মানুষ, তুমি সংযত জীবন যাপন কর, সকলের জীবন রক্ষা করার জন্য চেষ্টা কর, সকলকে পালন করার বৃত্তি তোমার রহিয়াছে—ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠত্বের আধার। পশু হইতে এই যে তোমার বিশেষত্ব তার কারণেই মানুষ শ্রেষ্ঠ। তার জন্যই মানবদেহকে দুর্লভ বলা হইয়াছে। কিন্তু মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের যাহা ভিত্তি তাহাই যদি সে খুঁড়িতে লাগিয়া যায় ত তার শ্রেষ্ঠত্বের ইমারত টিকিতে পারে কি? ইতর পশু অন্য প্রাণীর মাংস খায়। মানুষ যদি সেই ক্রিয়াই নিঃসংকোচে করিতে উদ্যত হয় ত তাহা নিজ শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি নিজ হাতে খুঁড়িয়া ফেলারই মত ব্যাপার। যে ডালে বসিয়া আছি ইহা যেন সে ডালই কাটিয়া ফেলার প্রযত্ন।

চিকিৎসা শাস্ত্র নানা অদ্ভুত কাণ্ড আজকাল করিতেছে। পশুদেহ চিরিয়া জীবন্ত শরীরে রোগ-জীবাণু ভরিয়া দেওয়া হয় এবং তার কি কি ক্রিয়া হয় তাহা লক্ষ্য করা হয়। জীবন্ত পশুকে এরূপ নিদারুণ কষ্ট দিয়া যে জ্ঞান মেলে তার ব্যবহার হয় এই তুচ্ছ দেহের রক্ষার নিমিত্তে। আর এ সব চলে ভূতে দয়ার নামে। পশু-শরীরে জীবাণু সৃষ্টি করিয়া তার রস মনুষ্য-দেহে ভরিয়া দেওয়া হয়। এরূপ নানা প্রকার ভীষণ কার্য চলিতেছে। আর এ সবই চলিতেছে কাচের মত ক্ষণভঙ্গুর এই দেহের জন্য। কখন যে তাহা ভাঙিবে তার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। মনুষ্যের দেহ সংরক্ষণের নিমিত্ত এ সকল প্রযত্ন চলিতেছে। কিন্তু শেষটায় দেখা যাইতেছে কি? এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে রক্ষা করার যতই চেষ্টা চলিতেছে ততই তার নাশ হইতেছে। এই প্রতীতি হওয়া সত্ত্বেও দেহকে হৃষ্টপুষ্ট করার চেষ্টা নিরন্তর চলিতেছে।

কিরূপ আহার করিলে বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইবে সে দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। কি করিলে মন ভাল হয়, বুদ্ধি নির্মল হয়, তার জন্য কোন্

সাহায্যের দরকার সে দিকে লোকের আদৌ নজর নাই। কি করিলে শরীরের ওজন বাড়িবে দৃষ্টি সেদিকে। কিরূপে পৃথিবীর যত মাটি উঠিয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিবে, মাটির ঐ থলথলে তালের স্তূপ এ শরীরে সাজানো যাইবে ইহাই অনুক্ষণের চিন্তা। থপথপ করিয়া বসানো গোবরের ঘুঁটে দুই দিন পরে শুকাইয়া পড়িয়া যায়। শরীরে চাপানো এ মেরুদণ্ড, এ চর্বি তদ্রূপ অন্তে খসিয়া পড়ে, গলিয়া যায় আর শরীর পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অঙ্গে বাহিরের এই মাটির প্রলেপ লাগাইবার, মাটির বোঝা চাপাইবার, যে ওজন দেহ বহিতে অক্ষম সে ওজন বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা কি? এই প্রচণ্ড থলথলে মেদপিণ্ড বৃদ্ধি করিয়া লাভ কি? এই দেহ আমাদের এক সাধন। ঐ সাধনকে কাজের উপযোগী রাখার জন্য যাহা করা দরকার তাহা ত আমার করিতেই হইবে। যন্ত্র হইতে কাজ আদায় করিতে হইবে। যন্ত্রের অভিমান আছে কি? 'যন্ত্রাভিমান' বলিয়া কিছু আছে কি? এ দেহ-যন্ত্র সম্বন্ধেও আমাদের দৃষ্টি তেমন কেন হইবে না?

সারাংশ, এ দেহ সাধ্য নহে সাধন, এ ভাব দৃঢ় হইলে মানুষ যে বাড়াবাড়ি করে তাহা করিবে না। আর এক দৃষ্টি তখন জীবনে আসিবে। এ দেহের শৃঙ্গারে তখন আর আগ্রহ থাকিবে না। বস্তুত একখানি পরিষ্কার বস্ত্রই দেহের পক্ষে পর্যাপ্ত। কিন্তু তা নয়, কাপড় মোলায়েম হওয়া চাই। তাহাতে জরিবুটি চাই। ফুল চাই, নক্সা চাই। তার জন্য বহু লোককে নানারকম কাজ করিতে হয়। কিসের জন্য এ সব? ভগবানের কি আক্কেল ছিল না? দেহের পক্ষে যদি নক্সা-বুটি আবশ্যক হইবে ত বাঘের গায়ে যিনি বিচিত্র নক্সা আঁকিয়া দিয়াছেন, তিনি কি তোমার অঙ্গে তাহা আঁকিয়া দিতে পারিতেন না? তাহা কি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল? ভগবান ময়ূরকে সুন্দর পুচ্ছ দিয়াছেন। তোমাকেও দিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে এক রঙই দিয়াছেন। তাতে এতটুকু দাগ লাগে ত তা নষ্ট হইয়া যায়। মানুষের যে রূপ সে রূপেই সে সুন্দর। মনুষ্যদেহ সাজানো হোক ইহা ভগবানের ইচ্ছা নয়। সৃষ্টিতে কি সৌন্দর্যের অভাব

আছে? চোখ মেলিয়া তাহা দেখিবে, বস্, তাই ত মানুষের কাজ। কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছে। লোকে বলে, জার্মেনি আমাদের রঙের সর্বনাশ করিয়াছে। অরে, তোমার মনের রঙ আগেই গিয়াছে। আর তখন কৃত্রিম রঙের আকর্ষণ জন্মিয়াছে। ফলে পরাবলম্বী হইয়াছ। অকারণ দেহ-শৃঙ্গারের ফেরে তুমি পড়িয়া গিয়াছ। মনের শৃঙ্গার, বুদ্ধির বিকাশ, হৃদয় সুন্দর করার প্রয়াস—এ সব এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়াছ।

(৭০)

অতএব ভগবান এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যেকথা আমাদের বলিয়াছেন তাহা অতীব মূল্যবান। "'তুই দেহ নহিস, এই আত্মা'—'তত্ত্বমসি'"—তুই-ই সে আত্মরূপ। ইহা অতি মহান পবিত্র কথা, পাবন ও উদাত্ত উচ্চার। "বাইরের এ আবরণ, খোসা তুই নহিস। তুই হচ্ছিস সে শুদ্ধ অবিনাশী ফল—শাঁস" এই অতীব মহান ভাব সংস্কৃত সাহিত্যে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। যে মুহূর্তে 'তুইই সে' এ ভাবের উদয় মানুষের মনে হইবে, এ দেহ আমি নই, আমি ঐ পরমাত্মা এ ভাব মনে আসিবে সে মুহূর্তে মনে এক অননুভূত আনন্দের সঞ্চার হইবে। আমার সেই রূপ নাশ করিতে পারে এরূপ কোন বস্তু এ সংসারে নাই। কাহারও সেই শক্তি নাই। এই সূক্ষ্ম ভাব এই মহান উক্তিতে নিহিত।

দেহের 'পরে অবিনাশী নিষ্কলঙ্ক যে আত্মতত্ত্ব আমি তাহাই। ঐ আত্মতত্ত্বের জন্যই এ দেহ আমি পাইয়াছি। ঈশ্বরীয় তত্ত্ব যখনই দূষিত হওয়ার উপক্রম হইবে তাকে রক্ষার নিমিত্ত তখনই আমি এ দেহ পাত করিব। ঈশ্বরীয় তত্ত্বকে উজ্জ্বল করার জন্য দেহ হোমে আহুতি দিতে সদা প্রস্তুত থাকিব। এই যে দেহ আশ্রয় করিয়াছি সে কি কুকীর্তি করার জন্য? দেহের উপর আমার কর্তৃত্ব চলা চাই। এ দেহ আমি ব্যবহার করিব আর তাহা দ্বারা হিত-মঙ্গলের শ্রীবৃদ্ধি করিব। "আনন্দে ভরিব তিন লোক।" মহান তত্ত্বের জন্য এ দেহ আমি হেলায় ত্যাগ করিব ও ঈশ্বরের জয়গান করিব। ধুতি ময়লা হইতেই আমিরেরা ফেলিয়া দেয় আর অন্য পরিধান

করে। আমিও তেমন করিব। কাজের জন্য এ দেহ। কাজের অযোগ্য যখন এ দেহ হইবে তখন তাহা ফেলিয়া দিলে প্রত্যবায় নাই।

এই শিক্ষা সত্যাগ্রহ আমাদের দেয়। দেহ ও আত্মা দুই পৃথক বস্তু। মানুষ যেদিন একথা বুঝিবে সেদিন তাহার সত্যকার শিক্ষার, যথার্থ বিকাশের সূত্রপাত হইবে। সত্যাগ্রহ তখনই সিদ্ধ হইবে। অতএব এ ভাবনা আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতে হইবে। দেহ এক নিমিত্ত মাত্র, এক সাধন, পরমেশ্বরের দেওয়া এক হাতিয়ার। উহার প্রয়োজনীয়তা শেষ হওয়া মাত্র ফেলিয়া দেওয়া চাই। শীতের গরম কাপড় গ্রীষ্মে আমরা ফেলিয়া দিই। রাতে যে কম্বল চাপা দিই সকালে তাহা সরাইয়া রাখি। সকালের কাপড় দুপুরে ছাড়ি। দেহও তদ্রূপ। যতদিন এ দেহ হইতে কাজ পাওয়া যাইবে ততদিন রাখিব। যেদিন কাজ দিবে না সেদিন এই দেহরূপ কাপড় ত্যাগ করিব, ফেলিয়া দিব। আত্মার বিকাশের জন্য এই উত্তম পন্থা ভগবান আমাদের কাছে ধরিয়াছেন।

(৭১)

দেহ হইতে আমি পৃথক এ বোধ যতদিন না হইবে ততদিন অত্যাচারী আমাদের উপর অত্যাচার করিতে থাকিবে, আমাদের গোলাম বানাইয়া রাখিবে, নানা দুর্দশা আমাদের করিবে। ভয় আছে তাই জুলুম চলে। এক রাক্ষস কোন লোককে ধরিয়াছিল। সতত সে তার কাছ হইতে কাজ আদায় করিত। রাক্ষস তাকে বলিত, "খেয়ে ফেলব; শেষ করব।" প্রথম প্রথম লোকটা ভয় পাইত। পরে বাড়াবাড়ি যখন চলিতে থাকিল তখন সে বলিল, "এই নে, খাবি ত খা।" আসলে রাক্ষস তাকে খাইতে চায় নাই। দরকার ছিল তার একজন দাসের, গোলামের। খাইয়া ফেলিবে ত তার কাজ করিবে কে? যখন তখন খাইয়া ফেলার কথা যে সে বলিত তাহা ছিল হুমকি মাত্র। তাই যেই জবাব আসিল, 'খাবে ত খাও', অমনি তার অত্যাচার বন্ধ হইয়া গেল। অত্যাচারীরা জানে যে এ সব লোক দেহ আঁকড়াইয়া থাকিবে। দেহকে কষ্ট দিয়াছ কি ইহারা গোলাম হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ দেহের আসক্তি ছাড়িলে কি তুমি সম্রাট হইলে, স্বাধীন হইলে। সকল শক্তির তুমি

আধার হইলে। কোনরূপ প্রভুত্ব আর তোমার উপর চলার নয়। জুলুম করার আধারই তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। 'আমি দেহ', এ ভাবনাই সে আধার। তারা মনে করে দৈহিক পীড়া দিলে ইহারা তাঁবে আসিবে। তাই তাহারা হুমকির ভাষা ব্যবহার করে।

'আমি দেহ' আমার এ ভাবনার হেতু আমার উপর জুলুম করার, আমাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা অপরের হয়। ইংলণ্ডের হুতাত্মা ক্রেমনর বলিয়াছিলেন, "আমায় পোড়াবে? এসো। এই নাও, ডান হাত আগে পোড়াও।" অথবা রিডলে ও লেটিমারের কথা ধরুন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "আমাদের পোড়াবে? কে আমাদের পোড়াবে? ধর্মের এমন জ্যোতি জেবলেছি যে কেউ তা নিভাতে পারবে না। দেহরূপ এ মোমবাতি, এ চর্বি জবালিয়ে মহৎ তত্ত্বকে সমুজ্জবল করাই ত আমাদের কাজ। দেহ যাবে। একদিন ত তা নাশ হবেই।" সক্রেটিসকে বিষ-প্রয়োগে মারার দণ্ডাদেশ হয়। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "বুড়ো হয়েছি। দেহ দুদিন বাদে যাবেই। যে মরবেই তাকে মেরে আপনারা কি যে পুরুষার্থের কাজ করছেন তা আপনারাই জানেন। ভেবে দেখলে দেখতে পাবেন, দেহের নাশ সুনিশ্চিত। যে বস্তু মরবে তাকে মেরে আর কি কীর্তি বাড়বে?" প্রাণদণ্ডের পূর্ব রাত্রে সক্রেটিস আত্মার অমরতা সম্বন্ধে শিষ্যদের বলিতেছিলেন। বিষ-প্রয়োগের পরে কি কি যাতনা হইবে সে বর্ণনা তিনি করিতেছিলেন। কোন উদ্বেগ সে বিষয়ে তাঁহার ছিল না। আত্মার অমরতা সম্বন্ধে কথা শেষ হইলে তাঁহার এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মরার পরে আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কি ভাবে করা হবে?" "অহো! বুদ্ধিমান! মারবে তারা, আর গাড়বে তুমি! যারা মারবে তারা আমার দুশমন, আর কবরদাতা তুমি আমার সুহৃৎ, একথাই কি তুমি মনে কর? বুদ্ধিমানের মত তারা আমায় মারবে আর সমঝদারের মত তুমি আমায় গাড়বে! কে হে তুমি যে আমায় গাড়বে? তোমাদের সবকে পুঁতে আমি বেঁচে থাকব। আমাকে মারার শক্তি কারও নেই। কী বলছিলাম আমি এতক্ষণ? আত্মা অমর। কে তাকে মারবে, কে গাড়বে?" আর সত্যসত্যই আজ দুই হাজার আড়াই হাজার বছর, ঐ মহান্ সক্রেটিস্ সকলকে কবর দিয়া বাঁচিয়া আছেন।

(৭২)

সারাংশ, যতদিন দেহের আসক্তি আছে, ভয় আছে, ততদিন যথার্থ রক্ষা মিলিবার নয়। ততদিন এক প্রকারের ভয় থাকিয়া যাইবে। চোখ একটু লাগিয়া আসে ত আঁতকাইয়া উঠিয়া ভাবে এই বুঝি সাপে কামড়াইল, চোরে সর্বনাশ করিল। শিয়রে লাঠি লইয়া মানুষ শোয়। কেন? উত্তরে বলে, "কাছে থাকা ভাল, কি জানি চোর-টোর আসে ত।" বেশ লোক, চোর যদি সে লাঠিই তোমার মাথায় হানে? চোর লাঠি আনিতে যদি বা ভুল করে তাই তার জন্য আগেই তুমি তৈয়ার করিয়া রাখিতেছ। কাহার ভরসায় তুমি ঘুমাও? তুমি ত তখন দুনিয়ার হাতে থাক। জাগিয়া থাকিলে না আত্মরক্ষা করিবে! ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার রক্ষাকর্তা কে?

কোন এক শক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া আমি ঘুমাই। যে শক্তির উপর ভরসা রাখিয়া বাঘ, গরু ইত্যাদি ঘুমায় সেই শক্তির উপর ভরসা করিয়া আমিও শুই। বাঘও ঘুমায়। সর্ব জগতের সহিত যার বৈর ভাব আর তাই যে ক্ষণে ক্ষণে পেছনের দিকে তাকায় এমন যে সিংহ সেও ঘুমায়। সেই শক্তির উপর নির্ভর যদি না থাকিত তবে সিংহের কতকগুলি ঘুমাইত আর কতকগুলি জাগিয়া থাকিয়া পাহারা দিত। এ ব্যবস্থা তাদের করিতে হইত। যে শক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া বৃক, ব্যাঘ্র, সিংহ আদি ক্রূর জন্তু ঘুমায় সেই বিশ্বব্যাপী শক্তির কোলে আমিও শুই। শিশু মার কোলে সুখে ঘুমায়। শিশু যেন তখন দুনিয়ার বাদশাহ। তদ্রূপ ঐ বিশ্বম্ভর মাতার কোলে অমনই প্রেমপূর্বক, বিশ্বাসপূর্বক ও জ্ঞানপূর্বক তোমার আমার ঘুমাইতে শিখিতে হইবে। যে শক্তির আশ্রয়ে আমার সারা জীবন চলিতেছে সেই শক্তির অধিকাধিক পরিচয় করিয়া লওয়া চাই। উত্তরোত্তর সেই শক্তির প্রতীতি আমার হওয়া চাই। ঐ শক্তিতে আমার বিশ্বাস যত দৃঢ় হইবে, আমার সংরক্ষণ তত সুনিশ্চিত হইবে। যেমন যেমন ঐ শক্তির অনুভব আমার হইতে থাকিবে তেমন তেমন আমার বিকাশ হইবে। এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উহার ক্রমও কিঞ্চিৎ নির্দেশ করা হইয়াছে।

(৭৩)

যে পর্যন্ত দেহস্থিত আত্মার উপলব্ধি না হয় সে পর্যন্ত মানুষ সাধারণ ক্রিয়ায় জড়াইয়া থাকে। ক্ষুধা লাগিয়াছে খাইলাম, তৃষ্ণা পাইয়াছে জল পান করিলাম, ঘুম পাইয়াছে ত ঘুমাইলাম, ইহার অধিক সে কিছু জানে না। ইহার জন্য সে লড়িবে। এ সব পাওয়ার তার লোভ হইবে। এ ভাবে দৈহিক ক্রিয়াতেই সে মগ্ন থাকে। বিকাশের আরম্ভ হয় ইহার পরে। এ সময় পর্যন্ত আত্মা কেবল দর্শক মাত্র। শিশু হামাগুড়ি দিয়া কুয়ার দিকে যাইতে থাকে ত মা সতর্ক নজরে পেছনে দাঁড়াইয়া থাকেন। তদ্রূপ আত্মা আমাদের উপর নজর রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহা শান্তভাবে সকল ক্রিয়া লক্ষ্য করে। এই স্থিতিকে বলা হইয়াছে 'উপদ্রষ্টা'—সাক্ষীরূপে দর্শনকারী।

এ অবস্থায় আত্মা দেখে, সম্মতি দেয় না। কিন্তু যে নিজকে দেহমাত্র জ্ঞান করিয়া সব কিছু ক্রিয়া করে পরে সে জাগ্রত হয়। আমি পশুর সমান জীবন যাপন করিতেছি. এ বোধ তার হয়। জীব যখন এরূপ ভাবিতে থাকে তখন তার নৈতিক ভূমিকার সূত্রপাত হয়। পদে পদে তখন উচিত-অনুচিত প্রশ্ন মনে জাগিতে থাকে। মানুষ বিবেক অনুসারে চলিতে সুরু করে। পৃথক্করণাত্মক বুদ্ধি জাগ্রত হয়। স্বৈর ক্রিয়া বন্ধ হয়। অসংযম যায়, সংযম আসে। জীব যখন এই নৈতিক ভূমিকায় পেঁছে আত্মা তখন আর নিছক নিশ্চেষ্ট দর্শক থাকে না। ভিতর হইতে সে অনুমোদন করে। 'শাবাশ্' এই ধ্বনির আওয়াজ অন্তর হইতে আসে। তখন আত্মা কেবল 'উপদ্রষ্টা' থাকে না, 'অনুমন্তা' হয়।

ক্ষুধার্ত অতিথি দ্বারে উপস্থিত। সামনের বাড়া ভাত আপনি তাহাকে দিলেন। রাত্রে এই সৎ কর্মের কথা যখন মনে হইবে দেখিবেন কত আনন্দ হয়। ভিতর হইতে আত্মা অব্যক্ত স্বরে বলে, "উত্তম করেছ।" মা যখন শিশুর পিঠে হাত বুলাইয়া বলেন, "বেশ করেছিস বাছা", তখন তার মনে হয় দুনিয়ার সেরা বকশিস সে পাইয়াছে। তদ্রূপ হৃদয়স্থিত পরমাত্মার "শাবাশ, বাছা" এই শব্দ আমাদের প্রেরণা দেয়, উৎসাহ দেয়। জীব তখন ভোগময় জীবন ছাড়িয়া নৈতিক জীবনের ভূমিকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

পরবর্তী ভূমিকা এরূপ। নৈতিক জীবনে মনুষ্য কর্তব্য করিয়া মনের সকল ময়লা ধুইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে প্রযত্ন করিতে করিতে মানুষ হাঁপাইয়া উঠে। জীব তখন প্রার্থনা করে, "প্রযত্নের আমার পরাকাষ্ঠা হয়েছে। আমায় আরও শক্তি, আরও বল দাও।" সব রকম চেষ্টা করার পরে একা নিজে আর পারা যায় না এ উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত প্রার্থনার মাধুর্য মানুষের কাছে ধরা পড়ে না। নিজের সকল শক্তি লাগাইয়া যখন দেখা যায় যে তাহা পর্যাপ্ত নয় তখনই আর্ত হইয়া দ্রৌপদীর মত ভগবানকে ডাকা চাই, সাহায্য চাওয়া চাই। পরমেশ্বরের কৃপা ও সহায়তার প্রবাহ অনুক্ষণ বহিতেছে। যে কোন পিপাসী লোক আপন অধিকারবলে সে পাত্র হইতে জল পান করিতে পারে। কম যাহার পড়িয়াছে সে চাহিয়া লইবে। এই তৃতীয় ভূমিকায় এরূপ সম্বন্ধ হয়। আরও অধিক নিকটে পরমাত্মা আসেন। তখন কেবল মুখে শাবাশ্ না দিয়া সহায়তা করিবার জন্য ধাবিত হন।

পরমেশ্বর প্রথমে দূরে খাড়া ছিলেন। গুরু শিষ্যকে "আঁক কষ" বলিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকেন। তদ্রূপ জীব ভোগময় জীবনে যতদিন মগ্ন থাকে ততদিন পরমাত্মা দূরে দাঁড়াইয়া থাকেন ও বলেন, "বেশ, চলুক তোমার দৌড়-ঝাঁপ।" তারপরে জীবন যখন নৈতিক ভূমিকায় আসে তখন পরমাত্মা নিরপেক্ষ মাত্র থাকিতে পারেন না। জীবের দ্বারা সৎকার্য হইতেছে দেখা মাত্রই ভগবান আস্তে ঝুঁকিয়া দেখেন আর বলেন, "শাবাশ"। এ ভাবে সৎকর্ম করিতে করিতে চিত্তের স্থূল ময়লা দূর হইয়া যখন সূক্ষ্ম ময়লা ধোয়ার সময় আসে আর তাহার সারা প্রযত্ন অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয় তখন সে ভগবানকে ডাকে। আর 'এসেছি' বলিয়া ভগবান সাড়া দেন। দৌড়াইয়া আসেন। ভক্তের উৎসাহে ভাটা লাগিতেই তিনি আসিয়া দাঁড়ান। জগতের সেবক সূর্যনারায়ণ তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়াই আছে। বন্ধ দরজা ঠেলিয়া সূর্য ভিতরে প্রবেশ করে না, কারণ সে সেবক। স্বামীর মর্যাদা সে রক্ষা করে। দ্বারে সে ধাক্কা দেয় না। প্রভু ভিতরে শায়িত হইলেও সূর্যরূপী সেবক দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে। দরজা একটু খুলিয়াছ ত নিজের সমস্ত আলো লইয়া সে গৃহে প্রবেশ করে, আঁধার দূর করে। পরমাত্মাও

তদ্রূপ। তাঁহার কাছে সহায়তা চাহিয়াছ ত বাহু বিস্তার করিয়া তিনি আসিয়া যাইবেন। ভীমার তীরে কোমরে হাত রাখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

এসেছি বলেন প্রভু, মেলি দুই বাহু॥

তুকারাম আদি এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। নাক খুলিয়াছ ত হাওয়া ভিতরে যাইবেই। দ্বার একটু খুলিয়াছ ত আলো ভিতরে আসিবেই। হাওয়া ও আলোর দৃষ্টান্ত আমার কাছে অপর্যাপ্ত মনে হয়। এ দুইয়ের অপেক্ষাও পরমাত্মা অধিক সন্নিকট, অধিক উৎসুক। উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা না থাকিয়া তিনি ভর্তা হন, সর্বভাবে সহায়কারী হন। মনের মলিনতা ধোয়ার সময়ে নিরুপায় হইয়া 'মারী নাড় তমারে হাথে প্রভু সংভাল জো রে' বলিয়া শরণ লই। "তুই মোর একমাত্র সহায়, তোর সহায়তা চাই" এই প্রার্থনা করি। তখন ঐ দয়াঘন কিরূপে দূরে থাকিবেন? ভক্তের সহায়তাকারী পরমাত্মা, উন-পূরণকারী প্রভু সামনে আসিয়া দাঁড়ান। তখন তিনি রোহিদাসের চামড়া ধোন, সজন কসাইয়ের মাংস বেচেন, কবীরের চাদর বোনেন, জনাবাঈয়ের সঙ্গে যাঁতা ঘুরান।

ইহার পরের ধাপ হইতেছে পরমেশ্বরের কৃপাপ্রসাদে কর্মের যে ফল লাভ হইয়াছে তাহা নিজে না লইয়া ভগবানকে অর্পণ করা। এই ভূমিকায় জীব পরমেশ্বরকে বলে "তোর ফল তুই-ই নে।" নামদেব জিদ্ ধরিলেন ভগবানকে দুধ খাওয়াইবেন। প্রসঙ্গটি অতি মধুর। কর্মফলরূপ সমস্ত দুধ নামদেব ভগবানকে অর্পণ করিতেছেন। তদ্রূপ জীবনের সারা পুঁজি, সারা কামাই যাঁহার কৃপায় লাভ হইয়াছে তাঁহাকেই অর্পণ করা চাই। ধর্মরাজ যেই স্বর্গে পা বাড়াইবেন ত বলা হইল তাঁহার কুকুরের প্রবেশ মানা। সারা জীবনের পুণ্যের ফল স্বর্গ ধর্মরাজ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিলেন। ভক্তও তেমনি সমস্ত ফল-লাভ ভগবানকে নিঃশেষে অর্পণ করিয়া থাকে। উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তারূপে প্রতীয়মান পরমাত্মা এ অবস্থায় 'ভোক্তা' হইয়া যান। শরীরাভ্যন্তরে ঐ পরমাত্মাই ভোগ্য ভোগ করিতে থাকেন এই ভূমিকায় জীব তখন উপস্থিত হয়।

ইহার পরে আসে সংকল্প ত্যাগের পালা। কর্মের তিন ধাপ। প্রথমে সংকল্প, পরে কর্ম, তারপর আসে ফল। কর্মের জন্য প্রভুর সহায়তা

পাইয়াছি, ফল পাইয়াছি। সে ফলও অর্পণ করিলাম। কর্ম করেন ভগবান, ফলও খান ভগবান। কর্মের যে সংকল্পকারী এবার তাহাকেও ভগবান বানাও। এরূপে কর্মের আদিতে, মধ্যে, অন্তে সর্বত্রই প্রভুকে রাখ। জ্ঞানদেব বলিয়াছেন :

মালী যথা নিয়ে যায়। নীরবে জল তথা ধায়।

মালী নেয় যেমন। তুমি চল তেমন।

মালী যেখানে নিতে চায়, জল নীরবে সেখানে যায়। মালীর কাম্য ফুল ও ফলের গাছে তাহা সিঞ্চিত হয়। তদ্রূপ আমা দ্বারা যাহা হইবার তাঁহাকেই তাহা নির্ণয় করিতে দাও। আমার মনের সকল সংকল্পের দায়িত্ব তাঁহার উপর আমাকে সঁপিতে দাও। বোঝা যদি ঘোড়ার উপরই চাপাইলাম ত বাকী বোঝা আর নিজের মাথায় বহিতে যাই কেন? তাহাও ঘোড়ার পিঠেই কেন না চাপাইব? মাথায় বোঝা লইয়া যদি ঘোড়ার উপর বসি ত সে ভারও ত ঘোড়ার উপরই পড়ে। তবে সব বোঝা তাঁহারই পিঠে চাপাইব না কেন? এভাবে জীবনের যত কিছু দৌড়-ঝাঁপ, ওঠা-বসা, ফুল-ফল অন্তে সবই পরমাত্মা হইয়া যায়। তিনি আমার জীবনের 'মহেশ্বর' হন। এভাবে বিকাশ হইতে হইতে সমস্ত জীবনই পরমেশ্বরময় হইয়া যায়। থাকে অবশিষ্ট কেবল দেহের এই পর্দা। তাহা অদৃশ্য হইল ত জীব আর শিব, আত্মা আর পরমাত্মা এক হইয়া গেল।

এই প্রকারে— **"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ॥"**

এই স্বরূপে পরমাত্মাকে আমাদের উত্তরোত্তর অধিক উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রথমে প্রভু নিরপেক্ষভাবে দেখেন। পরে নৈতিক জীবন আরম্ভ হইলে আমাদের দ্বারা সৎকর্ম হইতে থাকে ও তিনি উৎসাহ দেন। তারপর চিত্তের সূক্ষ্ম ময়লা ধুইয়া ফেলার পক্ষে নিজ প্রযত্ন পর্যাপ্ত নয় দেখিয়া ভক্ত যখন ডাকে তখন ঐ অনাথনাথ সহায়তা করার জন্য দৌড়াইয়া আসেন। তার-পরে ফলও ভগবানকে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে ভোক্তা বানাইতে হইবে। আর অবশেষে সব কিছু তাঁহার অভিমুখী করিয়া সারা জীবন হরিময় করিতে হইবে। ইহাই মানুষের অন্তিম সাধ্য। কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই দুই ডানায় ভর করিয়া সাধককে এই অন্তিম গন্তব্যে গিয়া পৌঁছিতে হইবে।

(৭৪)

এই সব করার জন্য নৈতিক সাধনার দৃঢ় বনিয়াদ দরকার। সত্য-অসত্যের বাছ-বিচার করিয়া সত্য গ্রহণ করা চাই। সার-অসার বিচার করিয়া সার গ্রহণ করা চাই। ঝিনুক বাদ দিয়া মোতি গ্রহণ করা চাই। জীবন এভাবে আরম্ভ করিতে হইবে। তরাপরে আত্ম-প্রযত্ন ও পরমেশ্বরের কৃপাবলে উপরে উঠিতে হইবে। এই সব সাধনায় দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করার অভ্যাস যদি করি ত খুব সহায়তা লাভ হইবে। এ প্রসঙ্গে খৃস্টের আত্মোৎসর্গের কথা আমার মনে পড়িতেছে। গোঁজ ঠুকিয়া ঠুকিয়া তাঁহাকে মারা হইতেছিল। তখন তাঁহার মুখ হইতে "ভগবান এত যাতনা কেন দিচ্ছ" একথা নাকি বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি নিজকে সামলাইয়া লইলেন আর বলিলেন, "ভগবান, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এদের ক্ষমা কর। এরা জানে না, কি করছে?" খৃস্টের এ উদাহরণে অতি মহান মাধুর্য নিহিত। দেহ হইতে আত্মা কতদূর পর্যন্ত পৃথক করা যায় তাহার ইহা নিদর্শন। কতটা পথ যাওয়া চাই, আর কতটা যাওয়া যায় খৃস্টের জীবন হইতে তাহা দেখা যায়। দেহ খোসার মত। আর খোসার মত খসিয়া পড়িতেছে—এতদূর পর্যন্তই গন্তব্য প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করার কথা মনে আসিলেই খৃস্টের জীবন আমার চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠে। খৃস্টের জীবন দেহ হইতে একেবারে আলাদা হওয়ার, দেহের সম্বন্ধ ছিন্ন করার দৃষ্টান্ত।

দেহ ও আত্মার এই পৃথক্করণ সত্যাসত্যের বিচার ছাড়া সম্ভব নহে। এ বিবেক, এ জ্ঞান রোমে রোমে ব্যাপ্ত হওয়া চাই। জ্ঞানের অর্থ করি আমরা জানা। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া জানা জ্ঞান নহে। গ্রাস মুখে তুলিলেই আহার করা যায় না। মুখে-তোলা গ্রাস চিবাইতে হয়, গিলিতে হয়, পেটে জীর্ণ করিয়া সে রস সমস্ত শরীরে সঞ্চালন করিয়া রক্তরূপে পুষ্টি আহরণ করিতে হয়। তবে না যথার্থ ভোজন হইবে। সেরূপ বুদ্ধি দিয়া জানিলেই হয় না। জানা সারা জীবনে ব্যাপ্ত হওয়া চাই, তাহা দ্বারা হৃদয় আর্দ্র হওয়া চাই। হাত-পা, চক্ষু ইত্যাদি হইতে সে জ্ঞান ব্যক্ত হওয়া চাই। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহ বিচারপূর্বক কর্ম করিতেছে

এরূপ হওয়া চাই। তাই এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানের অতীব সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞানের এই লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণেরই মত।

'নম্রতা, দম্ভ-শূন্যত্ব, অহিংসা, ঋজুতা, ক্ষমা'

আদি বিশ গুণের কথা ভগবান বলিয়াছেন। এ সকল গুণকে 'জ্ঞান' বলা হয় একথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বরং ইহাদের বিপরীত সব কিছুই যে অজ্ঞান তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। জ্ঞানের যে সাধনা নির্দেশ করিয়াছেন সে সাধনা মানেই জ্ঞান। সক্রেটিস বলিয়াছেন, "সদগুণকেই আমি জ্ঞান বলি।" সাধনা ও সাধ্য দুই-ই একরূপ।

গীতার এই বিশ সাধনকে জ্ঞানদেব আঠারটি করিয়া দিয়াছেন। হৃদয় ঢালিয়া জ্ঞানদেব এই সাধনসমূহের বর্ণনা করিয়াছেন। গীতায় মাত্র পাঁচটি শ্লোকে এই সাধনসমূহের, এই গুণসমূহের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানদেব তাঁহার জ্ঞানেশ্বরীতে এই পাঁচ শ্লোকের উপর বিস্তারপূর্বক সাত শত ওবী লিখিয়া গিয়াছেন। সমাজে সদগুণের বিকাশ হোক, সত্যস্বরূপ পরমাত্মার মহিমা বাড়ুক, তাহার জন্য জ্ঞানদেব ব্যাকুল ছিলেন। এই সব গুণের বর্ণনা করিতে গিয়া নিজের সারা অনুভব ঐ ওবীতে তিনি ঢালিয়া দিয়াছেন। মারাঠা ভাষাভাষীদের তিনি মহা উপকার করিয়াছেন। জ্ঞান-দেবের প্রতি রোমকূপে এই সব গুণ ব্যাপ্ত ছিল। মোষের পিঠে চাবুক মারিলে সে দাগ তাঁহার পিঠে ফুটিয়া উঠিত। এমনই ছিল ভূতমাত্রের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি। এমনই করুণা-ভরা হৃদয় হইতে তাঁহার জ্ঞানেশ্বরীর সৃষ্টি। এই সব গুণ তিনি বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত গুণবর্ণনা পড়ার মত, মনন করার মত, হৃদয়ে গাঁথিয়া লওয়ার মত। জ্ঞানদেবের মধুর ভাষা আস্বাদ করিতে পাইয়াছি তজ্জন্য আমি নিজকে ধন্য মনে করি। পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলে যদি জ্ঞানদেবের মধুর ভাষা আমার মুখে অধিষ্ঠিত হয় তবে সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া আমি নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। বস্। উত্তরোত্তর বিকাশ করিতে করিতে আত্মা হইতে দেহকে পৃথক জ্ঞান করিতে করিতে সমগ্র জীবনকে পরমেশ্বরময় করার প্রযত্ন করিতে হইবে।

রবিবার, ১৫-৫-৩২

চতুর্দশ অধ্যায়

(৭৫)

বন্ধুগণ,

আজ চতুর্দশ অধ্যায়ের আলোচনা। এক অর্থে এই অধ্যায় পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পূরক। বস্তুত আত্মার কিছু করার আবশ্যকতা নাই। আত্মা স্বয়ংপূর্ণ। আমাদের আত্মার গতি স্বভাবতই ঊর্ধ্বগামী। কোন বস্তুতে ভারি ওজন বাঁধিয়া দিলে তাহা যেমন নীচের দিকে টানিয়া লয় এই শরীরের বোঝা তেমনি আত্মাকে নীচের দিকে টানিতে থাকে। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, কোনও উপায়ে আমরা যদি দেহ ও আত্মাকে পৃথক করিতে সক্ষম হই ত আমাদের প্রগতি হইতে পারে। এ কাজ কঠিন। কিন্তু তাহা হইতে প্রাপ্ত ফল অতীব মহান। আত্মার পায়ে দেহের এই যে বেড়ি তাহা যদি আমরা ভাঙিতে পারি ত খুব আনন্দের অনুভব আমাদের হইবে। তাহা হইলে দেহের দুঃখে মানুষ দুঃখী হইবে না। সে স্বাধীন হইবে। দেহ-রূপ এই বস্তু মানুষ জয় করিয়া লইলে তাহার উপর প্রভুত্ব চালাইবে কে? নিজের উপর যে রাজত্ব করে সে ত বিশ্বের সম্রাট্। আত্মার উপর হইতে দেহের প্রভুত্ব দূর কর। দেহের সুখদুঃখ ত বিদেশী; তাহা পরকীয়। আত্মার সহিত তাহার লেশমাত্রও সম্বন্ধ নাই।

এ সব সুখদুঃখ কতদূর পর্যন্ত দেহ হইতে পৃথক করা যায় ভগবান খৃস্টের উদাহরণ দিতে গিয়া তাহার আভাস দিয়াছি। দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হইতে থাকিলেও মনকে কিভাবে পূর্ণ শান্ত ও আনন্দময় রাখা যায় তাহা খৃস্ট দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এভাবে দেহকে আত্মা হইতে পৃথক করা এক দিকে যেমন বিবেকের কাজ, অন্যদিকে তেমন নিগ্রহেরও কাজ।

"বিবেকের সহিত বৈরাগ্যের বল"

তুকারাম এরূপ বলিয়াছেন। বিবেক, বৈরাগ্য দুই-ই দরকার। বৈরাগ্য মানে এক প্রকারের নিগ্রহ, তিতিক্ষা। এই অধ্যায়ে নিগ্রহের দিক দেখানো হইয়াছে। মাল্লারা নাও বায়। কিন্তু দিক নির্ণয়ের কাজ করে মাঝী। দাঁড়ী-

মাঝী দুই-ই দরকার। তদ্রূপ দেহের সুখ-দুঃখ হইতে আত্মাকে পৃথক করার ব্যাপারে বিবেক ও নিগ্রহ দুইয়েরই আবশ্যকতা আছে।

প্রকৃতি দেখিয়া বৈদ্য ঔষধের ব্যবস্থা করে। তদ্রূপ এই চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান বিবিধ প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া, পৃথক্করণ করিয়া কোথায় কোন রোগ জন্মিয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। প্রকৃতির যথাযথ বিভাগ এখানে করা হইয়াছে। রাজনীতি-শাস্ত্রে বিভাগের মস্ত সূত্র রহিয়াছে। সম্মুখে উপস্থিত শত্রুব্যূহে ভাগ ও ভেদ সৃষ্টি করিতে পারিলে শত্রুকে শীঘ্র পরাজয় করা যায়। ভগবান এখানে তাহাই করিয়াছেন।

আমার, আপনার, সকল জন্তুর, সকল চরাচরের প্রকৃতিতে তিন বস্তু রহিয়াছে। আয়ুর্বেদে যেমন কফ, পিত্ত, বাত এখানে তেমন সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণ প্রকৃতিতে ভরা রহিয়াছে। এই তিন বস্তুর মস্‌লায় সর্বত্র ভরা। কোথাও কম, কোথাও বেশী, ব্যবধান এই মাত্র। এই তিন হইতে যখন আত্মাকে পৃথক করিব তখনই দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করা যাইবে। দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করার উপায়, তিন গুণের পরীক্ষা করিয়া উহাদের জয় করিয়া লওয়া। নিগ্রহের দ্বারা একটির পর একটি বস্তু জয় করিতে করিতে মুখ্য বস্তুতে গিয়া পৌঁছিতে হইবে।

(৭৬)

প্রথমে তমোগুণ ধরা যাক। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় তমোগুণের অতি ভয়ানক পরিণাম দেখা যায়। এই তমোগুণের মুখ্য পরিণাম আলস্য। তাহা হইতে নিদ্রা ও প্রমাদের উৎপত্তি হয়। এই তিনকে জয় করিলে তমোগুণ জয় করা হইয়াছে বলা যাইবে। এ তিনের মধ্যে আলস্য মহা ভয়ংকর। অতি ভাল মানুষও এই আলস্যের ফলে নিকম্মা হইয়া যায়। এই রিপু সমাজের সুখ-শান্তি বিনাশ করে। বালক হইতে বৃদ্ধ সকলকেই ইহা নষ্ট করে। সকলকে এ শত্রু গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য সে অনুক্ষণ ওত পাতিয়া আছে। সুযোগ পাইতেই ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। দুই গ্রাস বেশী খাওয়া হইল ত তাহা শুইতে বাধ্য করে। একটু বেশী ঘুমাইলে ত আলস্য যেন চক্ষুতে ঘর বাঁধে। আলস্য

যতদিন নাশ না হইবে ততদিন সকল প্রযত্ন বৃথা। আলস্যের জন্য ত আমরা উদ্‌গ্রীব। খুব জোর কাজ করিয়া পয়সা একবার জমাইয়া লইতে পারিলেই হইল। বস্, তার পরে আরামে দিন চলিবে এই ত আমাদের মনের ভাব। বিস্তর পয়সা রোজগার মানে ভবিষ্যতের জন্য কুড়েমির পথ তৈরি করা। আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে বৃদ্ধাবস্থায় বিশ্রাম আবশ্যক। কিন্তু এ ধারণা ভুল। ঠিকমত চলিলে বুড়া হইলেও কাজ করিতে থাকিব। বরং অভিজ্ঞতার দরুন বৃদ্ধাবস্থায় অধিকতর উপযুক্ত হওয়ার কথা। আর তখনই বলি বিশ্রামের কথা!

আলস্য সুযোগ না পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নলরাজা এত মহৎ ছিলেন। পা ধোয়ার কালে একটুকু স্থান ধুইতে বাকী ছিল। সে সুযোগে কলি ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। নলরাজা ছিলেন শুদ্ধ, সব দিকে শুচি। কিন্তু দেহের সামান্য একটু স্থান অধৌত ছিল—এতটুকু আলস্য। বস্, যাইবে কোথায়! কলির প্রবেশ। আমাদের সবটা শরীরই ত উদলা। যে কোন স্থান দিয়া আলস্য প্রবেশ করিতে পারে। শরীরে আলস্য ধরিয়াছে কি মনোবুদ্ধিও জড় হইয়া গিয়াছে। আর এই আলস্যই আজিকার সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। এই আলস্য দূর করিতে পারিলে সকল দুঃখের না হইলেও অধিকাংশ দুঃখের অবসান করিতে পারিব।

সমাজ সংস্কারের কথা আজকাল যেখানে সেখানে শোনা যায়। সাধারণ লোকের জন্য কমপক্ষে কতটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা দরকার আর সে-জন্য সমাজ রচনার রূপ কিরূপ হওয়া চাই ইত্যাদির চর্চা চলিতেছে। এক দিকে অতীব সুখ ত আর এক দিকে অতীব দুঃখ। এক দিকে হিমালয় প্রমাণ ঐশ্বর্য, অপর দিকে প্রশান্ত মহাসাগর তুল্য অতল দারিদ্র্য। এই সামাজিক অসমতা দূর করার উপায় কি? সব রকমের প্রয়োজনীয় সুখ সহজে লাভ করার একটিই মাত্র পথ। তাহা হইতেছে আলস্য ত্যাগ করিয়া যে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত হওয়া। দুঃখের মূল কারণ আলস্য। সকলে যদি শারীরিক শ্রম করার ব্রত গ্রহণ করে তবে এই দুঃখ দূর হইয়া যাইবে।

কিন্তু সমাজে আজ কি দেখা যায়? এক দিকে জং ধরিয়া ধরিয়া

মানুষ অকেজো হইতেছে। মরচেতে ধনীদের অবয়ব খাইতেছে। শরীরের ব্যবহার নাই। অপর দিকে বহু লোককে এত কাজ করিতে হয় যে তাহাদের দেহ শুকাইতে শুকাইতে পাত হইয়া যাইতেছে। সমাজের সর্বত্র শারীরিক শ্রম এড়াইবার প্রবৃত্তি। মরিতে মরিতে যাহাদের কাজ করিতে হয় খুশি মনে তাহারা তাহা করে না। উপায় নাই তাই করে। বুদ্ধিমান লোকেরা শ্রম এড়াইবার নানা ফিকির-ফন্দি বহির করে। কেহ কেহ বলে, "ব্যর্থ শরীরশ্রমে সময় নষ্ট করব কেন?" কিন্তু একথা কেহ বলে না, "বৃথা ঘুমাও কেন? আহারে সময় নষ্ট কর কেন?" ক্ষুধা লাগে তাই খাই। ঘুম পায় তাই ঘুমাই। কিন্তু শারীরিক শ্রমের কথা উঠিলেই বলি, "এতে বৃথা সময় নষ্ট কেন করব? শরীরশ্রম কেন করব? মানসিক কার্য ত করে আসছি।" উত্তম, মানসিক শ্রম করেন ত মানসিক খাদ্যই খান আর মানসিক নিদ্রাই যান। মনোময় আহার ও মনোময় নিদ্রার ব্যবস্থা করুন।

এরূপে সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একদিকে লোকে অতিশ্রমে মরে, অপরদিকে লোকে তৃণটি পর্যন্ত আলগায় না। কোন বন্ধু আমায় বলিয়াছিল, "কিছু মুণ্ড আর কিছু ধড়।" এক দিকে কেবল ধড়, আর এক দিকে কেবল মুণ্ড। ধড় শুধু ক্ষয় হয়, মুণ্ড শুধু চিন্তা করে। এভাবে সমাজ রাহু-কেতু, ধড়-মুণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সত্যসত্যই যদি কেবল মুণ্ড আর কেবল ধড় হইত তবে ত ভালই ছিল। সে অবস্থায় অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায় অনুসারে কোন ব্যবস্থা হইতে পারিত। অন্ধকে পঙ্গু রাস্তা দেখায়, পঙ্গুকে অন্ধ কাঁধে লয়। কিন্তু এই ধড় ও মুণ্ড তেমন পৃথক পিণ্ড নহে। প্রত্যেকেরই ধড় আছে আর মুণ্ডও আছে। সর্বত্র এই ধড়-মুণ্ডের মিলন। ইহার কি করা যায়? অতএব প্রত্যেকের আলস্য ত্যাগ করা চাই।

আলস্য ত্যাগের অর্থ শরীর শ্রম করা। আলস্য জয়ের ইহাই উপায়। এই উপায়ের আশ্রয় না লইলে প্রকৃতির সাজা ভুগিতেই হইবে। রোগেই ভুগুন কি অন্যভাবে, ভুগিতেই হইবে। সাজা না ভুগিয়া নিস্তার নাই। দেহ যখন পাইয়াছি তখন শ্রম করিতেই হইবে। শরীর শ্রমে যে সময় যায় তাহা বৃথা যায় না। প্রতিদান মেলে। স্বাস্থ্য ভাল হয়। বুদ্ধি

সতেজ, তীব্র, শুদ্ধ হয়। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তায় পেট-ব্যথার, মাথা-ধরার স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা যদি রৌদ্রে, মুক্ত হাওয়ায়, প্রকৃতির কোলে মেহনত করেন তবে তাঁহাদের চিন্তা সতেজ হইবে। শারীরিক রোগের প্রভাব যেমন মনের উপর পড়ে তেমন শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রভাবও মাথার উপর পড়ে। ইহা অভিজ্ঞতালব্ধ কথা। ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইয়া কার্শিয়াং পাহাড়ে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য বা আর কোন জায়গায় সূর্যরশ্মি গায়ে লাগাইবার জন্য যাওয়ার আগে খোলা জায়গায় কোদাল দিয়া মাটি কোপাইলে, বাগানে জল দিলে, লাকড়ি চিরিলে ক্ষতি কি?

(৭৭)

আলস্য জয় এক কথা। দ্বিতীয় কথা হইতেছে নিদ্রা। নিদ্রা বস্তুত পবিত্র বস্তু। সেবা করিয়া ক্লান্ত দেহে সাধুসন্তেরা নিদ্রা যান। এই নিদ্রা যোগই বটে! মহাভাগ্যবান লোকদেরই এরূপ শান্ত গাঢ় নিদ্রা হয়। নিদ্রা গভীর গাঢ় হওয়া চাই। নিদ্রার গুরুত্ব নিদ্রার দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে নয়। বিছানা কত লম্বা আর তাহাতে মানুষ কত সময় পড়িয়া থাকে তাহা নিদ্রার নিয়ামক নহে। কূয়া যত গভীর, উহার জল তত পরিষ্কার ও মধুর। তদ্রূপ অল্প সময়ের গভীর নিদ্রায়ও উত্তম কাজ হয়। মনোযোগ সহকারে আধঘণ্টা পড়া, চঞ্চল চিত্তে তিন ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষা অধিক ফলদায়ী। ঘুমের কথায়ও তাহাই। দীর্ঘ হইলেই যে ঘুম ভাল হইল তাহা নয়। রোগী চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া থাকে। বিছানার সঙ্গে তাহার নিরন্তর সংযোগ, কিন্তু ঘুমের দেখা নাই। স্বপ্নবিহীন গাঢ় নিদ্রা যথার্থ নিদ্রা। যম-যাতনা ত আছেই। কিন্তু নিদ্রা যাহার আসে না, আর আসিলেও দুঃস্বপ্নে ভরা তাহার যম-যাতনার কথা না বলাই ভাল। ত্রস্ত হইয়া ঋষি বলিতেছেন ঃ

"পরা দুঃস্বপ্ন্যং সুব"

"এরূপ দুষ্ট নিদ্রা আমি চাই না, চাই না।" নিদ্রা ত বিশ্রামের জন্য। কিন্তু নিদ্রাতেও যদি নানা স্বপ্ন, নানা চিন্তা আসিয়া জুটে ত বিশ্রাম কোথায়?

গাঢ় ও গভীর নিদ্রা লাভের উপায়? আলস্যের কথায় যাহা বলা

হইয়াছে এ স্থলেও তাহা প্রয়োজ্য। দেহ অনুক্ষণ খাটাইতে হইবে। বিছানায় পড়া মাত্র যেন মরার মত ঘুম আসে। নিদ্রা ত ছোটখাট মৃত্যু। এমন মধুর মৃত্যুর জন্য দিনমানে আগেই উত্তমরূপে প্রস্তুত হওয়া চাই। শ্রমে শরীর বিবশ হওয়া চাই। ইংরেজ কবি শেক্সপিঅর বলিয়াছেন, "রাজার মাথার ওপরে মুকুট, কিন্তু ভিতরে চিন্তা।" ঐ রাজার ত ঘুম আসে না। তার এক কারণ, শারীরিক শ্রম করে না। জাগ্রত অবস্থায় যে ঘুমায় ঘুমন্ত অবস্থায় সে জাগিয়া থাকে। দিনের বেলা বুদ্ধি ও শরীরের চালনা না করা নিদ্রা যাওয়ারই শামিল। পরে নিদ্রাকালে বুদ্ধি চিন্তার পাকে ঘুরিতে থাকে আর শরীর যথার্থ নিদ্রা হইতে বঞ্চিত হয়। ফলে দীর্ঘ সময় শুইয়া থাকে। যে জীবনে পরম পুরুষার্থ সাধন করিতে হইবে নিদ্রা যদি সে জীবন গ্রাস করে তবে পুরুষার্থ সাধনের সুযোগ আর কোথা হইতে আসিবে? নিদ্রাতেই যদি অর্ধেক জীবন চলিয়া যায় তবে কি আর মিলিতে পারে?

বিস্তর সময় নিদ্রায় চলিয়া গেলে তমোগুণের তৃতীয় দোষ 'প্রমাদ' আপনা হইতেই আসিয়া যায়। নিদ্রালু মানুষের চিত্ত দক্ষ ও সজাগ হইতেই পারে না। অনবধানতা জন্মে। নিদ্রা হইতে আলস্যের আর আলস্য হইতে বিস্মৃতির উদ্ভব হয়। বিস্মরণ পরমার্থের পক্ষে হানিকর। ব্যবহারিক জীবনেও তাহা ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে বিস্মরণ ত এক স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। বিস্মরণ যে বিশ্রী দোষ এ কথাটা পর্যন্ত লোকের কাছে ধরা পড়ে না। কাহারও সহিত সাক্ষাতের কথা, কিন্তু সাক্ষাৎ করিতে যায় না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "ভুলে গেছিলাম ভাই।" মস্ত যে একটা অন্যায় করিয়াছে এ বোধটাও তার নাই। যাকে বলা হয় সেও সন্তুষ্ট হয়। লোকে এক প্রকার ধরিয়াই লইয়াছে যে ভুলিয়া যাওয়ার কোন প্রতিকার নাই। কিন্তু এই অনবধানতা কি পরমার্থ কি প্রপঞ্চ উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক। বিস্মরণ এক বিষম ব্যাধি। তার ফলে বুদ্ধিতে ঘুণ ধরে, জীবন ফোঁপরা নিঃসাড় হইয়া যায়।

বিস্মরণের হেতু মনে আলস্য জন্মে। জাগ্রত মন ভুল করে না। ঘুমন্ত মন বিস্মরণের ব্যাধিতে ক্লিষ্ট না হইয়া যায় না। তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন :

"পমাদো মচ্চুনো পদং"

বিস্মরণ মানেই মৃত্যু। এই প্রমাদ জয় করিবার জন্য আলস্য ও নিদ্রা জয় করুন। শরীর শ্রম করুন। সতত সাবধান থাকুন। যে কাজ করিতে হইবে বিচারপূর্বক করুন। যে কাজই হউক বিনা বিচারে করিতে নাই। কর্মের আগে বিচার, পরে বিচার। আগেপাছে সর্বত্র বিচার-রূপী ভগবান যেন দণ্ডায়মান থাকেন। যখন এই ভাব স্বভাবে পরিণত হইবে তখন অনবধানতা রোগ দূর হইয়া যাইবে। সকল সময়ের জন্য কর্তব্য ঠিক ঠিক নির্দিষ্ট করিয়া রাখুন। প্রতিক্ষণের হিসাব রাখুন। তাহা হইলে আলস্য প্রবেশের পথ পাইবে না। এই ভাবে সকল তমোগুণ জয় করার প্রযত্ন করিতে হইবে।

(৭৮)

তারপরে রজোগুণের ব্যূহ রচনা করিতে হইবে। রজোগুণ এক ভয়ানক শত্রু। তমোগুণেরই অপর দিক। এই দুইটিকে পর্যায়বাচী শব্দ বলাই ঠিক হইবে। খুব ঘুমানোর পরে শরীর দৌড়-ঝাঁপ করিতে লাগিয়া যায়। আর অনেক দৌড়-ঝাঁপ করার পরে শরীর বিছানা লইতে চায়। তমোগুণ হইতে রজোগুণ আর রজোগুণ হইতে তমোগুণ আসে। এক আসে ত অপর তার পিছু পিছু হাঁটে। রুটি সেকার মত ব্যাপার। রুটির একদিকে আগুন, অন্যদিকে জ্বলন্ত অঙ্গার। মানুষেরও তদ্রূপ। তার আগেপাছে রজোগুণ তমোগুণ লাগিয়াই থাকে। রজোগুণ বলে, "এদিকে এসো, তোমায় তমোগুণের দিকে এগিয়ে দিচ্ছি।" তমোগুণ বলে, "আমার কাছে এসো, আমি রজোগুণের দিকে তোমায় ঠেলে দিচ্ছি।" এভাবে এই রজোগুণ ও তমোগুণ একে অন্যের সহায় হইয়া মানুষকে নাশ করিয়া ফেলে। ফুটবলের জন্ম হয় লাথি খাওয়ার জন্য, তদ্রূপ রজোগুণ ও তমোগুণের লাথি খাইতে খাইতেই মানুষের জীবন যায়।

রজোগুণের প্রধান লক্ষণ হইতেছে নানা প্রকারের কার্য করার বাসনা, অজস্র কর্মের অপার আসক্তি। রজোগুণের দরুন অগণিত কর্মসঙ্গ আসিয়া জুটে। লোভাত্মক কর্মাসক্তি উৎপন্ন হয়। তখন বাসনা বিকারের

বেগ সম্বরণ করা অসম্ভব হয়। এখানকার পাহাড় ওখানে লইয়া যাইয়া ওখানকার গহ্বর ভরিয়া ফেলার ইচ্ছা হয়। সমুদ্রে মাটি ফেলিয়া সমুদ্র ভরার আর সাহারা মরুভূমিতে জল ঢালিয়া উহাকে সমুদ্র করার প্রেরণা জন্মে। এদিকে সুয়েজখাল খনন করা হইতেছে, আর ওদিকে পানামা, এইরূপ ধুমধড়াক্কা আরম্ভ হইয়া যায়। এখানে ভাঙ্গ, ওখানে গড়। শিশু কাগজের টুকরা লয়, তাহা ফাড়ে, আবার তা দিয়া কিছু বানায়ও। ইহাও তদ্রূপ। ইহা উহাতে মিশাও, আর উহা ইহাতে। ইহা ডুবাও, উহা উঠাও, এইরূপই রজোগুণের অনন্ত খেলা। পক্ষী আকাশে ওড়ে, আমাদের ওড়া চাই। মাছ জলে থাকে, ডুবো-জাহাজ বানাইয়া আমাদেরও জলে বিচরণ না করিলে চলে কি? এইভাবে, নরদেহে আসিয়া পশু-পক্ষীর সমান হইয়া আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করি। অপর দেহে প্রবেশ করার, অপর দেহের রহস্য অনুভব করার বাসনা এই নরদেহে তাহার হয়। কাহারও বা মনোবাসনা মঙ্গল গ্রহে যাইবে, তথাকার অধিবাসীদের দেখিবে। চিত্ত অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতে থাকে। নানা বাসনার ভূত যেন আমাদের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে। যেখানে যে আছে সেখানে থাকাটা ভাল লাগে না। ওলট-পালট হওয়া চাই, আমি এতবড় মনুষ্যজীব, আমি থাকিতে জগত পূর্বের মতই চলিবে তাও কি হয়। এ যেন পালোয়ানের অঙ্গ হইতে উপচিয়া পড়া শক্তি। তাহা হজম করার জন্য সে কখনও দেয়ালে টক্কর দেয় ত কখনও গাছে ধাক্কা মারে। রজোগুণের উচ্ছ্বাসও তদ্রূপ। এইরূপ নিশপিশানির বশে পৃথ্বী খনন করিয়া সে কিছু পাথর বাহির করে ও উহাদের হীরা, মানিক ইত্যাদি নাম দেয়। তেমনি উৎসাহভরে সে সমুদ্রে ডুব মারে এবং তলাকার জঞ্জাল, আবর্জনা তুলিয়া আনে। আর তাদের নাম দেয় মোতি। কিন্তু ঐ মোতিতে ছিদ্র থাকে না। তাই উহাতে ছিদ্র বানায়। কিন্তু সে মোতি কোথায় পরা যায়? নাকে কানে ছিদ্র করার জন্য সে স্বর্ণকারের শরণ লয়। মানুষ এসব কি করে! এই সবই রজোগুণের প্রভাব।

রজোগুণের দ্বিতীয় পরিণাম এই যে মানুষে স্থিরতা থাকে না। রজোগুণের হাতে হাতে ফল চাই। একটু বাধাবিঘ্ন আসিতেই সে আশ্রিত পথ ছাড়িয়া দেয়। রজোগুণী মানুষ এটা ছাড়ে, ওটা ধরে। এই ভাবে তাহার

ধরা-ছাড়া চলিতে থাকে। নিত্য নূতন তাহার বাছাই। ইহার পরিণাম শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে তার হাতে কিছুই লাগে না।

"রাজসং চলমধ্রুবম্"

রজোগুণের কর্মমাত্রই চঞ্চল ও অনিশ্চিত। ছোট ছেলে-মেয়েরা ধান বোনে আর সঙ্গে সঙ্গেই উঠাইয়া দেখে। রজোগুণী মনুষ্যের অবস্থাও তাই। ঝটপট সবকিছু তাহার কোঁচড়ে আসা চাই। সে অধীর হইয়া উঠে। তাহার সংযম থাকে না। কোথাও শিকড় গাড়িতে সে জানে না, এখানে একটু কাজ করিল, তথায় কিছু প্রসিদ্ধি হইল কি চলিল অন্য কোথাও। আজ মাদ্রাজে মানপত্র, কাল কলিকাতায়, পরশ্ব বোম্বাই-নাগপুরে। যত মিউনিসিপ্যালিটি তত দানপত্র পাওয়া চাই, এইরূপই তাহার লালসা! মানই একমাত্র বস্তু যাহা সে দেখে। এক জায়গায় স্থির হইয়া কাজ করার অভ্যাস তার নাই। তার ফলে রজোগুণী মানুষের অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া থাকে।

রজোগুণের কারণে মানুষ নানা ব্যাপারে অনধিকার হস্তক্ষেপ করে, স্বধর্ম বলিয়া তাহার কিছু থাকে না। বস্তুত স্বধর্মাচরণ বলিতে অন্য নানা কর্ম ত্যাগ করা বুঝায়। গীতার কর্মযোগ রজোগুণের অব্যর্থ ঔষধ। রজোগুণে সব কিছু চঞ্চল। পর্বতের চূড়ায় পতিত জল যদি নানা দিকে বহিয়া যায় ত কোথাও জমে না, সবটাই বিফলে যায়। কিন্তু সেই জলের সবটা যদি একদিকে বহে ত আগে গিয়া নদী হইয়া যাইবে, তাহা হইতে শক্তি উৎপন্ন হইবে, দেশের লাভ হইবে। তদ্রূপ মনুষ্য যদি নিজের সমস্ত শক্তি নানা কার্যে না লাগাইয়া একই কার্যে ব্যবস্থাপূর্বক নিয়োগ করে তবে তাহা দ্বারা কিছু কার্য হইবে। তাই ত স্বধর্মের মহত্ত্ব।

সতত স্বধর্মের চিন্তা করিয়া উহাতেই সকল শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। অপর কোন বিষয়ে নজর যাইতে না পায়, স্বধর্মের ইহাই পরীক্ষা। কর্মযোগ মানে অতি বা প্রচণ্ড কর্ম নহে। আর বহু কর্ম করাও কর্মযোগ নহে। গীতার কর্মযোগ ভিন্ন বস্তু। ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া একমাত্র স্বভাব-প্রাপ্ত অপরিহার্য স্বধর্ম পালন করা ও তদ্দ্বারা উত্তরোত্তর আত্মশুদ্ধি লাভ করা ইহাই কর্মযোগের বিশেষত্ব। এই সৃষ্টিতে কোন না

কোন প্রকারের কর্ম ত নিরন্তর চলিতেছেই। কর্মযোগ মানে বিশেষ মনোবৃত্তিতে সব কিছু করা। ক্ষেতে ধান বোনা, আর মুঠভরা ধান লইয়া যেমন-তেমন ছিটাইয়া দেওয়া, এ দুই কর্ম একান্তই ভিন্ন। এ দুইয়ের ব্যবধান অনেক। ধান বুনিয়া কতটা ফল পাওয়া যায়, আর ছিটাইয়া দিলে কতটা লোকসান হয় তাহা মানুষের জানা আছে। গীতা যে কর্মের কথা বলে তাহা বোনার মত। এরূপ স্বধর্মরূপ কর্তব্যে অপার শক্তি নিহিত। সেখানে সব শ্রম অপর্যাপ্ত। অতএব তাহাতে দৌড়-ঝাঁপ করার অবসর নাই।

(৭৯)

ভাল, এই স্বধর্ম নির্ণয়ের উপায় কি? এ প্রশ্নের সাফ্ উত্তর, "তাহা স্বাভাবিক।" স্বধর্ম সহজলব্ধ। তাহা খুঁজিবার কথাটাই অদ্ভুত লাগে। মনুষ্য জন্মে ত সঙ্গে তাহার স্বধর্মও জন্মে। শিশুর যেমন মাকে খুঁজিয়া লইতে হয় না, তদ্রূপ স্বধর্মও খুঁজিতে হয় না। আগে হইতেই তাহা প্রস্তুত থাকে। আমাদের জন্মের পূর্বেও দুনিয়া ছিল, পরেও থাকিবে। আমাদের আগেও মস্ত এক প্রবাহ ছিল আর পরেও এক প্রবাহ রহিয়াছে। এই প্রবাহে আমরা জন্মগ্রহণ করি। যে মা-বাপের ঘরে আমার জন্ম তাঁহাদের সেবা করা, যে প্রতিবেশীর মধ্যে জন্মিয়াছি তাঁহাদের সেবা করা, এ কর্তব্য ত প্রকৃতি হইতেই আমি পাইয়াছি। তা ছাড়া আমার বৃত্তি আমার অনুভবেরই প্রতিবিম্ব নয় কি? আমার ক্ষুধা লাগে, তৃষ্ণা পায়। সুতরাং ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়া ও তৃষ্ণার্তকে জলদান করা আমার প্রবাহ-প্রাপ্ত-ধর্ম। এ প্রকারের সেবারূপ, ভূতে দয়ারূপ স্বধর্ম আমাদের খুঁজিয়া লইতে হয় না। স্বধর্মের খোঁজ যেখানে চলে সেখানে বুঝিতে হইবে, কোনরূপ পরধর্ম অথবা অধর্ম নিশ্চয় চলিতেছে।

সেবককে সেবা খুঁজিতে হয় না। সেবা আপনা হইতেই তাহার কাছে আসে। কিন্তু একথা মনে রাখা চাই যে, অনায়াসপ্রাপ্ত ধর্ম সব সময়ই যে ধর্ম তাহা নয়। রাত্রিতে কোন কৃষক আমাকে বলিল, "চল, ঐ আলটা আমরা চার-পাঁচ হাত সরিয়ে দিই। আমার ক্ষেতের সীমা বেড়ে যাবে। বিনা ঝঞ্ঝাটে কাম চুকে যাবে।" এ কাজ করার কথা প্রতিবেশী আমাকে বলিল,

আর দেখিতে তাহা সহজপ্রাপ্তও বটে। কিন্তু তাহাতে অসত্যের আশ্রয় লওয়ার কথা আছে বলিয়া তাহা আমার কর্তব্য নয়।

চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা আমার ভাল লাগে। তার কারণ এই যে উহাতে স্বাভাবিকতা ও ধর্ম রহিয়াছে। এই স্বধর্ম ছাড়িলে কাজ চলে না। যে মা-বাপ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহারাই আমাদের মা-বাপ। তাঁহাদের আমার পছন্দ হয় না একথা কি বলা চলে? মা-বাপের পেশা স্বভাবতই পুত্রে বর্তায়। যে পেশা পূর্বাপর হইতে চলিয়া আসিয়াছে নীতিবিরুদ্ধ না হইলে তাহা করা, সেই বৃত্তি চালাইয়া যাওয়া চাতুর্বর্ণ্যের এক বড় বিশেষত্ব। চাতুর্বর্ণ্য আজ ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। আজ তাহা আচরণ করা কঠিন, কিন্তু তাহা যদি সুব্যবস্থিত করিয়া লওয়া যায় ত খুবই ভাল হইবে। আজ ত জীবনের প্রথম পঁচিশ-ত্রিশ বছর নূতন কাজ, নূতন পেশা শিখিতেই চলিয়া যায়। কাজ শেখার পরে মানুষ নিজ সেবাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র খোঁজে। এ ভাবে জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর শিক্ষায় ব্যয় হয় আর সে শিক্ষার জীবনের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। বলা হয়, সে ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। শিক্ষাকালে যেন তার জীবন থাকে না। জীবন আরম্ভ হয় পরে। লোকে বলে, প্রথমে শিক্ষা, তারপরে জীবন। জীবন ও শিক্ষা এই দুই জিনিষ যেন পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে। যেখানে বাঁচার কথা নাই তাকে মৃত্যুই বলিতে হইবে। ভারতে লোকের গড় আয়ু তেইশ বৎসর, আর পঁচিশ বৎসর এই প্রস্তুতিতে কাটিয়া যায়। এ ভাবে নূতন কাজ শিখিতেই দিন চলিয়া যায়। কাজের আরম্ভ আর তবে কখন হইবে। ফলে উদ্যমের সময়; গুরুত্বপূর্ণ বয়স বৃথাই চলিয়া যায়। যে উৎসাহ উদ্যম জনসেবায় নিয়োগ করিয়া দেহ সার্থক করার কথা, তাহা এ ভাবে ব্যর্থ যায়। জীবন খেলা নয়। তাহা হইলেও জীবনের কাজ খুঁজিতেই জীবনের মূল্যবান প্রথম ভাগ অতীত হইয়া যায়। ইহা দুঃখের কথা। এই জন্যেই হিন্দুধর্ম বর্ণধর্মের পথ বাহির করিয়াছিল।

কিন্তু চাতুর্বর্ণ্যের কথা যদি একপাশে ঠেলিয়াও ফেলা হয় তবুও সকল দেশে, সর্বত্র, যেখানে চাতুর্বর্ণ্য নাই সেখানেও লোকে স্বধর্ম প্রাপ্ত হয়। এই প্রবাহে কোন এক পরিস্থিতি সহ আমরা সবে জন্মিয়াছি। সেহেতু

স্বধর্মাচরণরূপ কর্তব্যও আপনা হইতেই পাই। অতএব দূরের কর্তব্য—মানে গৌণ কর্তব্য—যতই ভাল মনে হোক না কেন গ্রহণযোগ্য নহে। অধিকাংশ সময় দূরেরটা ভাল দেখায়। মনুষ্য দূরের মোহে মজে। যেখানে সে দণ্ডায়মান সেখানেও গাঢ় কুয়াশা। কিন্তু কাছের কুয়াশা সে দেখে না, দূরের কুয়াশার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলে, "কুয়াশা ওখানে কেমন ঘন।" আর ওখানকার মানুষ এ দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া ঠিক তেমনি বলে, "ওখানে কুয়াশা খুব গাঢ়।" কুয়াশা সর্বত্র। কিন্তু সামনেরটা চোখে পড়ে না। দূরের আকর্ষণে মানুষকে টানে। নিকটেরটা অবহেলায় কোণে পড়িয়া থাকে, আর আমরা স্বপ্ন দেখি দূরেকার। কিন্তু ইহা মোহ। তাহা দূর করা চাই। প্রাপ্তস্বধর্ম সাধারণ হইলেও, অপর্যাপ্ত হইলেও, নীরস লাগিলেও, প্রাপ্ত যাহা হইয়াছে তাহাই ভাল, তাহাই সুন্দর। সমুদ্রে যে ডুবিতেছে তাহার কাছে আঁকা-বাঁকা কাঠের কুঁদো যদি ভাসিয়া আসে, হোকনা তাহা অমসৃণ, অসুন্দর, তবু তাহা হয় তার জীবনরক্ষার অবলম্বন। ছুতারখানায় অনেক মসৃণ, নক্সাকাটা কুঁদো থাকে। কিন্তু তাহা ত কারখানায়। আর ঐ লোক ডুবিতেছে সমুদ্রে। ঐ অসুন্দর কাঠের কুঁদো যেমন তাহার তারক আর তাহা যেমন তাহার আশ্রয় করা উচিত, তেমনি যে সেবা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, গৌণ মনে হইলেও তাহাই আমার করণীয়। তাহাতে মগ্ন হইয়া থাকাই আমার পক্ষে শোভন। আমার উদ্ধারও তাহাতেই। অন্য সেবা খুঁজিতে যাই ত এটিও যাইবে আর ওটিও হাতছাড়া হইবে। তার ফলে সেবাবৃত্তি হইতেই আমাকে হাত ধুইয়া বসিতে হইবে। তাই স্বধর্মরূপ কর্তব্যে মগ্ন হওয়া চাই।

স্বধর্মে মগ্ন হইলে রজোগুণ ফিকা হইয়া যায়। কারণ চিত্ত একাগ্র হয়। স্বধর্ম ছাড়িয়া তাহা কোথাও যায় না। ফলে চঞ্চল রজোগুণের সকল জোর নিস্তেজ হইয়া যায়। শান্ত, গভীর নদীতে জল যতই বাড়ুক না কেন তাহা সে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়া লয়। স্বধর্মরূপ নদীও তেমন মানুষের সকল বল, সকল বেগ, সকল শক্তি হজম করিতে সক্ষম। স্বধর্মে যত শক্তিই নিয়োগ কর, তবু তাহা কম। স্বধর্মে সকল শক্তি নিয়োগ কর ত রজোগুণের দৌড়-ধাপ করার বৃত্তি লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইবে।

চঞ্চলতার হুল যেন ভাঙিগয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাই রজোগুণ জয়ের উপায়।

(৮০)

এখন বাকী আছে সত্ত্বগুণ। এখানে খুব সতর্কভাবে চলিতে হইবে। সত্ত্বগুণ হইতে কিরূপে আত্মা পৃথক করা যায়? ইহা সূক্ষ্ম বিচারের বিষয়। সত্ত্বগুণকে একেবারে নির্মূল করিতে নাই। রজ-তমকে নিঃশেষে শেষ করিতে হয়। কিন্তু সত্ত্বগুণের ভূমিকা কিছুটা স্বতন্ত্র। বড় ভিড় জমিলে আর তাহা ভাঙিগয়া দেওয়া দরকার হইলে সিপাহীদের হুকুম দেওয়া হয়, গুলি চালাও। কিন্তু দেখিও কোমরের উপরে নয়, পায়ের দিকে। তাতে লোকে মরে না, জখম হয়। তদ্রূপ সত্ত্বগুণকে জখম করিবে, মারিবে না। রজোগুণ ও তমোগুণ গেলে অবশিষ্ট থাকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ। যতদিন শরীর আছে, ততদিন কোন এক অবস্থায় ত থাকিতেই হইবে। রজ-তম চলিয়া গেলে যে সত্ত্বগুণ থাকে তাহা হইতে পৃথক হওয়ার অর্থ কি?

সত্ত্বগুণের অভিমান পাইয়া বসে। সেই অভিমান আত্মাকে শুদ্ধ-স্বরূপ হইতে নীচে টানিয়া নামায়। লণ্ঠন হইতে যদি পূর্ণ স্বচ্ছ আলো পাইতে চান ত উহার ভিতরের কালি পুছিয়া ফেলিতে হইবে। কালি ত পুছিয়া ফেলা হইল, কিন্তু কাচে যে ধুলা জমিয়া আছে তাহাও পুছিয়া ফেলা চাই। সেইরূপ আত্মার প্রভার আশে পাশে যে তমোগুণের কালি থাকে তাহা উত্তমরূপে দূর করা চাই। পরে রজোগুণের ধুলাও সাফ্ করিতে হইবে। তমোগুণ ধোয়া হইল, রজোগুণ সাফ্ করা হইল। এখন থাকিল শুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ কাচ। এই সত্ত্বগুণকেও দূর করার অর্থ কাচটাকেই ভাঙিগয়া ফেলা নয় কি? তা নয়। কাচ ভাঙিগয়া ফেলিলে আলোর সম্ভাবনাই ত গেল। আলোক রশ্মি বিকীরণ করার জন্য কাচ ত চাই-ই। এই শুদ্ধ চক্‌চকে কাচকে ত ভাঙগা নয়ই, চক্ষু ঝলসিয়া না যায় তন্নিমিত্ত ছোট একটু কাগজ আড়াল হিসাবে লাগাইয়া দিতে হইবে। দেখিতে হইবে চক্ষু ঝলসিয়া না যায়। সত্ত্বগুণ জয় করার অর্থ তজ্জনিত অভিমান দূর করা, তার আসক্তি ছাড়া। সত্ত্বগুণ হইতে কাজ ত লইতে হইবে, কিন্তু তাকে ঠিকমত বাঁচাইয়া। সত্ত্বগুণকে নিরহংকার করিতে হইবে।

এই সত্ত্বগুণের অহঙ্কার কিরূপে জয় করা যায়? তার উপায় একটি। সত্ত্বগুণকে আমাদের অন্তরে স্থির করিয়া লইতে হইবে। সাতত্যের দ্বারা সত্ত্বগুণের অভিমান দূর হয়। সত্ত্বগুণের কর্ম সতত আমাদের করিতে হইবে। তাহা স্বভাবে পরিণত করিতে হইবে। সত্ত্বগুণ আমাদের এখানে ক্ষণিকের মত আগত অতিথি যেন না থাকে, তাকে ঘরেরই করিয়া লইতে হইবে। মধ্যে-সধ্যে যে ক্রিয়া আমাদের দ্বারা হয় তৎসম্বন্ধে মনে অভিমান আসে। আমরা প্রতিদিন ঘুমাই। সেকথা অপরকে আমরা বলিতে যাই না। কিন্তু কোনও রোগীর পনের দিন ঘুম না হওয়ার পরে একটু ঘুম আসে ত সে সকলকে বলে, "কাল একটু ঘুমিয়েছি।" তাহার কাছে কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের উদাহরণ লওয়া ভাল হইবে। চব্বিশ ঘণ্টা আমরা শ্বাস লই। কিন্তু তাহা কাহাকেও আমরা বলি না। "আমি নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী প্রাণী" একথা কেহ বড়াই করিয়া বলে কি? হরিদ্বারে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত তৃণ পনর শত মাইল স্রোতে ভাসিয়া কলিকাতায় আসিয়া গিয়াছে বলিয়া গর্ব করে না। ঐ তৃণ সহজ স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কেহ যদি খরস্রোতের বিপরীত দিকে দশ হাত যায় ত কত বড়াই না সে করে। তাৎপর্য, যে বস্তু স্বাভাবিক তার বিষয়ে অহঙ্কার হয় না।

কোন ভাল কাজ করিলে আমরা অভিমান বোধ করি কেন? তার কারণ কাজটা সহজভাবে হয় নাই। শিশু কোন ভাল কাজ করিলে মা তার পিঠে হাত বুলায়। এমনি ত তার পিঠের আর মায়ের লাঠির পরিচয়ই ঘনিষ্ঠ। রাত্রির অন্ধকার আর সেই অন্ধকারে এক-আধটি জোনাকি। দেখুন তার গরিমার বহর। সবটা জ্যোতি সে এক সময়ে দেখায় না। জ্বলে, নিভে, আবার জ্বলে। আলো খোলে আর ঢাকে। তার আলো যদি সর্বক্ষণ থাকিত ত তার গৌরব থাকিত না। সাতত্যের কারণে বিশেষতার বোধ হয় না। তদ্রূপ সত্ত্বগুণ যদি সতত আমাদের কর্মে প্রকাশ পাইতে থাকে ত পরে তাহা আমাদের স্বভাবই হইয়া যাইবে। সিংহের শৌর্যের অভিমান নাই। শৌর্যের বোধই তার নাই। সেইরূপ সাত্ত্বিক বৃত্তিকে এত সহজ হইতে দাও যে, আমরা যে সাত্ত্বিক সেই বোধই যেন হইতে না পায়। আলোকদান

সূর্যের নৈসর্গিক ক্রিয়া, তার জন্য তাহার অভিমান নাই। সে জন্য সূর্যকে যদি মানপত্র দিতে যাও ত সে বলিবে, "আমি এতে বিশেষ কি করেছি? আমি আলো দিই এই ত? আলো দেওয়াই ত আমার জীবন। আলো না দিই ত আমি মরে যাব। আমি আর কিছু জানি না।" সূর্যের বেলায় যাহা, সাত্ত্বিক মানুষের বেলায়ও তাহা হওয়া চাই। সত্ত্বগুণ তাহার রোমে রোমে ব্যাপ্ত হওয়া চাই। সত্ত্বগুণের স্বভাব যখন এরূপ হয় তখন তার অহঙ্কার থাকে না। সত্ত্বগুণকে নিস্তেজ করার, সত্ত্বগুণ জয় করার এই এক উপায়।

আর এক উপায় হইতেছে সত্ত্বগুণের আসক্তি পর্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া। অহঙ্কার ও আসক্তি দুই পৃথক বস্তু। কথাটা একটু সূক্ষ্ম। দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজে বুঝা যাইবে। সত্ত্বগুণের অহঙ্কার চলিয়া গেলেও আসক্তি থাকিয়া যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের উদাহরণ নিন। শ্বাস-প্রশ্বাসের অভিমান নাই। কিন্তু উহাতে অত্যন্ত বেশী আসক্তি থাকে। বলুন, পাঁচ মিনিট শ্বাস লইও না, ত তাহা হইবার নয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের অভিমান নাকের না-ই বা থাকিল। তাহা হইলেও নাক অনুক্ষণ শ্বাস নেয়। সক্রেটিসের সম্বন্ধে এক মজার গল্প আছে। সক্রেটিসের নাক ছিল থেব্ড়া, লোকে তাঁহাকে দেখিয়া হাসিত। কিন্তু রসিক সক্রেটিস বলিতেন, "আমার নাকই সুন্দর। যে নাকের নাসারন্ধ্র বড় তা দিয়ে পুরো মাত্রায় হাওয়া নেওয়া যায়। তাই তা সুন্দর।" তাৎপর্য, নাকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অভিমান নাই, কিন্তু আসক্তি আছে। সত্ত্বগুণেরও এরূপ আসক্তি জন্মে। যথা ভূতে দয়া। এই গুণ অত্যন্ত দরকার। কিন্তু উহার আসক্তি হইতেও দূরে থাকার সামর্থ্য থাকা চাই। ভূতে দয়া চাই, কিন্তু উহার আসক্তি রাখিতে নাই।

সত্ত্বগুণ প্রভাবে সাধুব্যক্তি অন্যের পথপ্রদর্শক হন। ভূতে দয়া হেতু তাঁহার দেহ সার্বজনিক হইয়া যায়। মৌমাছিরা গুড় ঢাকিয়া ফেলে, তদ্রূপ সারা দুনিয়া সাধুকে ভালবাসার আবরণে আচ্ছাদিত করে। সাধুলোকে প্রেমের এতটা প্রকর্ষ হয় যে সমস্ত দুনিয়া তাঁহাদের ভালবাসে। সাধু নিজ আসক্তি ছাড়েন, কিন্তু সমস্ত জগতের আসক্তি তাঁহাতে আসিয়া জড় হয়। সমস্ত জগৎ তাঁহাদের দেহের ভাবনা ভাবিতে থাকে। কিন্তু এই আসক্তিও সাধুব্যক্তির দূর করা চাই। সংসারের এই যে প্রেম, এই যে মহান ফল তাহা

হইতে আত্মাকে পৃথক করা চাই। আমি বিশেষ কেহ এরূপ যেন কখনও তাঁহার মনে না হয়। সত্ত্বগুণকে এভাবে শরীরে পরিপাক করিয়া লইতে হইবে।

প্রথমে অহংকার জয় কর, পরে আসক্তি। সাতত্য দ্বারা অহংকার জয় করা যাইবে। ফলাসক্তি ছাড়িয়া সত্ত্বগুণ হইতে প্রাপ্ত ফলকেও ঈশ্বরার্পণ করিয়া আসক্তি জয় করা যায়। জীবনে যখন সত্ত্বগুণ স্থির হইয়া যায় তখন ফল কখনও সিদ্ধিরূপে কখনও বা কীর্তিরূপে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সে ফলকেও তুচ্ছজ্ঞান করিবে। আমগাছ একটি ফলও নিজে খায় না। সে ফল যতই লোভনীয় হউক, যতই সুমধুর হউক। ফল খাওয়া অপেক্ষা না খাওয়াই তার কাছে অধিক মধুর লাগে। উপভোগ অপেক্ষা ত্যাগ অধিকতর মধুর। জীবনের সকল পুণ্যফলে প্রাপ্ত স্বর্গ-সুখরূপ এত বড় যে ফল তাহাও অন্তে ধর্মরাজ পায়ে ঠেলিলেন। জীবনের সকল ত্যাগের উপর তিনি মুকুট স্থাপন করিলেন। সেই মধুর ফল আস্বাদে তাঁহার অধিকার ছিল। কিন্তু তাহা যদি তিনি আস্বাদ করিতেন ত শেষ হইয়া যাইত। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্য লোকং বিশন্তি" এই চক্রে পুনরায় তিনি পড়িতেন। ধর্মরাজের এই ত্যাগ কীদৃশ! তাহা সদাই আমার চক্ষুর সামনে দণ্ডায়মান। এইভাবে সত্ত্বগুণের সতত আচরণ করিয়া উহার অহংকার জয় করিয়া লইতে হইবে। নির্লিপ্ত থাকিয়া সকল ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া উহার আসক্তি হইতে বাঁচিতে হইবে। তখন বলা চলিবে যে সত্ত্বগুণ জয় করা গিয়াছে।

(৮১)

এবার শেষ কথায় আসি। আপনি সত্ত্বগুণী হইয়াছেন। অহংকার জয় করিয়াছেন, ফলাসক্তি ছাড়িয়াছেন। সবই ঠিক। তবুও যতদিন এই শরীর আছে ততদিন মধ্যে মধ্যে রজ-তমের আক্রমণ চলিতেই থাকিবে। কিছু কালের জন্য মনে হইতে পারে যে এইসব গুণ জয় করিয়া লইয়াছি। কিন্তু তাহারা আবার সবেগে আসিবে। তাই সতত জাগ্রত থাকা চাই। সমুদ্রের জল বেগে ভিতরে প্রবেশ করিয়া যেমন খাড়ি সৃষ্টি করে, তেমনি রজ-তমের

প্রবল প্রবাহ মনোভূমিতে প্রবেশ করিয়া খাড়ি তৈরী করে। অতএব সামান্য ছিদ্রও রাখিবেন না। শক্ত পাহারার ব্যবস্থা করুন। এবং যতই সতর্কতা অবলম্বন করেন না কেন যতদিন আত্মজ্ঞান না হইবে, আত্মদর্শন না হইবে, ততদিন ভয় আছে। অতএব সব কিছুই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য করিবেন।

কেবল জাগৃতির প্রচেষ্টার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইবার নহে। তবে কিভাবে হইবে? অভ্যাসের দ্বারা হইবে? না। এক উপায় আছে। তাহা হইতেছে, "শুদ্ধ হৃদয়ে, আন্তরিক আকুলতা সহকারে ভগবানে ভক্তি।" রজ, তম এই দুই গুণ জয় করিলেন। সত্ত্বগুণকে স্থির করিয়া উহার ফলাসক্তিও জয় করিয়া লইলেন। কিন্তু তাহাতেই চুকিয়া গেল তাহা নয়। যে পর্যন্ত আত্মজ্ঞান না হইবে সে পর্যন্ত নিষ্কৃতি নাই। অতএব অন্তে ভগবৎ কৃপা চাই-ই। যথার্থ আন্তরিক ভক্তি দ্বারা তাঁহার কৃপাপাত্র হইতে হইবে। ইহা ছাড়া আমি অন্য উপায় দেখি না। এই অধ্যায়ের অন্তে অর্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন। আর তার উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন, "একান্ত একাগ্রমনে, নিষ্কামভাবে আমায় ভক্তি কর, আমার সেবা কর। যে এরূপ সেবা করে সে এ মায়ার ওপারে যেতে সক্ষম হয়। অন্যথায় এ গহন মায়া পার হওয়া যায় না।" ভক্তির ইহা সোজা উপায়। ইহাই একমাত্র পথ।

রবিবার ২২-৫-৩২

পঞ্চদশ অধ্যায়

(৮২)

বন্ধুগণ,

আজ এক অর্থে আমরা গীতার শেষ সীমায় আসিয়া গিয়াছি। পঞ্চদশ অধ্যায়ে সকল বিচার পরিপূর্ণ হইয়াছে। ষোড়শ-সপ্তদশ অধ্যায় পরিশিষ্ট-স্বরূপ আর অষ্টাদশ অধ্যায় উপসংহার। তাই ভগবান এই অধ্যায়ের অন্তে এই অধ্যায়কে শাস্ত্র সংজ্ঞা দিয়াছেন।

"এ শাস্ত্র তোমায় বলেছি নির্মল অতি নিগূঢ়"

অন্তে ভগবান এরূপ বলিয়াছেন। ভগবান এরূপ যে বলিলেন তাহা এই অধ্যায় অন্তিম অধ্যায় বলিয়া নয়, বরং এ পর্যন্ত জীবনের যে শাস্ত্র, যে সিদ্ধান্ত নির্দেশ করিয়াছেন এই অধ্যায়ে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাই। এই অধ্যায়ে পরমার্থ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বেদের সকল সার ইহাতে আসিয়া গিয়াছে। মানুষে পরমার্থের চেতনা সঞ্চার করা বেদের কার্য। তাহা এই অধ্যায়ে আছে বলিয়া 'বেদের সার' এই গৌরবপূর্ণ পদবী ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া দেখার আবশ্যকতা কথিত হইয়াছে। তৎসম্পর্কীয় প্রযত্নবাদের কিছুটা বিচার-বিশ্লেষণ চতুর্দশ অধ্যায়ে করিয়াছি। রজোগুণ ও তমোগুণ নিগ্রহপূর্বক ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণের বিকাশ করিয়া তাহার আসক্তি জয় করিতে হইবে, তাহার ফল ত্যাগ করিতে হইবে। এভাবে প্রযত্ন জারি রাখিতে হইবে। অবশেষে বলা হইয়াছে, এসব প্রযত্নের পূর্ণ সাফল্যের জন্য আত্মজ্ঞান চাই। ভক্তি ছাড়া আত্মজ্ঞান লাভ হয় না।

কিন্তু ভক্তিমার্গ প্রযত্নমার্গ হইতে যে আলাদা নহে তাহা বলার জন্য পঞ্চদশ অধ্যায়ের আরম্ভেই সংসারকে এক মহান বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই বৃক্ষে ত্রিগুণে পোষিত প্রচণ্ড প্রচণ্ড শাখা রহিয়াছে। অনাসক্তি ও বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা এই বৃক্ষ ছেদন করিতে হইবে সুরুতেই ইহা বলা হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে পূর্ব অধ্যায়ে যে সাধনমার্গের কথা বলা হইয়াছে এখানে আরম্ভেই তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। রজ-তমকে

মারিতে ও পুষ্টি দ্বারা সত্ত্বগুণের বিকাশ করিতে হইবে। এক কাজ বিনাশক, আর এক বিধায়ক। দুইয়ে মিলিয়া একই মার্গ। ঘাস কাটা আর বীজ বোনা এই দুই একই ক্রিয়ার দুই অংগ। ইহাও তদ্রূপ। রামায়ণে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ তিন ভাই। কুম্ভকর্ণ তমোগুণ, রাবণ রজোগুণ, বিভীষণ সত্ত্বগুণ। আমাদের শরীরে এই তিনের রামায়ণ রচনা চলিতেছে। এই রামায়ণে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের নাশই বিহিত। থাকিল বাকী বিভীষণ-তত্ত্ব। তাহা যদি হরিচরণাশ্রয়ী হয় তবে তাহা উন্নতির সাধক ও পোষক হইতে পারে। তখন তাহা গ্রহণীয়। চতুর্দশ অধ্যায়ে ইহা আমরা দেখিয়াছি। পঞ্চদশ অধ্যায়ের আরম্ভে পুনরায় তাহা উপস্থিত করা হইয়াছে। সত্ত্ব-রজ-তমে ভরা সংসারকে অসংগরূপ অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেল। রজ-তমের নিরোধ কর। সত্ত্বগুণের বিকাশ করিয়া পবিত্র হও, তাহার আসক্তি জয় করিয়া অলিপ্ত থাক, কমলের এই আদর্শ ভগবদ্‌গীতা ধরিতেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে জীবনের আদর্শ বস্তুর, সর্বোত্তম বস্তুর উপমা কমলের সহিত করা হইয়াছে। কমল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক। সর্বোত্তম চিন্তা প্রকাশের চিহ্ন কমল। কমল নির্মল ও পবিত্র হইয়াও অলিপ্ত। পবিত্রতা ও অলিপ্ততা এই দ্বিবিধ গুণ কমলে বর্তমান। ভগবানের বিভিন্ন অবয়বের উপমা কমল। নেত্রকমল, পদকমল, করকমল, মুখকমল, নাভিকমল, হৃদয়কমল, শিরঃকমল : যেখানে সৌন্দর্য ও পবিত্রতা সেখানেই অলিপ্ততা একথাই দেখানো হইয়াছে, আমাদের মনে অংকিত করা হইয়াছে।

পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত সাধনাকে পূর্ণাংগ করার জন্য এই অধ্যায়। প্রযত্নের সহিত ভক্তি ও আত্মজ্ঞান মিলিত হইলে পূর্ণতা আসে। ভক্তি প্রযত্নমার্গেরই এক ভাগ। আত্মজ্ঞান ও ভক্তি ঐ সাধনারই অংগ। ঋষি বেদে বলিতেছেন :

"যো জাগার তং ঋচঃ কাময়ন্তে
যো জাগার তমু সামানি যান্তি"

"যে জাগ্রত বেদ তাহাকে ভালবাসে, তাহার সহিত দেখা করিতে আসে।" অর্থাৎ যে জাগ্রত বেদনারায়ণ তাহার কাছে আসে। তাহার কাছে জ্ঞান

আসে, ভক্তি আসে। প্রযত্নমার্গ হইতে ভক্তি ও জ্ঞান ভিন্ন নহে। এই দুই তত্ত্ব প্রযত্নে মাধুর্য আনিয়া দেয়, একথাই এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ভক্তি-জ্ঞানের এই স্বরূপ একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করুন।

(৮৩)

জীবন টুকরা টুকরা করিতে পারি না। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এগুলি আমি পৃথক করিতে পারি না আর পৃথক তাহারা নয়ও। উদাহরণার্থ এই জেলের রান্নার কাজ ধরুন। পাঁচ-সাত শত লোকের রান্নার কাজ আমাদের কিছু লোকে নির্বাহ করে। রান্নার জ্ঞান ঠিক মত নাই এমন লোক যদি রান্না করিতে যায় তবে রান্না বিশ্রী হইবে। রুটি হয় কাঁচা থাকিবে নয় পুড়িয়া যাইবে। ধরিয়া লউন সে ভাল রাঁধিতে জানে। কিন্তু তাহার হৃদয়ে ঐ কর্মের প্রতি যদি আদর না থাকে, ভক্তিভাব না থাকে, আমার ভাই-বন্ধুরা তথা নারায়ণ এ রুটি খাইবেন অতএব যত ভাল করিয়া পুরি বানাইব এই প্রেরণা, ইহা প্রভুসেবা এই ভাব যদি তাহার মনে না থাকে ত রসুইয়ের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে এ কাজের অনুপযুক্ত। এই রান্নার কাজে জ্ঞান যেমন চাই, প্রেমও তেমন চাই। ভক্তিতত্ত্বের রস হৃদয়ে না থাকিলে রান্না সরস হইবার নয়। তাই মা ছাড়া এ কাজ ঠিক ঠিক হয় না। মা ছাড়া এ কাজ আর কে এমন মন দিয়া, প্রেম ঢালিয়া করিবে? তাহা ছাড়া এ কাজের জন্য তপস্যা চাই। তাপ সহ্য করা ছাড়া, কষ্ট ছাড়া এ কাজ কি করিয়া হইবে? অর্থাৎ দেখা যাইতেছে, যে কোন কার্যে প্রেম, জ্ঞান ও কর্ম এই তিন বস্তু চাই। জীবনের সকল কর্ম এই তিন গুণে প্রতিষ্ঠিত। এ যেন তেপায়া। এক পা গিয়াছে ত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। তিন পা চাই। তাহার নামেই তাহার স্বরূপের প্রকাশ। জীবনের কথায়ও তাহাই। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম, অর্থাৎ শ্রম-সাতত্য, এই হইতেছে জীবনের তিন পায়া। এই তিন স্তম্ভের উপর জীবন-দ্বারকা খাড়া করিতে হইবে। এই তিন পা মিলিয়া একই বস্তু হয়। তেপায়ার দৃষ্টান্ত অক্ষরে অক্ষরে খাটে। তর্ক দ্বারা ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম আলাদা আলাদা করিতে পারেন। কিন্তু বস্তুত তাহাদের আলাদা করা যায় না। তিনে মিলিয়া এক বিশাল বস্তু হয়।

তাহা হইলেও ভক্তির বিশেষ গুণ নাই এরূপ নহে। যে কোন কর্মে ভক্তিতত্ত্বের সংযোগ হইলে তাহা সহজ মনে হইবে। সহজ মনে হওয়ার অর্থ এই নয় যে কষ্ট হইবে না। কিন্তু সে কষ্ট কষ্ট মনে হইবে না। কষ্ট আনন্দরূপ মনে হইবে। শূল তখন ফুল মনে হইবে। ভক্তিমার্গ সহজ একথার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই যে ভক্তির কারণে কর্ম বোঝা মনে হইবে না। কর্মের কঠিনতা চলিয়া যাইবে। যতই কাজ কর না কেন মনে হইবে কিছুই যেন কর নাই। ভগবান খৃস্ট এক জায়গায় বলিয়াছেন, "উপবাস করবে ত দেখ উপবাসের ক্লান্তি যেন দেহে দেখা না যায়। চন্দন চর্চা করিলে গাল যেমন প্রফুল্ল দেখায়, সারা অঙ্গ তেমন স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল দেখানো চাই। উপবাসে কষ্ট হচ্ছে এরূপ যেন না হয়।" সারাংশ, বৃত্তি এরূপ ভক্তিময় হওয়া চাই যে কষ্টের কথা মনেই না হয়। আমরা বলিয়া থাকি যে অমুক দেশপ্রেমিক বীর হাসিমুখে ফাঁসি গিয়াছে। সুধন্বা তৈলের কড়ায় হাসিতেছিল, মুখে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি, গোবিন্দ বলিতেছিল। ইহার অর্থ এই যে ভয়ানক অসহ্য কষ্ট হইলেও ভক্তিপ্রভাবে তাহা আদৌ টের পাওয়া যায় না। জলে নৌকা বাওয়া শক্ত নয়। কিন্তু তাহা যদি মাটি বা পাথরের উপর দিয়া টানিয়া নিতে হয় ত কতই না পরিশ্রম হয়। নৌকার নীচে জল থাকে ত সহজে আমরা পার হইয়া যাইতে পারি। তদ্রূপ আমাদের জীবন নৌকার তলে যদি ভক্তিরূপ জল থাকে ত তাহা আনন্দে বাহিয়া নেওয়া যায়। কিন্তু জীবন যদি শুষ্ক হয়, বালিচর হয়, কাঁকর-পাথর হয়, এবড়ো-খেবড়ো হয় তবে নৌকা টানিয়া নেওয়ার ব্যাপার অতি কঠিন হইয়া উঠে। ভক্তিতত্ত্ব জীবনতরীর গতি জলের মত সহজ করিয়া দেয়।

ভক্তিমার্গ দ্বারা সাধনায় সুলভতা লাভ হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান ছাড়া স্থায়ীভাবে ত্রিগুণের পরপারে যাওয়ার আশা নাই। ভাল, আত্মজ্ঞানের সাধন কি? সত্ত্বসাতত্য দ্বারা সত্ত্বগুণ আত্মসাৎ করিয়া উহার অহংকার ও ফলাসক্তি ভক্তি দ্বারা জয় করার প্রযত্নই সেই সাধন। এই সাধন দ্বারা সতত অখণ্ড প্রযত্ন করিতে করিতে একদিন আত্মদর্শন হইবে। ততদিন প্রযত্নের শেষ নাই। ইহা পরম পুরুষার্থের কথা। আত্মদর্শন হাসি-ঠাট্টার কথা নয়। রাস্তায় বাহির হইলাম আর আত্মদর্শন হইল তাহা

নহে। তাহার জন্য সতত প্রযত্নের ধারা বহাইতে হইবে। পরমার্থমার্গের সর্ত বস্তুত এই যে, "ক্ষণিকের তরেও নিরাশাকে স্থান দিব না। মুহূর্তের তরেও নিরাশায় নিশ্চেষ্ট হব না।" পরমার্থের অন্য কোন সাধন নাই। সময় সময় সাধক ক্লান্ত হইয়া যায় আর তাহার মুখ হইত বাহির হয় :

"তুমকারন তপ সংযম কিরিয়া
কহো কহাঁলোঁ কীজে॥"

"ভগবান, তোমার জন্য কতকাল তপস্যা করব?" কিন্তু এই উক্তি গৌণ। তপ ও সংযম এতটা অভ্যাস করিয়া লইতে হইবে যে তাহা যেন স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। 'কতকাল সাধনা করব', এই উক্তি ভক্তিমার্গে শোভা পায় না। ভক্তি কখনও অধীরভাব, নিরাশভাব আসিতে দেয় না। এরূপ ক্লান্তি কখনও না আসে, ভক্তিতে উত্তরোত্তর অধিক উল্লাস ও উৎসাহ জন্মে, তজ্জন্য অতি উত্তম বিচার এই অধ্যায়ে উপস্থিত করা হইয়াছে।

(৮৪)

এই বিশ্বে আমরা অনন্ত বস্তু দেখিতে পাই। এই সব বস্তু তিন ভাগে বিভক্ত করুন। সকালে উঠিয়া ভক্ত তিনটি বস্তু চোখের সামনে দেখে। প্রথমে তাহার মন যায় ভগবানের দিকে। তারপরে সে করে ভগবানের পূজার আয়োজন। আমি সেবক ভক্ত, তিনি সেব্য ভগবান—স্বামী, এই দুই বস্তু তাহার সামনে সতত থাকে। বাকী সারা সৃষ্টি পূজার সাধন। এ উদ্দেশ্যেই ফুল, চন্দন, ধূপ, দীপ ইত্যাদি সকল বস্তুর সৃষ্টি। বস্তু তিনটি। সেবক ভক্ত, সেব্য পরমাত্মা, আর সেবা সাধনরূপ এই সৃষ্টি। এই শিক্ষা এই অধ্যায়ে রহিয়াছে। কিন্তু যে সেবক মূর্তি বিশেষের পূজা করে তাহার কাছে সৃষ্টির সকল পদার্থ পূজার সাধন মনে হয় না। বাগান হইতে সে চারিটি ফুল তুলিয়া আনে, ধূপ জোগাড় করে, কিছু নৈবেদ্য সংগ্রহ করে। বাছবিচার করিয়া লইতে তাহার ভাল লাগে। কিন্তু পঞ্চদশ অধ্যায় যে বিশাল শিক্ষা দিতে চাহে তাহাতে বাছাবাছির স্থান নাই। তপস্যার যাহা সাধন, কর্মের যাহা সাধন, সে সবই পরমেশ্বরের সেবার সাধন। তাহার কোনটিকে বলি ফুল, কোনটিকে চন্দন আর কোনটিকে বা

নৈবেদ্য। এরূপ যত কিছু কর্মকে পূজাদ্রব্যে পরিণত করাই লক্ষ্য। জগতে কেবল তিনটি বস্তু। যে বৈরাগ্যময় সাধনমার্গ গীতা আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিতে চাহে গীতা তাহাকে ভক্তিময় রূপ দিতেছে। তাহা হইতে কর্মের ভাব ছাঁটিয়া ফেলিতেছে আর তদ্দরুন সুলভতা আনিয়া দিতেছে।

আশ্রমে কাহারও উপরে অধিক কাজ পড়িলে 'এত কাজ আমি কেন করব' এ ভাব তাহার মনে আসে না। এ ভাব খুব মূল্যবান। দেবার্চনাকারীকে যদি দুই ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা পূজা করিতে হয় তবে কি সে বলিবে, "বলো না ভাই, আজ চার ঘণ্টা পূজা করতে হয়েছে।" তাহাতে তাহার আরও বেশী আনন্দই হইবে। এরূপই আমাদের আশ্রমের অভিজ্ঞতা। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে এই উপলব্ধি আমাদের আসা চাই। জীবন সেবা-পরায়ণ হইয়া যাওয়া চাই। সেব্য সে ত পুরুষোত্তম, তাঁহার সেবার জন্য অনুক্ষণ-দণ্ডায়মান আমি অক্ষর পুরুষ। অক্ষর পুরুষ মানে জীবনে যে ক্লান্তি জানে না, সৃষ্টির সুরু হইতে যে সেবা করিয়া আসিয়াছে এরূপ সনাতন সেবক। সে যেন রামের সামনে হাত জোড় করিয়া সদৈব দণ্ডায়মান হনুমান। আলস্য কি তাহা সে জানে না। হনুমানের মতই এই চিরঞ্জীব সেবক এক পায়ে খাড়া।

এরূপ আজন্মসেবক মানে অক্ষর পুরুষ। পরমাত্মাও জীবন্ত সত্ত্বা আর আমি তাহার সদা প্রস্তুত সেবক। প্রভু আছেন ত আমিও আছি। সেবা গ্রহণ করিতে করিতে তিনি হাঁপাইয়া উঠেন কি সেবা করিতে করিতে আমি হাঁপাইয়া উঠি, দেখুন সেই মজা। তিনি দশ অবতার গ্রহণ করেন ত আমারও দশ অবতার। তিনি রাম হন ত আমি হনুমান, তিনি কৃষ্ণ হন ত আমি উদ্ধব। তাঁহার যত অবতার আমারও তত। চলুক এই মধুর প্রতিযোগিতা। এভাবে যুগ যুগ ধরিয়া পরমেশ্বরের যে সেবা করে, কখনও যাহার নাশ নাই এরূপ যে জীব সেই অক্ষর পুরুষ। তিনি পুরুষোত্তম স্বামী আর আমি তাঁহার চিরসেবক, এই ভাবনা অনুক্ষণ হৃদয়ে রাখা চাই। আর এই যে সৃষ্টি যাহা মুহূর্তে মুহূর্তে

বদলাইতেছে, অনন্ত বেশ ধারণ করিতেছে তাহাকে পূজার সাধন, সেবার সাধন বানাইতে হইবে। ক্রিয়ামাত্রই পুরুষোত্তমের পূজা।

সেব্য পরমাত্মা পুরুষোত্তম, সেবক জীব এই অক্ষর পুরুষ। কিন্তু এই সাধনরূপ সৃষ্টি হইতেছে ক্ষর। এই ক্ষর হওয়ার মধ্যে বহু অর্থ নিহিত। ইহা সৃষ্টির দূষণ নয়, ভূষণ। তাই ত সৃষ্টিতে নিত্য নূতন নবীনতা। গত কালের ফুল আজ অকেজো। তাহা নির্মাল্য হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টি যে বিনাশশীল তাহা খুবই ভাগ্যের কথা। সেবার তাহা বৈভব। সেবার জন্য নিত্য নূতন ফুল মেলে। তদ্রূপ এই শরীর নব নব রূপ ধারণ করিয়া পরমেশ্বরের সেবা করিবে। আমার সাধনসমূহকে নিত্য নূতন রূপ দিব ও তাহা দ্বারা তাঁহার পূজা করিব। নাশশীলতায় সৌন্দর্য বিদ্যমান। আজিকার চন্দ্রের কলা আর আগামী কালের চন্দ্রকলা এক নয়। চন্দ্রের নিত্য নূতন শোভা। দ্বিতীয়ার বর্ধমান কলা দেখিলে কতই না আনন্দ হয়। দ্বিতীয়ার এই চাঁদ শঙ্করের ললাটে শোভা পায়। অষ্টমীর চন্দ্রের সৌন্দর্য আর এক প্রকার। অষ্টমীর আকাশে বাছাবাছা মোতি ঝিক্‌মিক করে। পূর্ণিমার চন্দ্রের প্রভায় তারকা দেখাই যায় না। পূর্ণিমায় পরমেশ্বরের মুখচন্দ্রের প্রকাশ। অমাবস্যার আনন্দ অত্যন্ত গম্ভীর। অমাবস্যার রাত্রি কেমন নিস্তব্ধ শান্ত। চন্দ্রের ম্লানকারী রশ্মি থাকে না বলিয়া ছোট বড় অগণিত তারা পূর্ণ স্বাধীনভাবে চমকাইতে থাকে। অমাবস্যায় স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিলাস দেখা যায়। নিজ তেজের গর্ব প্রদর্শনকারী চন্দ্র আজ সেখানে নাই। নিজ প্রকাশদাতা সূর্যের সহিত সে-দিন সে এক হইয়া গিয়াছে। পরমেশ্বরে মিলিয়া গিয়াছে। জীব আত্মা-র্পণ করিয়া জগতকে কিভাবে নির্ভয় করিয়া দিতে পারে এই দিন যেন তাহাই বলে। চন্দ্রের স্বরূপ ক্ষর, পরিবর্তনশীল। কিন্তু বিভিন্নরূপে তাহা আনন্দ দেয়।

সৃষ্টির নশ্বরতাই তার অমরতা। সৃষ্টির রূপ কলকল বহিতেছে। এই রূপগঙ্গা যদি বহিতে না থাকে তাহা ডোবা হইয়া যাইবে। নদীর জল অখণ্ড বহিয়া চলে। জল অনুক্ষণ বদলাইতে থাকে। এক বিন্দু যায় আর এক বিন্দু আসে। সে জল জীবন্ত থাকে। বস্তুতে যে আনন্দ বোধ হয়

সে তাহার নবীনতার হেতু। গ্রীষ্ম ঋতুতে ভগবানকে কেবল ফুল নিবেদন করা হয়। বর্ষায় সবুজ দূর্বা। শরতে রমণীয় কমল। যে ঋতুতে যে ফলফুল তাহা দ্বারা ভগবানের পূজা করা হয়। তাই ত ঐ পূজা সজীব-সুন্দর, নিত্য নূতন মনে হয়। অরুচি কখনও জন্মে না। 'ক' লিখিয়া দিয়া শিশুদের বলা হয়, "মক্‌শ কর, বড় করে লেখ।" ঐ 'ক'-এর জ্বালায় শিশু হাঁপাইয়া উঠে। অক্ষরটাকে কেন যে মোটা করিবে তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তেরছা করিয়া কলম ধরিয়া তাড়াতাড়ি সে অক্ষর মক্‌শ করিয়া দেয়। কিন্তু পরে সে নূতন অক্ষর, সমগ্র বর্ণমালা দেখে। নানা রকমের বহি পড়িতে থাকে। সাহিত্যের বিবিধ পুষ্পমালার আস্বাদ সে গ্রহণ করে। অপার আনন্দ সে পায়। সেবাক্ষেত্রের কথাও তদ্রূপ। সাধনের নিত্য নবীনতার কারণে সেবার আগ্রহ বাড়িতে থাকে। সেবাবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে।

সৃষ্টির এই নশ্বরতা নিত্য নূতন ফুল ফুটায়। গাঁয়ের ধারে শ্মশান আছে তাই না গাঁয়ের রমণীয়তা। প্রাচীন লোক যাইতেছে, নবীন জন্মিতেছে। সৃষ্টি নিত্য নবীন হইতেছে। বাহিরের ঐ শ্মশান যদি বাতিল করিয়া দাও ত তাহা ঘরে আসিয়া বসিবে। সেই একই লোককে অখণ্ড দেখিয়া দেখিয়া তুমি হাঁপাইয়া উঠিবে। গ্রীষ্মকালে গরম পড়ে। পৃথিবী তপ্ত হয়। তাহাতে ত্রস্ত হইও না। ঐ রূপ বদলাইবে। বর্ষার সুখ উপলব্ধির জন্য গ্রীষ্মের জ্বালা-পোড়া চাই। জমি যদি খুব তপ্ত তৃষ্ণার্ত না হয় ত বৃষ্টি হইতেই কাদা হইয়া যাইবে। তৃণধান্য শোভা পাইবে না। গ্রীষ্ম কালে এক দিন আমি ঘুরিতেছিলাম। মাথায় রৌদ্র লাগিতেছিল। বড় আনন্দ হইতেছিল। বন্ধু বলিল, "মাথায় রোদ লাগছে, কষ্ট হবে।" উত্তরে বলিলাম, "তলার মাটি তপ্ত ত মাটির এ পুতুলটাকেও তপ্ত হতে দাও।" মাথা তপ্ত হইবে আর পরে বর্ষার ধারা আসিবে। কী মজা! কিন্তু যে গ্রীষ্মে গরম ভোগ করে না, বৃষ্টি হইলে সে পুস্তকে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া থাকিবে। সে ঘরের ঐ কামরায়, ঐ কোণে বসিয়া থাকিবে। বাহিরের এই বিশাল অভিষেক পাত্রের নীচে দাঁড়াইয়া আনন্দে নাচিবে না। কিন্তু আমাদের ঐ মহর্ষি মনু অতীব রসিক ও প্রকৃতিপ্রেমী।

স্মৃতিতে তিনি লিখিয়াছেন, "বর্ষা এলে ছুটি দিয়ে দাও।" বর্ষা যখন পড়িতেছে তখন কি আশ্রমে বসিয়া পাঠ আবৃত্তি করিবে? বৃষ্টি যখন হয় তখন নাচিবে, গাহিবে, সৃষ্টির সহিত একরূপ হইয়া যাইবে। বর্ষাকালে পৃথিবী ও আকাশ পরস্পর মিলিত হয়। সেই মনোরম দৃশ্য কেমন আনন্দ-দায়ী! প্রকৃতি আমাদের স্বয়ং শিক্ষা দান করিতেছে।

সারাংশ, সৃষ্টির ক্ষরতা, নাশশীলতার অর্থ সাধনের নবীনতা। এরূপ, নবনবপ্রসবা সাধনদাত্রী এই সৃষ্টি, সেবার জন্য কোমর কষিয়া দণ্ডায়মান ঐ সনাতন সেবক, আর ঐ সেব্য পরমাত্মা। এবার চলিতে দাও খেলা। পরম-পুরুষ পুরুষোত্তম নানা সেবা সাধন দিয়া প্রেমভরে আমার কাছ হইতে সেবা গ্রহণ করিতেছেন। নানা সাধন দিয়া তিনি আমাকে খেলাইতেছেন। নানা কার্য আমার দ্বারা করাইতেছেন। এইরূপ দৃষ্টি যদি জীবনে লাভ হয় ত তাহা কতই না আনন্দের!

(৮৫)

গীতা চাহে আমাদের প্রত্যেক কৃতি ভক্তিময় হোক। ঘণ্টা আধ-ঘণ্টা আমরা যে ভগবানের পূজা করি তাহা ত ঠিকই। সকাল সন্ধ্যায় সূর্যকিরণ যখন নিজ বিচিত্র রঙ ছড়াইয়া দেয় তখন চিত্ত স্থির করিয়া ঘণ্টা আধ-ঘণ্টার জন্য সংসার ভুলিয়া যাওয়া ও অনন্তের চিন্তন করা এক উৎ-কৃষ্ট ভাব। এই সদাচার কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু এইটুকুতেই গীতার তুষ্টি নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত কিছু কর্ম করি সে সবই ভগবানের পূজার নিমিত্ত করা চাই। নাইতে, খাইতে, ঝাড়ু দিতে তাঁহাকে স্মরণ করা চাই। যখন ঝাড়ু দিই তখন একথা মনে করা চাই আমি আমার প্রভুর, জীবন-দেবতার আঙিনা সাফ করিতেছি। এভাবে আমাদের সমস্ত কর্ম পূজাকর্ম হওয়া চাই। এ দৃষ্টি আসিলে আচরণে কত যে ব্যবধান দেখা দিবে তাহা বুঝিতে পারিবেন। পূজার জন্য কত না বিবেচনা করিয়া ফুল তুলি, কত না যত্নে তাহা ফুলদানিতে রাখি, চাপ না লাগে, ম্লান হইয়া না যায় সেদিকে কত না দৃষ্টি থাকে। পাছে অপবিত্র হয় এই ভয়ে নাকের কাছে পর্যন্ত নিই না। জীবনের দৈনন্দিন কর্মে তদ্রূপ

দৃষ্টি আসা চাই। এ গ্রাম আমার। প্রতিবেশীরূপে নারায়ণ এখানে বাস করেন। এ গ্রাম আমি পরিষ্কার করিব, নির্মল রাখিব। গীতা এ দৃষ্টি আমাদের দিতে চাহে। সকল কর্ম প্রভু-পূজা হইয়া যাক এদিকে গীতার পরম আগ্রহ। ঘণ্টা আধ-ঘণ্টার পূজায় গীতাসদৃশ গ্রন্থরাজের তুষ্টি নাই। সমস্ত জীবন হরিময় হোক, পূজারূপ হোক, গীতার ইহা ব্যাকুল আগ্রহ।

পুরুষোত্তমযোগ নির্দেশ করিয়া গীতা কর্মময় জীবনকে পূর্ণতা দিতেছে। তিনি সেব্য পুরুষোত্তম, আমি তাঁর সেবক আর এই সারা সৃষ্টি সেবার সাধন, এই দৃষ্টি লাভ হইয়াছে ত আর কি চাই? তুকারাম বলিয়াছেন :

"মিলবে দর্শন করবো পূজা।
নাই কো প্রভু আর কোন আশা॥"

তখন আমাদের দ্বারা অখণ্ড সেবা হইতে থাকিবে। আমি বলিয়া তখন কিছু থাকিবে না। আমি, আমার, মুছিয়া যাইবে; যাহা কিছু সব হইবে ভগবানের জন্য। পরার্থে জীবনধারণ করিব ইহা ছাড়া অন্য কিছুই থাকিবে না। আমা হইতে আমিত্ব ধুইয়া ফেলিয়া আমি আমার জীবন হরিময় করিব, জীবন ভক্তিময় বানাইব একথাই গীতা বার বার বলিতেছে। সেব্য পরমাত্মা, আমি সেবক, আর সাধনরূপ এই সৃষ্টি। পরিগ্রহের নামই পুছিয়া গিয়াছে। জীবনে অন্য কোন চিন্তা নাই।

(৮৬)

এই প্রকারে কর্মে যে ভক্তি মিলাইতে হয় তাহা আমরা এ পর্যন্ত দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাতে জ্ঞানের পুটও আবশ্যক। তাহা ছাড়া গীতার সন্তোষ নাই। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে এই তিন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন। বলার প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করি এই মাত্র। কর্ম মানেই ভক্তি। ভক্তি কিছু আলাদা আনিয়া মিশাইতে হয় না। জ্ঞানের সম্বন্ধেও সেই কথা। এই জ্ঞান লাভের উপায়? গীতা বলে, "সর্বত্র পুরুষদর্শন দ্বারা এ জ্ঞান মেলে।" তুমি সেবাকারী সনাতন সেবক, তুমি সেবা-পুরুষ; সে

পুরুষোত্তম সেব্য পুরুষ; আর নানারূপধারিণী নানাসাধনদাত্রী এই প্রবাহ-ময়ী সৃষ্টি, সেও পুরুষই—এই দৃষ্টি হইতে এ জ্ঞান মেলে।

এই দৃষ্টি রাখার অর্থ কি? সর্বত্র ত্রুটি-রহিত নির্মল সেবা ভাব। তোমার পায়ের জুতা কচ্‌মচ্‌ করিতেছে, তাহাতে একটু তেল লাগাও। তাহাতেও পরমাত্মার অংশ রহিয়াছে। ঐ জুতা ঠিকঠাক রাখ। সেবার সাধন ঐ চরখা। তাহাতে তেল দাও। তাহা শব্দ করিতেছে, "নেতি নেতি"—সুতা কাটিব না বলিতেছে। ঐ চরখা, ঐ সেবা-সাধন—তাহাও পুরুষই। তার মাল, তার ঐ পৈতা উত্তমরূপে রাখ। সারা সৃষ্টিকে চৈতন্যময় মনে কর। জড় মনে করিও না। ওঁকারের দিব্য গায়ক ঐ চরখা কি জড়? সে ত পরমাত্মার মূর্তি। শ্রাবণ অমাবস্যায় আমরা অহঙ্কার দূর করিয়া বলীবর্দের* পূজা করি। তাহা খুব বড় কথা। পোলার কথা নিত্য স্মরণ রাখিয়া বলদকে তাজা পুষ্ট রাখ, আর তার কাছ হইতে সমুচিত কাজ লও। পর্বদিনের ভক্তি সেই দিনই যেন শেষ না হয়। বলদও পরমার্থের মূর্তি। ঐ লাঙ্গল, চাষের ঐ সব উপকরণ এ সকলও উত্তম অবস্থায় রাখিবে। সেবার সাধন মাত্রই পবিত্র। কি বিশাল এই দৃষ্টি। পূজা মানে আবীর, চন্দন, ফুল চড়ানো নহে। বাসনকোসনকে কাচের মত স্বচ্ছ রাখাই বাসনের পূজা। দীপ ধুইয়া পুছিয়া পরিষ্কার রাখাই দীপের পূজা। কাস্তে ধার দিয়া কৃষিকাজের যোগ্য রাখাই কাস্তের পূজা। দরজার কব্জায় জং ধরে ত তৈল লাগাইয়া উহাকে তুষ্ট রাখাই উহার পূজা। জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রে এই দৃষ্টি আনিতে হইবে। সেবাদ্রব্য উৎকৃষ্ট ও নির্মল রাখা চাই। সারাংশ, আমি অক্ষর পুরুষ, সে পুরুষোত্তম আর সাধনরূপ এই সৃষ্টি, সবই পুরুষ, সবই পরমাত্মা। সর্বত্র একই চৈতন্যের খেলা চলিতেছে। এই দৃষ্টি আসিয়াছে ত বুঝিবে আমাদের কর্মে জ্ঞানও আসিয়াছে।

কর্মে ভক্তির পুট দিলে, তারপরে জ্ঞান যোগ করিলে, ত তাহা হইতে এক অপূর্ব জীবনরসায়ন সৃষ্টি হইল। শেষটায় গীতা আমাদের অদ্বৈতময় সেবার মার্গে আনিয়া দিয়াছে। সমস্ত সৃষ্টিতে তিন পুরুষ বিদ্যমান। এক পুরুষোত্তমই এই তিন রূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনে মিলিয়া একই পুরুষ।

---

*মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ পার্বণ, পোলা নামে অভিহিত।

কেবল অদ্বৈত, অদ্বৈত। গীতা আমাদিগকে পরম উচ্চ শিখরে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান একরূপ হইয়া গিয়াছে। জীব, শিব ও সৃষ্টি একরূপ হইয়া গিয়াছে। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনে আর কোন বিরোধ থাকিল না। নিজ অমৃতানুভব হইতে জ্ঞানদেব মহারাষ্ট্রকে তাঁহার প্রিয় দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ঃ

"কেটেছ পর্বত, গড়েছ দেব, দেউল, পরিবারে।
সেরূপ কেন না হবে ভক্তির ব্যবহারে।"

পাথর কাটিয়া পাথরে তৈরি মন্দির, সে মন্দিরে পাথরে তৈরি ভগবান-মূর্তি, ভগবানের-মূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান পাথরে তৈরি ভক্ত আর তাহার পাশে পাথরের ফুল—এ সবই যেমন এক পাথর হইতে প্রস্তুত, একই অখণ্ড পাথর যেমন নানারূপ সাজিয়াছে—ভক্তির বেলায়ও তদ্রূপ কেন না হইবে? স্বামী-সেবক সম্বন্ধ হইলেও ঐক্য কেন থাকিবে না? এই বাহ্যসৃষ্টি, এই পূজা-দ্রব্য আলাদা থাকিয়াও আত্মরূপ কেন না হইবে? তিন পুরুষই এক। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এই তিন মিলাইয়া এক বিশাল জীবনপ্রবাহ সৃষ্টি হোক। এইরূপই এই পরিপূর্ণ পুরুষোত্তম যোগ। সেবক, স্বামী ও সেবাদ্রব্য একরূপ হইয়া প্রেমভক্তির খেলা চলুক।

এইরূপ পুরুষোত্তম যোগ যাহার হৃদয়ে অঙ্কিত একমাত্র সেই যথার্থ ভক্ত।

"সর্বভাবে, সর্বরূপে ভজে মোরে যে
সর্বজ্ঞ সে।"

এরূপ পুরুষ জ্ঞানী হইয়াও পূর্ণ ভক্ত। জ্ঞান যেখানে, প্রেমও সেখানে! পরমেশ্বরের জ্ঞান ও পরমেশ্বরের প্রেম এ দুই পৃথক বস্তু নহে। "করলা তিতো" এরূপ জ্ঞান জন্মিলে প্রেম জন্মে না। ব্যতিক্রম দুই একটি থাকিতে পারে। কিন্তু যেখানে তিক্ততার ভাব রহিয়াছে সেখানে মন হাঁপাইয়া উঠিবেই। মিছরির মত হইলেই জ্ঞান গলিতে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের ধারা বহিতে থাকে। পরমেশ্বরের বিষয়ে জ্ঞান জন্মা আর প্রেম জন্মা দুইই এক কথা। পরমেশ্বরের মাধুর্যের উপমা কি রদী চিনির সহিত করা যায়? সেই মধুর পরমেশ্বরে জ্ঞান জন্মিয়াছে ত সঙ্গে সঙ্গে প্রেমভাবেরও

উৎপত্তি হইবে। জ্ঞান হওয়া আর প্রেম হওয়া এ দুই ক্রিয়া যেন ভিন্ন নহে। অদ্বৈতে ভক্তি আছে কি নাই এই তর্কে যাইব না। জ্ঞানদেব বলিয়াছেন ঃ

"সেই ভক্তি সেই জ্ঞান।
বিঠ্ঠল একই জান॥"

ভক্তি ও জ্ঞান একই বস্তুর দুই নাম।

জীবনে পরম ভক্তি আসিলে যে কর্ম হয় সে কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান হইতে ভিন্ন নয়। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান মিলিয়া একই রমণীয় রূপ হয়। এই রমণীয় রূপ হইতে অদ্ভুত প্রেমময় জ্ঞানময় সেবা সহজেই উৎপন্ন হয়। যার প্রতি আমার যে ভালবাসা তাহা কর্মে প্রকাশ হওয়া চাই। প্রেম অনুক্ষণ কঠোর শ্রম করে, সেবারূপে ব্যক্ত হয়। সেবা প্রেমের বাহ্যরূপ। প্রেম সেবাকর্মের অনন্ত সাজে সাজিয়া নৃত্য করে। প্রেম আসিয়াছে ত জ্ঞান তথায় আসিবেই। সেবা যাহার করিব কিরূপ সেবা তাহার প্রিয় সে জ্ঞান আমার থাকা চাই! নয় ত সে সেবা কু-সেবা হইবে। প্রেমের সেব্য বস্তুর জ্ঞান থাকা চাই। কার্য দ্বারা প্রেমের প্রভাব বিস্তার করার নিমিত্ত জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু মূলে চাই প্রেম। অন্যথায় সে জ্ঞান অকেজো। প্রেমের প্রেরণায় কৃত কর্ম সাধারণ কর্ম হইতে আলাদা। ছেলে ক্লান্তদেহে ক্ষেত হইতে ফিরিয়া আসে। প্রেমভরা সহজ দৃষ্টিতে তাকাইয়া মা বলেন, "বাছা, বড্ড মেহনত হয়েছে।" কর্মটি ছোট কিন্তু কত সামর্থ্য তাহাতে ভরা! জীবনের সর্ব কর্মে জ্ঞান ও ভক্তি নিঃশেষে ঢালিয়া দাও। ইহারই নাম পুরুষোত্তমযোগ।

(৮৭)

সকল বেদের ইহা সার। বেদ অনন্ত। আর এই পুরুষোত্তমযোগ সেই অনন্ত বেদের সার-সংক্ষেপ। এই বেদ কোথায়? বেদের কথা অতি বিচিত্র। বেদের সার কোথায়? অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, "যার পাতায় বেদ।" ওরে! বেদ ত এই বৃক্ষের পাতায় পাতায় ভরা। বেদ ঐ সাহিত্যে, তোমার বহিতে লুকাইয়া নাই। বিশ্বের সর্বত্র তাহা ছড়াইয়া

আছে। শেক্সপিঅর বলিয়াছেন ঃ

সদ্‌ গ্রন্থ মিলে বহমানা ঝরণায়।
প্রবচন শোনায় জড় পাথরশিলায়॥

তাৎপর্য, বেদ সংস্কৃতেও নহে, সংহিতায়ও নহে। বেদ সৃষ্টিতে। সেবা কর, দর্শন মিলিবে। "প্রভাতে করদর্শনম্‌"—প্রভাতে উঠিয়া প্রথমে নিজ হাতের তালু দেখ। সকল বেদ ঐ হাতে রহিয়াছে। সে বেদ বলে, "সেবা কর।" কাল হাত মেহনত করিয়াছে কি করে নাই, আজ মেহনত করিতে প্রস্তুত কি প্রস্তুত নয়, তাহাতে কড়া পড়িয়াছে কি পড়ে নাই, তাহা দেখ। সেবা করিতে করিতে ক্ষয় হইয়া গেলে হাতে ব্রহ্মলিখিত দেখা যায়, ইহাই "প্রভাতে করদর্শনম্‌"-এর অর্থ।

বলা হয় বেদ কোথায়? ভাই, তোমার হাতেই ত। শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে কথিত আছে যে আট বছরে সমগ্র বেদের জ্ঞান তাঁহার হইয়াছিল। বেচারা শঙ্করাচার্য ত মন্দবুদ্ধি ছিলেন। আট বছর তাঁহার লাগিয়াছিল! কিন্তু আপনি আমি ত জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। আট বছরের দরকার কি? আমিই জীবন্ত বেদ। আজ অবধি সকল পরম্পরা আমাতে আত্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। ঐ যে বেদ-বীজ আমি তারই ফল। আমার ফলে অনন্ত বেদের বীজ আমি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। আমার উদরে বেদ বিশ-পঁচিশ গুণ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। সারাংশ, বেদের সার আমাদের হাতে রহিয়াছে। সেবা, প্রেম ও জ্ঞান এ তিনের উপর জীবন রচনা করিতে হইবে। বেদ হাতে রহিয়াছে বলিতে ইহাই বুঝায়। আমি যে অর্থ করিব তাহাই বেদ। বেদ বাহিরে নয়। সেবা-মূর্তি সাধু বলেন, "বেদের অর্থ একমাত্র আমিই জানি।" ভগবান বলিতেছেন, "সকল বেদ আমাকেই জানে। আমিই সকল বেদের অর্ক, পুরুষোত্তম।" বেদের সার এই পুরুষোত্তমযোগ যদি নিজ জীবনে আত্মসাৎ করিতে পারি ত কতই না ভাল হয়! তখন সে পুরুষ যাহা কিছু করে তাহা বেদেরই অভিব্যক্তি, গীতা একথা বলে। এই অধ্যায় সমগ্র গীতার সার। গীতার শিক্ষা ইহাতে পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। জীবনে দিন-রাত তাহা আচরণ করিতে হইবে। আর কি চাই?

রবিবার, ২৯-৫-৩২

ষোড়শ অধ্যায়

(৮৮)

বন্ধুগণ,

জীবনের সমগ্ররূপ কি আর নিজ জীবন কিরূপে সার্থক করা যায় তাহা আমরা গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে দেখিয়াছি। তারপরে ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন দিক হইতে ভক্তির বিবেচনা করিয়াছি। একাদশে ভক্তির দর্শন পাওয়া গিয়াছে। সগুণ ও নির্গুণ ভক্তির তুলনা করিয়া দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের প্রধান প্রধান লক্ষণ দেখানো হইয়াছে। গোটা দ্বাদশ অধ্যায়ে কর্ম ও ভক্তি এই দুই তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ রহিয়াছে। বাকী ছিল জ্ঞান—আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করা, তদর্থে তিনগুণ জয় করা, আর অন্তে সর্বত্র প্রভুদর্শন—এই তৃতীয় ভাগ আমরা ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেখিয়াছি। পঞ্চদশ অধ্যায়ে জীবনের সম্পূর্ণ শাস্ত্র দেখা গিয়াছে। জীবনের পূর্ণতা পুরুষোত্তমযোগে। তারপরে আর কিছু বাকী থাকে না।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি ইহাদের পৃথক করিয়া দেখা আমার কাছে অসহ্য। কোন কোন সাধকের নিষ্ঠা এরূপ যে স্রেফ্ কর্মই তাহাদের ভাল লাগে। ভক্তিকে কেহ কেহ স্বতন্ত্র মার্গ বলিয়া গণনা করে আর তার উপরই সব জোর দেয়। কিছু লোকের ঝোঁক জ্ঞানের উপরে। জীবন মানে কেবল কর্ম, কেবল ভক্তি, কেবল জ্ঞান এরূপ কেবলবাদ মানিতে আমার ইচ্ছা হয় না। তদ্বিপরীত দৃষ্টি—কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের যোগরূপ সমুচ্চয়বাদও আমি মানি না। কিছু ভক্তি, কিছু জ্ঞান, কিছু কর্ম এইরূপ উপযোগিতাবাদও আমার ভাল লাগে না। প্রথমে কর্ম, পরে ভক্তি, পরে জ্ঞান এরূপ ক্রমবাদও আমার কাছে গ্রাহ্য নহে। তিনের মিলনরূপ সামঞ্জস্যবাদেরও আমি পক্ষপাতী নহি। যাহা কর্ম তাহাই ভক্তি আর তাহাই জ্ঞান, আমার ত একথা মনে করিতে ভাল লাগে। সন্দেশের টুকরার মধুরতা, আকার ও ওজন পৃথক পৃথক বস্তু নয়। যখন সন্দেশের টুকরা মুখে দিই তখনই তার আকার খাই, তার ওজন হজম করি, তার মধুরতা চাখি। তিন বস্তুই একত্র,

এক সঙ্গে। সন্দেশের প্রতি কণায় আকার ওজন ও মধুরতা থাকে। উহার কোন টুকরাতে কেবল আকার, কোন টুকরাতে কেবল মধুরতা আর কোন টুকরাতে কেবল ওজন থাকে তাহা নয়। তদ্রূপ জীবনের প্রতি কর্মে পরমার্থ ভরা থাকা চাই, প্রতি কর্ম সেবাময় প্রেমময় ও জ্ঞানময় হওয়া চাই। জীবনের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানে ওতপ্রোত হওয়া চাই। ইহাকেই পুরুষোত্তমযোগ বলে। সারা জীবন কেবল পরমার্থময় করিতে হইবে একথা বলা সহজ। কিন্তু একথায় যে ভাব নিহিত তাহা তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, নিছক নির্মল সেবা করার জন্য অন্তঃকরণে শুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তির প্রবাহ, বহা চাই একথা বলাই বাহুল্য। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান অক্ষরশঃ একরূপ। এই পরমদশাকে পুরুষোত্তমযোগ কহে। জীবনের অন্তিম সীমা এখানে মিলিয়াছে।

এখন, এই ষোড়শ অধ্যায়ে কি বলা হইয়াছে? সূর্যের প্রভা সূর্যোদয়ের পূর্বে ছড়াইয়া পড়ে। তদ্রূপ জীবনে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানরূপ পূর্ণ পুরুষোত্তমযোগের উদয় হওয়ার পূর্বে সদ্‌গুণের প্রভা বাহিরে বিকীর্ণ হইতে থাকে। পরিপূর্ণ জীবনের এই পূর্ব প্রভার কথা এই ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। কি প্রকারের অন্ধকারের সহিত লড়াই করিয়া এই প্রভা প্রকাশ হয় তাহারও বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন বস্তুর প্রমাণস্বরূপে প্রত্যক্ষ কিছু বস্তু আমরা দেখিতে চাই। সেবা, ভক্তি ও জ্ঞান যে জীবনে আসিয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় কি? ক্ষেতে আমরা মেহনত করি আর মাপিয়া-জুকিয়া ধান ঘরে তুলি। তদ্রূপ আমরা যেসাধনা করি তাহা হইতে আমাদের কি অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, কতটা সদ্‌বৃত্তির স্ফুরণ আমাদের মধ্যে হইয়াছে, কতটা সদ্‌গুণ আয়ত্ত হইয়াছে, জীবন সত্যসত্যই কতটা সেবাময় হইয়াছে সেই সকলের অনুসন্ধানের দিকেই এ অধ্যায়ের অঙ্গুলিসঙ্কেত। জীবনের কলা কতটা বিকশিত হইল তাহা পরিমাপ করার জন্যই এ অধ্যায়ের অবতারণা। জীবনের এই বর্ধনশীল কলাসমূহকে গীতা দৈবী সম্পত্তি বলিয়াছে। বিপরীত যে সব বৃত্তি তাহাকে আসুরী বলা হইয়াছে। ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পত্তির ঝগড়া দেখানো হইয়াছে।

(৮৯)

প্রথম অধ্যায়ে যেমন একদিকে কৌরবদের ও অপর দিকে পান্ডবদের মুখোমুখি দাঁড় করান হইয়াছে এখানেও তেমন সদ্‌গুণের দৈবী সেনা ও দুর্গুণের আসুরী সেনাকে পরস্পরের সম্মুখীন করা হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষের মনে সদসৎবৃত্তির যে ঝগড়া চলিয়া আসিতেছে তাহার রূপকাত্মক বর্ণনপদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে। বেদে ইন্দ্র ও বৃত্র, পুরাণে দেব ও দানব, তদ্রূপ রাম ও রাবণ, পারসীক ধর্মগ্রন্থে অহুরমঝ্‌দ ও অহরিমান, খৃস্টধর্মে প্রভু ও শয়তান, ইস্‌লামে আল্লা ও ইব্লীস এই প্রকার ঝগড়া সকল ধর্মেই আছে। কাব্যে স্থূল ও বৃহৎ বস্তুর বর্ণনা সূক্ষ্ম রূপক দ্বারা করা হয় আর ধর্মগ্রন্থে সূক্ষ্ম মনোভাবের বর্ণনা বৃহৎ স্থূল রূপক সহায়ে করা হয়। কাব্যে সূক্ষ্ম দ্বারা স্থূলের আর এখানে স্থূল দ্বারা সূক্ষ্মের বর্ণনা করা হয়। ইহা হইতে একথা যেন কেহ মনে করিবেন না যে গীতার আরম্ভে যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে তাহা নিছক কাল্পনিক। তাহা ঐতিহাসিক ঘটনাই হইবে। কিন্তু কবি নিজ ইষ্ট হেতু সপ্রমাণ করার জন্য তাহা ব্যবহার করিতেছেন। কর্তব্য বিষয়ে মোহ উপস্থিত হইলে কি ভাবে চলিতে হইবে সেকথা যুদ্ধের রূপক দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। ভালমন্দের ঝগড়া ষোড়শ অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে। যুদ্ধের রূপকই গীতায় রহিয়াছে।

কুরুক্ষেত্র বাহিরেও আছে আর আমাদের মনেও আছে। যে ঝগড়া আমাদের মনে থাকে সূক্ষ্মভাবে দেখিলে তাহাই আমরা বাহিরের জগতে মূর্তিমান দেখিতে পাই। বাহিরে যে শত্রু দণ্ডায়মান, তাহা আমারই মনের বিকার সাকাররূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত। আরশিতে যেমন আমারই ভাল-মন্দ প্রতিবিম্বিত হয় আমার মনের ভালমন্দ চিন্তাও তেমন শত্রুমিত্ররূপে বাহিরে দেখা যায়। জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার মত মনের প্রতিবিম্ব আমরা বাহিরে দেখিয়া থাকি। ভিতরের ও বাহিরের যুদ্ধে আসলে কোন প্রভেদ নাই। আসল যুদ্ধ অন্তরেই চলে।

আমাদের অন্তঃকরণে একদিকে সদ্‌গুণ অপরদিকে দুর্গুণ দণ্ডায়মান। নিজ নিজ ব্যূহ উহারা দৃঢ়ভাবে রচনা করিতেছে। সৈন্যের যেরূপ সেনাপতি চাই এখানেও তদ্রূপ সদ্‌গুণনিচয় এক সেনাপতি নিযুক্ত করে। এই

সেনাপতির নাম 'অভয়'। অভয়কে এই অধ্যায়ে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহা কিছু আকস্মিক ব্যাপার নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়াই অভয় শব্দকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। অভয় ছাড়া কোন গুণের বৃদ্ধি হয় না। সততা বিনা সদ্‌গুণের কোন মূল্য নাই। সততার জন্য নির্ভয়তা দরকার। ভয়ভীত আবহাওয়ায় সদ্‌গুণের স্ফূর্তি হয় না। ভয়ভীত আবহাওয়ায় সদ্‌গুণও দুর্গুণ হয়, সৎপ্রবৃত্তিও দুর্বল হয়। নির্ভয়তা যাবতীয় সদ্‌গুণের মুখ্য নায়ক। সম্মুখ-পশ্চাৎ দুই দিকই সেনাদের রক্ষা করিতে হয়। সোজা আক্রমণ সম্মুখ হইতে হয়। কিন্তু পেছন হইতেও চোরা আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। সদ্‌গুণের সামনে 'নির্ভয়তা' তাল ঠুকিয়া দাঁড়ায় আর পশ্চাৎ রক্ষা করে 'নম্রতা'। এভাবে অতি সুন্দর ব্যূহ রচিত হয়। এখানে মোট ছাব্বিশটি গুণের কথা বলা হইয়াছে। এই গুণ-নিচয়ের পঁচিশটিও যদি আয়ত্ত হয় আর তৎসম্বন্ধে মনে কথঞ্চিৎ অহংকার জন্মে তবে পশ্চাৎ হইতে অকস্মাৎ আক্রমণে সব কিছু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তাই পশ্চাৎ ভাগে 'নম্রতা'রূপ সদ্‌গুণ মোতায়েন আছে। যদি নম্রতা না থাকে তবে জয় যে কখন পরাজয়ে রূপান্তরিত হইবে তাহা টেরও পাওয়া যাইবে না। এইভাবে সামনে 'নির্ভয়তা' ও পেছনে 'নম্রতা' মোতায়েন করিয়া সকল সদ্‌গুণের বিকাশ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই দুই গুণের মধ্যবর্তী যে চব্বিশটি গুণ তাহা বহুলাংশে অহিংসার পর্যায়ভুক্ত একথা বলা চলে। ভূতদয়া, মার্দব, ক্ষমা, শান্তি, অক্রোধ, অহিংসা, অদ্রোহ এ সবই স্বতন্ত্রভাবে অহিংসা পর্যায়ের শব্দ। অহিংসা ও সত্য এই দুই গুণে সব আসিয়া যায়। সব সদ্‌গুণের যদি সংক্ষেপ করা যায় ত শেষ পর্যন্ত বাকী থাকিবে সত্য ও অহিংসা এই দুই গুণ। অন্য সব গুণই এই দুইয়ের মধ্যে আসিয়া যায়। কিন্তু নির্ভয়তা ও নম্রতার কথা স্বতন্ত্র। নির্ভয়তার দ্বারা প্রগতি করা যাইতে পারে আর নম্রতা দ্বারা রক্ষা হইয়া থাকে। নির্ভয়তা সত্যের ও নম্রতা অহিংসার প্রতীক। সত্য ও অহিংসা এই দুই গুণের পুঁজি লইয়া নির্ভয়তাপূর্বক অগ্রসর হওয়া চাই। জীবন বিশাল। তাহাতে আমাদের অবাধে সঞ্চরণ করিতে হইবে। পা ভুল না করে এই জন্য নম্রতা সহকারে সতত চলা চাই। তাহা হইলে বিপদ থাকিবে না। তারপরে

সত্য ও অহিংসার প্রয়োগ সর্বত্র নির্ভয়ভাবে করিতে থাকুন। তাৎপর্য, সত্য ও অহিংসার বিকাশ নির্ভয়তা ও নম্রতার দ্বারা হইয়া থাকে।

এক দিকে সদ্‌গুণের ফৌজ যেমন দণ্ডায়মান, অপর দিকে তেমন দুর্গুণের ফৌজ প্রস্তুত। দম্ভ, অজ্ঞান আদি দুর্গুণের সম্বন্ধে অধিক বলা অনাবশ্যক। তাহাদের সহিত আমাদের নিত্য পরিচয়। দম্ভ যেন আমাদের অস্থিমজ্জাগত। সমগ্র জীবনটাই যেন দম্ভে প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞান সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে তাহা এক মনোহর অজুহাত হইয়া গিয়াছে আর তাহা আমরা প্রতি পদে জাহির করি। অজ্ঞান যেন বড় পাপ নহে। কিন্তু ভগবান বলিতেছেন, "অজ্ঞানই পাপ।" সক্রেটিস ইহার উল্টা বলিয়াছিলেন। নিজ মকদ্দমার সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "যাকে তোমরা পাপ মনে কর তা অজ্ঞান আর অজ্ঞান ক্ষম্য। অজ্ঞান ছাড়া পাপ কিরূপে হতে পারে? আর অজ্ঞানকে তুমি সাজা কি করে দেবে?" কিন্তু ভগবান বলেন, "অজ্ঞানও পাপই।" আইন বলে আইনের অজ্ঞতা সাফাইয়ের দলিল হইতে পারে না। ভগবানের বিধানের অজ্ঞতাও মস্ত বড় পাপ। ভগবানের ও সক্রেটিসের কথার ভাবার্থ একই। নিজ অজ্ঞানকে কি দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে ভগবান তাহা বলিয়াছেন আর অন্যের পাপ কোন দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে তাহা সক্রেটিস বলিতেছেন। অন্যের পাপ ক্ষমা করিতে হইবে। কিন্তু নিজের অজ্ঞান ক্ষমা করা পাপ। নিজ অজ্ঞানের লেশ-মাত্রও রাখিতে নাই।

(৯০)

এই ভাবে এক দিকে দৈবী সম্পত্তি ও অপর দিকে আসুরী সম্পত্তি—এই দুই সেনা দণ্ডায়মান। ইহার মধ্যে আসুরী সম্পত্তি ছাড়িতে ও দৈবী সম্পত্তি আশ্রয় করিতে হইবে। সত্য, অহিংসাদি দৈবী গুণসমূহের বিকাশ অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। মধ্যযুগেও খুব বিকাশ হইয়াছে। তবুও আজও বিকাশের পর্যাপ্ত অবসর আছে। বিকাশের সীমা শেষ হয় নাই। যতদিন পর্যন্ত আমাদের সামাজিক শরীর আছে ততদিন বিকাশের অনন্ত অবকাশ থাকিবে। ব্যষ্টির বিকাশ হইয়া গেলেও সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাগতিক বিকাশ বাকী থাকে। নিজ বিকাশের সার ঢালিয়া ব্যক্তিকে সমাজের

ও দেশের লাখো লোকের বিকাশের সূত্রপাত করিতে হয়। উদাহরণার্থ, মানুষ অনাদি কাল হইতে অহিংসার বিকাশ করিয়া আসিয়াছে আর আজও ঐ বিকাশক্রিয়া চলিতেছে।

কি ভাবে অহিংসার বিকাশ হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করার মত। উহা হইতে পারমার্থিক জীবনের বিকাশ উত্তরোত্তর কি ভাবে হইতেছে তাহা বুঝা যায়। হিংসক মানুষের আক্রমণ হইতে কি ভাবে বাঁচা যায় সেকথা অহিংসক মানুষ চিন্তা করিতে থাকে। সুরুতে সমাজ-রক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়বর্গ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু পরে তাহারাই সমাজ-ভক্ষক হয়। এই সব উন্মত্ত ক্ষত্রিয়ের হাত হইতে সমাজ কি ভাবে রক্ষা করা যায় সেকথা অহিংসক ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করিতে লাগিল। অহিংসক হইয়াও পরশুরাম স্বয়ং হিংসা অবলম্বন করিলেন এবং ক্ষত্রিয় বিনাশ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়দের হিংসা-মুক্ত করার জন্য তিনি নিজে হিংসক হইলেন। উহা অহিংসারই পরীক্ষা ছিল।" কিন্তু সফল হয় নাই। একুশবার ক্ষত্রিয় বিনাশ করিলেন। তবু ক্ষত্রিয় বাঁচিয়া থাকিল। কারণ ঐ পরীক্ষার মূলেই ছিল গলদ। যে ক্ষত্রিয়দের তিনি নিধন করিতে চাহিয়াছিলেন সংখ্যায় তাহারা আর একজন বাড়িল। তাহা হইলে ক্ষত্রিয়বর্গ কি ভাবে বিনাশ হইবে? নিজেই হিংসক ক্ষত্রিয় বনিয়া গেলেন। সেই বীজ ত বজায়ই থাকিল। বীজ রাখিয়া যে গাছ কাটে সে দেখিতে পায় যে গাছ পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছে। পরশুরাম ছিলেন ভাল মানুষ। কিন্তু লিপ্ত হইয়াছিলেন অতীব বিচিত্র পরীক্ষায়। স্বয়ং ক্ষত্রিয় হইয়া দুনিয়াকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে চাহিয়াছিলেন। বস্তুত আপনাকে দিয়া তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ করা উচিত ছিল। নিজের মাথাই তাঁহার প্রথমে দেওয়া উচিত ছিল। পরশুরামের দোষ আমি দেখাইতেছি, তার অর্থ এই নয় যে তাঁহা অপেক্ষা আমি বিজ্ঞ। আমি ত বালক। কিন্তু তাঁহার স্কন্ধে আমি দাঁড়াইয়া আছি। সেই হেতু স্বভাবতই আমি অধিক দেখিতে পাইতেছি। পরশুরামের পরীক্ষার মূলেই ছিল ভুল। হিংসাময় হইয়া হিংসা দূর করা সম্ভব নহে। উল্টা তার ফলে হিংসকের সংখ্যা মাত্র বাড়ে। কিন্তু সে কালে একথা ধরা পড়ে নাই। তখনকার ভাল ভাল মানুষের, মহান অহিংসাময় ব্যক্তিদের যেরূপ মনে হইয়াছিল তাঁহারা তদনুযায়ী পরীক্ষা

করিয়াছিলেন। পরশুরাম সেই সময়ের মহান অহিংসাবাদী ছিলেন। হিংসার জন্য তিনি হিংসা করেন নাই। অহিংসার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তিনি হিংসা করিয়াছিলেন।

সেই পরীক্ষা অসফল হইল। পরে রামের যুগ আসিল। তখন আবার ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করিতে লাগিল। তাহারা হিংসা ত্যাগ করিয়াছিল। ঠিক করিয়াছিল নিজেরা হিংসা করিবে না। কিন্তু রাক্ষসদের হিংসা হইতে কি প্রকারে বাঁচা যায়? তাহারা ভাবিল ক্ষত্রিয়েরা ত হিংসা করিয়াই থাকে। তাহাদের দ্বারা পরোক্ষভাবে রাক্ষসদের সংহার করিতে হইবে। কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হইবে। নিজেরা দূরে থাকিবে। বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষার্থে রামলক্ষ্মণকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের দ্বারা রাক্ষস সংহার করাইয়াছিলেন। আজ আমরা মনে করি যে, যে অহিংসা স্বসংরক্ষিত নহে, নিজ পা যার নাই এরূপ খোঁড়া-খঞ্জ অহিংসা কিরূপে দাঁড়াইতে পারে? কিন্তু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র সদৃশ ব্যক্তিদের কাছে ক্ষত্রিয়ের বল দ্বারা আত্মরক্ষা করাইয়া লওয়া দোষের মনে হয় নাই। কিন্তু রামের মত ক্ষত্রিয় যদি না মিলিত? বিশ্বামিত্র হয়ত বলিতেন, "আমি মরিব তবু হিংসা করিব না।" কারণ হিংসক হইয়া হিংসা করার পরীক্ষা যে ফলপ্রদ নয় তাহা দেখা গিয়াছিল। ইহা তখন ত নিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল যে নিজে অহিংসা ছাড়িব না। ক্ষত্রিয় না মেলে ত অহিংসভাবে বরং মরিয়া যাইব, এই পটভূমি তখন প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। বিশ্বামিত্রের সহিত যাইতে যাইতে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্তূপ কিসের?" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এ অস্থিস্তূপ ব্রাহ্মণের। অহিংসক ব্রাহ্মণেরা আক্রমণকারী হিংসক রাক্ষসদের পাল্টা জবাব দেয় নাই। তারা মরে শেষ হয়ে গেছে। তাদেরই অস্থির এই স্তূপ।" এই অহিংসায় ব্রাহ্মণদের ত্যাগ ত ছিলই কিন্তু সঙ্গে এ আশাও ছিল যে অন্যে তাদের রক্ষা করিবে। এইরূপ দুর্বলতার কারণে অহিংসা পূর্ণতা লাভ করে নাই।

পরে সাধু পুরুষেরা তৃতীয় আর এক পরীক্ষা করেন। তাঁহারা স্থির করেন যে অপরের সহায়তা কদাপি লইবেন না। নিজেদের অহিংসাই তাঁহাদের রক্ষা করিবে আর সেই রক্ষাই যথার্থ রক্ষা হইবে। সন্তদের এই পরীক্ষা ব্যক্তি-নিষ্ঠ ছিল। এই ব্যক্তিগত পরীক্ষাকে তাঁহারা পূর্ণতায়

লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ব্যক্তিতেই নিবন্ধ ছিল। সমাজের উপর যদি হিংসক লোকের আক্রমণ হইত আর সমাজ সাধুদের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "এখন আমরা কি করব?" সে ক্ষেত্রে সম্ভবত সাধুরা উহার সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম হইতেন। ব্যক্তিগত জীবনে পূর্ণ অহিংসার আচরণকারী সাধু সমাজকে এই জবাব দিতেছেন দেখিতে পাইতাম, "ভাই, আমরা নাচার।" সন্তদের আমি দোষ দিতেছি ইহা বাল-সাহস। কিন্তু তাঁহাদের স্কন্ধে উপবিষ্ট হইয়া যাহা দেখিতেছি তাহাই আমি বলিতেছি। তাঁহারা আমায় ক্ষমা করুন। আর করিবেনও। কারণ মহান তাঁহাদের ক্ষমা। অহিংসার পথে সমষ্টিগত প্রয়োগ করার প্রেরণা যে তাঁহাদের হয় নাই তা নয়। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি তেমন অনুকূল তাঁহাদের মনে হয় নাই। তাঁহারা নিজেদের মত পৃথক পৃথক পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ পৃথক পৃথক ভাবে কৃত পরীক্ষা হইতেই শাস্ত্র রচিত হয়। শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্মিলিত উপলব্ধি হইতে।

সন্তদের আচরণের পরে আজ আমাদের চতুর্থ পরীক্ষা চলিতেছে। সারা সমাজ মিলিয়া অহিংসাত্মক সাধন দ্বারা হিংসার প্রতিকার করার পরীক্ষা আজ আমরা করিতেছি। এইরূপে আজ পর্যন্ত চারি বার পরীক্ষা হইয়াছে। প্রত্যেক পরীক্ষায় অপূর্ণতা রহিয়াছে। বিকাশক্রমে ইহা অপরিহার্যও বটে। কিন্তু একথা বলিতেই হইবে যে তৎ তৎ কালের পক্ষে তৎ তৎ পরীক্ষা পূর্ণই ছিল। আর দশ হাজার বৎসর পরে আজিকার আমাদের এই অহিংস যুদ্ধেও অনেক কিছু হিংসা দেখা যাইবে। শুদ্ধ অহিংসার পরীক্ষা আরও হইতে থাকিবে। কেবল জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিরই নহে, সকল সদ্‌গুণেরই বিকাশ হইতেছে। পূর্ণ কেবল এক বস্তু। সে হইতেছে পরমাত্মা। ভগবদ্‌গীতার পুরুষোত্তমযোগ পূর্ণ। কিন্তু ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে এখনও তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে বাকী। বচনেরও বিকাশ হইয়া থাকে। ঋষিদের মন্ত্রদষ্টা মনে করা হইত, কর্তা নহে। তাঁহাদের কাছে মন্ত্রের যে অর্থ দেখা দিয়াছে তাহাই যে উহার অর্থ এরূপ নহে। তাঁহারা একদিক দেখিয়াছিলেন। তারপরে আমরা উহার আরও বিকশিত অর্থ দেখিতে পারি। তাঁহাদের অপেক্ষা আমরা যদি অধিক দেখি ত তাহা আমাদের কিছু বিশেষতা নহে।

কারণ, তাঁহাদের ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা আগে বাড়িয়া যাইতেছি। আমি এখানে অহিংসার বিকাশের কথাই বলিতেছি। সদ্‌গুণসমূহের নির্যাস বাহির করিতে গেলে মোটামুটি অহিংসাই বাহির হইবে। আর আমরা আজ সেই অহিংসাত্মক যুদ্ধেই লিপ্ত আছি। তাই এই তত্ত্বের বিকাশ কি ভাবে হইতেছে তাহা দেখিয়া লইলাম।

(৯১)

হিংসকদের আক্রমণ হইতে অহিংসকেরা কি ভাবে আত্মরক্ষা করিবে, অহিংসার সে দিক আমরা দেখিয়াছি। মানুষে-মানুষে পারস্পরিক ঝগড়াতে অহিংসার বিকাশ কি ভাবে হইতেছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষে আর পশুতেও ঝগড়া আছে। মানুষ অদ্যাবধি নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া মিটাইতে পারে নাই। সে পশু ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া আছে। মানুষ নিজেদের ঝগড়া আজ অবধি মিটাইতে পারে নাই আর নিজেদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট দুর্বল পশু না খাইলে তাহাদের জীবন চলে না। হাজারো বছর বাঁচিয়া থাকার পরেও কি ভাবে বাঁচিয়া থাকা উচিত সে চিন্তা মানুষ আজ পর্যন্ত করে নাই। মানুষের যে ভাবে বাঁচিয়া থাকা উচিত তেমন বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেছে না। এই চিন্তারও বিকাশ হইতেছে। এক সময়ে পশুর উপরই ছিল মানুষের পূর্ণ নির্ভর। কিন্তু জ্ঞানী ও উত্তম লোকদের তাহা ভাল লাগে নাই। মাংস যদি খাইতেই হয় তবে যজ্ঞে বলি দেওয়া পশুর মাংস খাওয়া উচিত এই বন্ধন তাহারা সৃষ্টি করে। হিংসা নিয়ন্ত্রণই ছিল উহার উদ্দেশ্য। কিছু লোকে মাংস সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু যাহারা মাংস সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারিল না, যজ্ঞে পরমেশ্বরকে অর্পণ করিয়া, কিছু তপস্যা করিয়া মাংস খাইতে পারে এই অনুমতি তাহাদের দেওয়া হইল। কেবল যজ্ঞের মাংসই খাওয়া যাইতে পারে এই নিয়ন্ত্রণ করিলে হিংসায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইবে এই কথা মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে যজ্ঞই প্রতিদিনকার ব্যাপার হইয়া যায়। মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হইলেই লোকে যজ্ঞ করিত, মাংস খাইত, এই ব্যাপার সুরু হইল। ভগবান বুদ্ধ আর একটু অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন, "মাংস খাবে

ত খাও কিন্তু দেবতার নামে খেও না।" এই দুইয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এক, হিংসার নিয়ন্ত্রণ। গাড়ীকে যে কোন উপায়ে সংযমের পথে আনা। যজ্ঞ কর বা নাই কর—দুই হইতেই মাংস-খাওয়া ত্যাগ করার শিক্ষা আমরা পাইলাম। এই ভাবে আস্তে আস্তে আমরা মাংস খাওয়া ছাড়িতে লাগিলাম।

জগতের ইতিহাসে এক ভারতবর্ষেই এই মহান পরীক্ষা হইয়াছে। কোটি কোটি মানুষ মাংস ছাড়িল। আর আজ আমরা যে মাংস খাই না ইহাতে আমাদের কোন কৃতিত্ব নাই। পূর্বজদের পুণ্যবলে আমরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু প্রাচীন ঋষিরা মাংস খাইতেন ইহা যদি আমরা বলি বা পড়ি ত আমাদের আশ্চর্য মনে হয়। "ঋষি মাংস খেত, ছিঃ তা কি কখনও সম্ভব!" কিন্তু মাংস খাইতে খাইতেই তাহা তাঁহারা সংযমপূর্বক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানেই তাঁহাদের মহত্ত্ব। সেই কষ্টের ধারণা আমাদের নাই। বিনা আয়াসে তাঁহাদের পুণ্য আমাদের মধ্যে বর্তাইয়াছে। কবি ভবভূতির উত্তর-রামচরিতে একটি প্রসঙ্গ আছে। বাল্মীকির আশ্রমে বশিষ্ঠ ঋষি আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য গোবৎস মারা হইয়াছিল। তখন একটি ছোট ছেলে কোন বড় ছেলেকে বলিল, "আমাদের আশ্রমে আজ এক দাড়িওয়ালা বাঘ এসেছে। সে আমাদের বাছুরের ঘাড় মটকেছে। তাই না?" বড় ছেলেটি বলিল, "ধেৎ, তিনি ত বশিষ্ঠ ঋষি। একথা বলতে নেই।" পূর্বে তাঁহারা মাংস খাইতেন আর আজ আমরা খাই না, সেই হেতু আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা বড় তাহা নহে। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার শ্রেয় আমরা অনায়াসে লাভ করিতেছি। আমাদিগকে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার বিকাশ করিতে হইবে। দুধ একেবারে ছাড়িয়া দেওয়ার পরীক্ষা আমাদের করা চাই। অন্য প্রাণীর দুধ খাওয়া মানুষের উচিত নহে। দশ হাজার বছর পরেকার লোকেরা আমাদের সম্বন্ধে বলিবে, "ভাল, আমাদের পূর্বজদের দুধ না খাওয়ার ব্রত গ্রহণ করতে হয়েছিল? দুধ তারা খেত কি করে? এমন জংগলী তারা ছিল!" সারাংশ, নির্ভয়তাপূর্বক, কিন্তু সবিনয়ে নিজ পরীক্ষায় আমাদের নিরন্তর অগ্রসর হইতে হইবে। সত্যের পরিধি আমাদের দিন দিন বিশাল করিতে হইবে। বিকাশের এখনও যথেষ্ট অবকাশ আছে। কোন গুণেরই পূর্ণ বিকাশ হয় নাই।

(৯২)

দৈবী সম্পত্তির বিকাশ করিতে হইবে। আর আসুরী সম্পত্তি হইতে আমাদের দূরে থাকিতে হইবে। লোকে উহা হইতে দূরে থাকুক তজ্জন্য ভগবান আসুরী সম্পত্তির বর্ণনা করিয়াছেন। এই আসুরী বর্ণনায় তিন মুখ্য কথা রহিয়াছে। 'সত্তা, সংস্কৃতি, সম্পত্তি' এই তিন বস্তুতে অসুর চরিত্রের সার বর্তমান। আমাদের সংস্কৃতি উৎকৃষ্ট ও তাহা সমস্ত জগতের উপর চাপাইতে হইবে এইরূপই ঐ উৎকট আকাঙ্ক্ষা। আমাদের সংস্কৃতিই কেন চাপানো হইবে? তদুত্তরে বলা হয় তাহা ভাল। কেন তাহা ভাল? তাহা নিজেদের তাই। আসুরী ব্যক্তিই হোক বা তাহাদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যই হোক, তাহার জন্য এই তিন জিনিষ আবশ্যক।

আমাদের সংস্কৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ একথা ব্রাহ্মণেরা মনে করে। সমস্ত জ্ঞান আমাদের বেদে আছে। সর্ব জগতে বৈদিক সংস্কৃতির বিজয় হওয়া চাই। 'অগ্রতশ্চতুরো বেদান্ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ'—এইরূপে সজ্জিত হইয়া পৃথিবীময় নিজ সংস্কৃতির ধ্বজা উড্ডীন কর। কিন্তু পিঠে 'সশরং ধনুঃ' থাকা মানে সম্মুখে ধৃত বেদ বেচারাকে বিদায় দেওয়া। মুসলমানেরাও ঠিক একথাই মনে করে যে কোরানে যাহা কিছু আছে সবই সত্য। খৃস্টানরাও তাহাই মনে করে। অন্য ধর্মের লোকে যত উচ্চস্তরে পৌঁছিয়া গিয়া থাকুক না কেন খৃস্টে বিশ্বাসী না হইলে তাহার স্বর্গলাভ সম্ভব নহে! ভগবানের মন্দিরে একটিই মাত্র দরজা তাহারা রাখিয়াছে! তার নাম খৃস্ট-দ্বার। লোকে নিজ ঘরে বহু দরজা-জানালা রাখে। কিন্তু বেচারা ভগবানের মন্দিরে একটিমাত্র দরজা তাহারা রাখে।

"কুলীন শ্রীমন্ত আমি, মম জুড়ি নাহি।"

ইহাই সকলের মনের কথা। আমি কে? ভরদ্বাজ কুলের! এই পরম্পরা আমাদের চলিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্যের অবস্থাও এই—জর্মান সরদারদের রক্ত আমাদের ধমনীতে! আমাদের এখানে গুরুপরম্পরা নাই কি? শঙ্কর মূল আদি গুরু। তারপরে ব্রহ্মদেব অথবা আর কেহ। তারপরে নারদ, তারপরে ব্যাস, তারপরে অন্য কোন ঋষি। তারপরে মধ্যে আরও পাঁচটি দশটি নাম আসে। তারপরে আমার গুরু ও আমি—এই পরম্পরা দেখা

যায়। আমি বড়, আমাদের সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠ, এই বংশাবলী হইতে একথাই সিদ্ধ করা হয়। ভাল, তোমার সংস্কৃতি যদি উত্তমই হইবে ত তোমার কার্যে তাহা সপ্রমাণ কর। উহার প্রভা নিজ আচরণে প্রতিফলিত কর। কিন্তু তাহা নয়। যে সংস্কৃতি নিজেতে নাই, নিজ পরিবারে নাই, তাহা সারা জগতে বিস্তার করার আকাঙ্ক্ষা—এই যে বিচার-সরণি তাহাকে আসুরী বলে।

আমার সংস্কৃতি সুন্দর। আর জগতের সমস্ত সম্পত্তি রাখার আমিই যোগ্য। জগতের সমস্ত সম্পত্তি আমার চাই আর তাহা আমাকে পাইতেই হইবে। এই সম্পত্তি কেন পাওয়া চাই? সকলের মধ্যে সমানভাবে বাঁটিয়া দেওয়ার জন্য! আর তাই নিজে সমস্ত সম্পত্তির মালিক বনিতেছি! আকবর একথাই বলিয়াছিলেন, "রাজপুতেরা আজও আমার সাম্রাজ্যভুক্ত হচ্ছে না কেন? এক সাম্রাজ্য হলে শান্তি বিরাজ করবে!" আকবর সত্যই অন্তরে এরূপ বিশ্বাস করিতেন। বর্তমান অসুরদের ধারণাও এইরূপ। সমস্ত বিত্ত একত্র করিতে হইবে। কেন? তাহা আবার সকলের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়ার জন্য।

তার জন্য আমার ক্ষমতা চাই। সকল ক্ষমতা এক হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া চাই। তামাম দুনিয়া আমার শাসনাধীনে থাকা চাই। আমার তন্ত্র অনুসারে স্ব-তন্ত্রের চলা চাই। আমার অধীনে যাহা আছে, আমার তন্ত্র অনুসারে যাহা চলে তাহা স্ব-তন্ত্র। এই ভাবে আসুরী সম্পত্তিতে সংস্কৃতি, সত্তা ও সম্পত্তি এই তিন মুখ্যকথার উপর জোর দেওয়া হয়।

এক সময় ছিল যখন সমাজে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব ছিল। তাহারা শাস্ত্র রচনা করিত, আইন প্রণয়ন করিত। রাজা তাহাদের মান্য করিত। ঐ যুগ পরে বদলিয়া গেল। ক্ষত্রিয়ের যুগ আসিল। ঘোড়া ছাড়া হইত, দিগ্বিজয়ে বাহির হইত। ক্ষত্রিয় সংস্কৃতি আসিল আর চলিয়াও গেল। ব্রাহ্মণ বলিত, "আমি শিক্ষাদাতা, অপর সকলে শিক্ষাগ্রহীতা। আমি ছাড়া গুরু কে?" ব্রাহ্মণের ছিল সংস্কৃতির গর্ব। ক্ষত্রিয়ের ভর ছিল ক্ষমতার উপর। "আজ একে মেরেছি, কাল ওকে মারব"—ইহাতে ছিল তাহার সমস্ত জোর। পরে বৈশ্যদের যুগ আসিল। "পিঠে মার, পেটে মেরো না"—ইহা

ছিল বৈশ্যদের সম্যক তত্ত্বজ্ঞান। যতকিছু শিক্ষা পেটের শিক্ষা। "এই ধন আমার, আর ওধনও আমার হয়ে যাবে"—এই জপ, আর এই সংকল্প। ইংরেজ বলিত না কি, "স্বরাজ চাই ত নাও। কেবল এখানে পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা আমাদের দিলেই হল। তারপরে তোমরা তোমাদের সংস্কৃতির যথেচ্ছা অনুসরণ কর। কৌপীন পরে নিজ সংস্কৃতির চর্চা করতে লেগে যাও।" আজকাল যে যুদ্ধ হয় সে ত ব্যবসায়ের জন্যই। এই যুগও যাইবে, যাইতে বসিয়াছে। এ সব আসুরী সম্পদের রূপ।

(৯৩)

আসুরী সম্পত্তি দূর করার চেষ্টা করিতে হইবে। সংক্ষেপে আসুরী সম্পত্তির অর্থ, "কাম, ক্রোধ ও লোভ।" এই তিন সারা সংসারকে নাচাইতেছে। এই নাচের এখন শেষ কর। তাহা আমাদের ছাড়িতেই হইবে। ক্রোধ ও লোভ কাম হইতে জন্মে। কামের অনুকূল অবস্থা হইলে লোভ জন্মে আর প্রতিকূল অবস্থা হইলে ক্রোধ জন্মে। এই তিন হইতে দূরে থাক একথা গীতায় পদে পদে বলা হইয়াছে। কাম-ক্রোধ-লোভ এই তিন নরকের সিংহদ্বার একথাই ষোড়শ অধ্যায়ের অন্তে বলা হইয়াছে। এই দ্বারে অনেক গমনাগমন চলে। অনেক লোক যাতায়াত করে। নরকের রাস্তা অত্যন্ত প্রশস্ত। উহাতে মোটর চলে। সংগীও অনেক মেলে। কিন্তু সত্যের রাস্তা সংকীর্ণ।

এইরূপ যে কাম-ক্রোধ তাহা হইতে বাঁচার উপায়? সংযমের মার্গ আশ্রয় দ্বারা। শাস্ত্রীয় সংযমের আশ্রয় লইতে হইবে। সাধুপুরুষদের অভিজ্ঞতার নামই শাস্ত্র। পরীক্ষান্তে সাধুরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহাই শাস্ত্র। সেই সংযম-সিদ্ধান্তের আশ্রয় লও। ব্যর্থ শংকা করিও না। কাম-ক্রোধ যদি জগৎ হইতে যায় ত জগতের কি হইবে? জগতের ত চলা চাই। অল্প হইলেও কাম-ক্রোধ রাখা দরকার নয় কি? দোহাই তোমাদের এই শংকা করিতে যাইও না। কাম-ক্রোধ পুরামাত্রায় আছে। তোমার যতটা চাই তদপেক্ষা বেশী আছে। তবে ব্যর্থ বুদ্ধিভেদ সৃষ্টি করিতেছ কেন? কাম-ক্রোধ-লোভ তোমার যতটা চাই তাহা অপেক্ষা

একটু বেশীই আছে। কাম যদি যায় তবে সন্ততি আসিবে কোথা হইতে এই চিন্তা করিও না। সন্ততি যতই সৃষ্টি কর, একদিন আসিবে, যখন মানুষের নাম পৃথিবী হইতে ধুইয়া-মুছিয়া যাইবে। ইহা শাস্ত্রজ্ঞদের কথা। পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইতেছে। এক সময়ে পৃথিবী অত্যন্ত গরম ছিল। তখন ইহাতে কোন জীব ছিল না। এক সময় এইরূপ আসিবে যখন পৃথিবী অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে আর সারা জীব-সৃষ্টি লোপ পাইবে। সেকথা লাখো বছরের। সন্ততি যতই বাড়াও না কেন, কিন্তু অন্তে এই প্রলয় নিশ্চয় আসিবে। পরমেশ্বর অবতার গ্রহণ করেন ত ধর্মরক্ষার্থে করেন, সংখ্যারক্ষার্থে নহে। যতদিন একজনও ধর্ম-পরায়ণ লোক আছে, যতদিন একজনও পাপভীরু লোক ও সত্যনিষ্ঠ লোক আছে ততদিন চিন্তা নাই। তাহার উপর ঈশ্বরের দৃষ্টি থাকিবে। ধর্ম যাহার নাশ হইয়াছে এমন হাজারো লোক থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি? না থাকারই শামিল।

এই সব মনে রাখিয়া সৃষ্টিতে ঠিকমত থাকুন, সংযমে চলুন। বেতাল হইবেন না। লোকে যেরূপ বলে তদ্রূপ চলিতে হইবে লোক-সংগ্রহের অর্থ তাহা নয়। মানুষের সংঘ বাড়াইয়া চলা, রাশীকৃত বিত্ত সংগ্রহ করা সংস্কার নহে। বিকাশের অবলম্বন সংখ্যা নহে। সমাজ যদি মাত্রাধিক বাড়িতে থাকে তবে মানুষ একে অন্যকে খুন করিতে থাকিবে। প্রথমে পশু-পক্ষী খাইয়া মনুষ্যসমাজের প্রসার হইবে। পরে নিজ পুত্রকন্যাদের কাটিয়া খাইতে আরম্ভ করিবে। কাম-ক্রোধের আবশ্যকতা আছে একথা স্বীকার করিলে, শেষ পর্যন্ত মানুষ মানুষকে কাটিয়া-ছিঁড়িয়া যে খাইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। লোক-সংগ্রহের মানে লোককে সুন্দর ও বিশুদ্ধ নীতি-মার্গ প্রদর্শন করা। কাম-ক্রোধ আদি হইতে মুক্ত হওয়ার ফলে পৃথিবী হইতে যদি মানুষ লোপ হইয়া যায়, তবে মঙ্গল গ্রহে জন্মিবে। তাই চিন্তার কিছু নাই। অব্যক্ত পরমাত্মা সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তিনি আমাদের ভাবনা ভাবিবেন। প্রথমে আমরা ত মুক্ত হই। আগেই অনেক দূরে দেখার দরকার নাই। সৃষ্টি ও মানবজাতির চিন্তা করিও না। তোমার নৈতিক শক্তি বাড়াও। কাম-ক্রোধ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দাও। "নিজ গলা ত

প্রথমে বের করে নে।" তোমার গলায় ফাঁস লাগিতেছে তাহা হইতে আগে বাঁচ ত। এইটুকু করিয়াছ ত অনেক করিয়াছ।

সংসার-সমুদ্র হইতে দূরে কিনারায় দাঁড়াইয়া সমুদ্রের মজা দেখিতে আনন্দ। যে সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে, যাহার নাকেমুখে জল ঢুকিতেছে সমুদ্রে তার কি আনন্দ? সন্তেরা সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আনন্দ লোটেন। সংসারে অলিপ্ত থাকার এই যে সন্তবৃত্তি তাহা জীবনে সঞ্চার করা ছাড়া আনন্দ নাই। পদ্মপত্রের মত অলিপ্ত থাক। বুদ্ধ বলিয়াছেন, "সন্ত পর্বতের উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে আছেন। আর সেখান থেকে নীচে সংসার দেখছেন। তাই এ সংসার ক্ষুদ্র মনে হয়।" আপনিও উপরে উঠিয়া দেখুন, এই বিশাল বিস্তার তখন ক্ষুদ্র দেখাইবে। তখন সংসারে আর মন বসিবে না।

সারাংশ, আসুরী সম্পত্তি দূর করিয়া দৈবী সম্পত্তি লাভ কর, একথা ভগবান এই অধ্যায়ে সাগ্রহে বলিয়াছেন। আসুন, আমরা সেই প্রযত্ন করি।

রবিবার, ৫-৬-৩২

সপ্তদশ অধ্যায়

(৯৪)

বন্ধুগণ,

আমরা ধীরে ধীরে অন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছি। পঞ্চদশ অধ্যায়ে আমরা জীবনের সম্পূর্ণ শাস্ত্র অবলোকন করিয়াছি। ষোড়শ অধ্যায়ে দেখিয়াছি এক পরিশিষ্ট। মানুষের মনে ও তাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ সমাজে দুই বৃত্তি, দুই সংস্কৃতি অথবা দুই সম্পত্তির ঝগড়া চলিতেছে। তাহা হইতে দৈবী সম্পত্তির বিকাশ করিতে হইবে, এই শিক্ষা ষোড়শ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে আমরা পাইয়াছি। আজ সপ্তদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখিতে হইবে। একদিক হইতে বলা যাইতে পারে যে এই অধ্যায়ে কার্যক্রমযোগ বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে গীতা দৈনন্দিন কার্যক্রমের সূচনা করিতেছে। আজিকার অধ্যায়ে নিত্য-ক্রিয়া সম্বন্ধে বিচার করা হইবে।

আমরা যদি চাহি যে আমাদের বৃত্তি প্রসন্ন ও মুক্ত হোক তাহা হইলে নিজ ব্যবহারের এক ক্রম বাঁধিয়া লওয়া দরকার। আমাদের নিত্যকার্যক্রম কোন-না-কোন নিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ঐ সীমার মধ্যে, ঐ এক নিশ্চিত নিয়মিত রীতিতে আমাদের জীবন যদি চলে তবেই মন মুক্ত থাকিতে পারে। নদী স্বচ্ছন্দ গতিতে বহে। কিন্তু তাহার প্রবাহ নিয়মে বাঁধা। যদি বাঁধা না থাকিত তবে তাহার মুক্তাবস্থা ব্যর্থ যাইত। জ্ঞানী পুরুষদের উদাহরণ নিজের চক্ষুর সামনে ধরুন। সূর্য এই জ্ঞানী পুরুষদের আচার্য। ভগবান কর্মযোগ প্রথমে সূর্যকে শিখাইলেন, আর সূর্য হইতে মনু অর্থাৎ বিচারশীল মানুষ তাহা পাইল। সূর্য স্বতন্ত্র ও মুক্ত। সে নিয়মাধীন, এখানেই তাহার স্বতন্ত্রতার সার। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে, আমরা যদি নির্ধারিত রাস্তায় বেড়াইতে অভ্যস্ত হই তবে রাস্তার দিকে না তাকাইয়াও মনে চিন্তা করিতে করিতে আমরা চলিতে পারি। বেড়াইবার জন্য যদি নিত্য নূতন রাস্তায় বাহির হই তবে সেই রাস্তার দিকেই সারা লক্ষ দিতে হইবে। মনের তখন ছুটি

থাকিবে না। সারাংশ, জীবন বোঝাস্বরূপ মনে না হইয়া আনন্দময় হয় এই জন্য নিজ ব্যবহার আমাদের বাঁধিয়া লওয়া উচিত।

তাই ভগবান এই অধ্যায়ে কার্যক্রম নির্দেশ করিতেছেন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তিন সংস্থা সঙ্গে লইয়া আসি। এই তিন সংস্থার কার্য ভালরূপে চালাইয়া মানুষ নিজ সংসার সুখময় করুক এ উদ্দেশ্যে গীতা এই কার্যক্রম নির্দেশ করিতেছে। এই তিন সংস্থা কিরূপ? আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আমাদের এই শরীরই এক সংস্থা; আমাদের আশেপাশে বিস্তৃত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড—এই অপার সৃষ্টি—আমি যাহার এক অংশ, ইহা দ্বিতীয় সংস্থা, আর যে সমাজে আমাদের জন্ম হইয়াছে সেই সমাজে আমাদের জন্মের প্রতীক্ষাকারী আমাদের মা-বাপ, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী—এই হইতেছে তৃতীয় সংস্থা। প্রতিদিন আমরা এই তিন সংস্থা ব্যবহার করি, ক্ষয় করি। গীতা চাহে, আমাদের দ্বারা এই সংস্থা-ত্রয়ের যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণের নিমিত্ত আমরা সতত প্রযত্ন করি আর নিজ জীবন সফল করি। অহংকার দূর করিয়া এই সব সংস্থার প্রতি আমাদের এই জন্মজাত কর্তব্য করিতে হইবে।

ভাল, এই সব কর্তব্য ত করিব। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা কিরূপ? যজ্ঞ, দান ও তপ, এই তিনের সংযোগে ঐ যোজনা। এই সকল শব্দ আমাদের পরিচিত হইলেও ইহাদের অর্থ আমরা ঠিকমত বুঝি না। অর্থ বুঝিয়া লইয়া নিজ জীবনে যদি ইহাদের সমাবিষ্ট করি তবে তিন সংস্থাই সফল হইবে আর আমাদের জীবনও মুক্ত ও প্রসন্ন থাকিবে।

(৯৫)

এই অর্থ বুঝার জন্য প্রথমে আমরা দেখিব যজ্ঞের অর্থ কি? সৃষ্টি সংস্থা হইতে প্রতিদিন আমরা কাজ লই। শতেক লোক কোন জায়গায় একত্র হইলে পরদিন দেখা যাইবে তথাকার পরিবেশ নোংরা হইয়া গিয়াছে। তথাকার হাওয়া আমরা দূষিত করিয়া দিই, স্থানটা নোংরা করিয়া ফেলি। আহার করি ত সৃষ্টি ক্ষয় করি। সৃষ্টি-সংস্থার এই ক্ষয় পূরণ করা চাই। সে জন্য যজ্ঞ-সংস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি? সৃষ্টির

যে হানি হয় তাহা পূরণ করার নাম যজ্ঞ। হাজারো বছর ধরিয়া আমরা চাষ-আবাদ করিয়া আসিতেছি। তার ফলে উর্বরতা কমিয়া যাইতেছে। আমরা ইহাকে ক্ষয় করিয়া আসিতেছি। যজ্ঞ বলে, "পৃথিবীকে তার সামর্থ্য ফিরিয়ে দাও। জমি চাষ কর, রোদ খাওয়াও, সার দাও।" ক্ষয় পূরণ করা যজ্ঞের এক হেতু, ব্যবহৃত জিনিষের শুদ্ধিকরণ দ্বিতীয় হেতু। আমরা কূয়া ব্যবহার করি। আশপাশ নোংরা হইয়া যায়। জল জমে। কূয়ার নিকটের এই যে পরিবেশ নোংরা হইয়াছে তাহা শুদ্ধ করা চাই। সেখানকার জল নিকাশ করা চাই। কাদা সরাইয়া ফেলা চাই। ক্ষতিপূরণ ও পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিছু তৈরিও করা চাই, যজ্ঞের ইহা তৃতীয় কথা। কাপড় পরি। আমাদের উচিত প্রতিদিন সূতা কাটিয়া তাহা নূতন বানাইয়া লওয়া। কার্পাস জন্মানো, ধান জন্মানো, সূতা কাটা, এ সবই যজ্ঞক্রিয়া। যজ্ঞে যাহা তৈরি করা হইবে তাহা স্বার্থের জন্য নহে। আমরা যে ক্ষতি করিয়াছি তাহা পূরণ করার কর্তব্যভাবনা তাহাতে থাকা চাই। ইহা পরোপকার নহে। সুরুতেই ত আমরা ঋণী হইয়া আছি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ঋণ মাথায় চাপিয়াছে। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য যাহা কিছু আমরা তৈরি করি তাহা যজ্ঞ অর্থাৎ সেবা। পরোপকার নহে। সে সেবার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। পদে পদে আমরা সৃষ্টি-সংস্থা ব্যবহার করি। তাহার ক্ষয় পূরণের নিমিত্ত, তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত ও নূতন উৎপাদনের জন্য যজ্ঞ করিতে হয়।

মনুষ্য সমাজ দ্বিতীয় সংস্থা। মা-বাপ, গুরু, মিত্র ইঁহারা সকলে আমাদের জন্য মেহনত করেন। এই ঋণ পরিশোধের জন্য দানের ব্যবস্থা। সমাজের ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত কৃত কর্মকে দান কহে। দানের অর্থ পরোপকার নহে। সমাজের কাছ হইতে আমি অপার সেবা লইয়াছি। পৃথিবীতে যখন আসি তখন দুর্বল ছিলাম, অসহায় ছিলাম। এই সমাজ আমাকে ছোট হইতে বড় করিয়াছে। সেই হেতু সমাজের সেবা করা আমার কর্তব্য। কাহারও কাছ হইতে কিছু না লইয়া সেবা করাকে পরোপকার কহে। কিন্তু এ স্থলে ত আগেই সমাজ হইতে ভরপুর লইয়া রাখিয়াছি। সমাজের এই ঋণ হইতে মুক্ত হওয়ার নিমিত্ত যে সেবা করা

যায় তাহাকে দান কহে। মনুষ্য-সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করার নাম দান। সৃষ্টির ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত কৃত শ্রমকে যজ্ঞ কহে। সমাজের ঋণ পরিশোধের জন্য শরীর, দ্রব্য ও অন্য সাধন দ্বারা যে সহায়তা করা যায় তাহা দান।

ইহা ছাড়া তৃতীয় এক সংস্থা আছে। তাহা হইতেছে শরীর। শরীরও দিন দিন ক্ষয় হইতে থাকে। আমরা মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকলের কাছ হইতে কাজ আদায় করি, ইহাদের ক্ষয় করি। এই শরীররূপ সংস্থায় যে বিকার, যে দোষ উৎপন্ন হয় তাহার শুদ্ধির জন্য তপের নির্দেশ আছে।

এই ভাবে সৃষ্টি, সমাজ ও শরীর এই তিন সংস্থার কাজ যাহাতে উত্তমরূপে চলে সেইরূপ আচরণ করা আমাদের কর্তব্য। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক সংস্থা আমরা সৃষ্টি করি। কিন্তু এই তিন সংস্থা আমাদের সৃষ্ট নহে। স্বভাবধর্মেই আমরা তাহা পাইয়া থাকি। এ সব সংস্থা কৃত্রিম নহে। অতএব এই তিন সংস্থার ক্ষতি, যজ্ঞ-দান-তপ এই সাধন দ্বারা পূর্ণ করা আমাদের স্বভাব-প্রাপ্ত ধর্ম। এই রীতি অনুসারে আমরা যদি চলি তবে আমাদের সকল শক্তি ইহাতে নিয়োজিত হইবে। অন্য কাজের জন্য আর শক্তি অবশিষ্ট থাকিবে না। সৃষ্টি, সমাজ ও এই দেহ, এই তিন সংস্থাকে সুন্দর করার জন্য আমাদের সারা শক্তি নিঃশেষে ব্যয় করিতে হইবে। কবীরের মত আমরাও যদি বলিতে পারি, "প্রভু, চাদর তুই দিয়েছিলি। যেমনি দিয়েছিলি তেমনি ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ভাল করে দেখে নে"—তবে তাহা হইতে মহান সাফল্য আর কি হইতে পারে! কিন্তু এরূপ সফলতা প্রাপ্তির নিমিত্ত যজ্ঞ-দান-তপরূপ ত্রিবিধ কার্যক্রমের অনুসরণ করা চাই।

যজ্ঞ, দান ও তপকে আমরা পৃথক পৃথক করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু আসলে কোন পার্থক্য নাই। কারণ সৃষ্টি, সমাজ আর শরীর এই তিন আদৌ ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা নহে। এই সমাজ সৃষ্টির বাহিরে নহে। এই শরীরও সৃষ্টিছাড়া নহে। তিনে মিলিয়া এক দিব্য সৃষ্টিসংস্থা রচিত

হয়। তাই যে উৎপাদক শ্রম আমরা করি, যে দান করি, যে তপ করি ব্যাপক অর্থে সে সবকেই যজ্ঞ বলা যাইবে। চতুর্থ অধ্যায়ে গীতা দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ ইত্যাদি যজ্ঞের কথা বলিয়াছে। গীতা যজ্ঞের অর্থ বিশাল করিয়া দিয়াছে।

এই তিন সংস্থার যত কিছু সেবা করিব তাহা যজ্ঞরূপই হওয়া চাই। তবে এই সেবা আকাঙ্ক্ষারহিত হওয়া চাই। এই সেবায় ফলের আকাঙ্ক্ষাই রাখা চলিবে না। কারণ ফল ত আমরা আগেই নিয়া রাখিয়াছি। ঋণ আগেই মাথায় চাপিয়া আছে। যাহা লওয়া হইয়াছে তাহা ফেরৎ দিতে হইবে। যজ্ঞের দ্বারা সৃষ্টিসংস্থায় সাম্যাবস্থা রক্ষিত হয়। এই ভাবে তিন সংস্থাতেই সাম্যাবস্থা রাখার এই কার্যক্রম। ইহা হইতে শুদ্ধি আসিবে। দূষিত ভাব নষ্ট হইবে।

এই যে সেবা করিতে হইবে তার জন্য কিছু ভোগও গ্রহণ করিতে হইবে। ভোগ যজ্ঞেরই এক অংগ। এই ভোগকে গীতা আহার বলিয়াছে। এই শরীররূপী যন্ত্রে অন্নরূপ কয়লা দেওয়া আবশ্যক। এই আহার স্বয়ং যজ্ঞ না হইলেও যজ্ঞ সিদ্ধ করার অংগ। আমরা তাই বলি, "উদরভরণ নোহে জাণিজে যজ্ঞকর্ম।" বাগিচা হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া দেবতার মাথায় চড়ানো পূজা। কিন্তু ফুল সৃষ্টি করার জন্য বাগিচায় যে মেহনত করা হয় তাহাও পূজা। যজ্ঞ পূরা করার নিমিত্ত যে সব ক্রিয়া করা হয় তাহাও এক প্রকারের পূজা। দেহকে আহার দিলেই না সে কাজের উপ-যোগী হইবে। যজ্ঞ-সাধনরূপ যে কর্ম তাহাও যজ্ঞ। গীতা এই সব কর্মকে "তদর্থীয় কর্ম"—যজ্ঞার্থ কর্ম বলে। সেবার্থে এই শরীর সতত কার্যক্ষম থাকে সেই জন্য এই শরীরকে আমি যে আহুতি দিই, সেই আহুতি যজ্ঞরূপ। সেবার নিমিত্ত আহার গ্রহণ করা পবিত্র কর্ম।

এই সব কথার মূলে আবার শ্রদ্ধা থাকা চাই। সকল সেবা পরমেশ্বরে অর্পণ করার ভাব থাকা চাই। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধি ছাড়া সেবাময়তা আসিতে পারে না। ঈশ্বরার্পণতাই প্রধান বস্তু একথা ভুলিলে চলিবে না।

(৯৬)

কিন্তু কখন আমরা ক্রিয়ামাত্রই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইব? যখন তাহা সাত্ত্বিক হইবে। আমাদের সব কর্ম যখন সাত্ত্বিক হইবে, কেবল তখনই আমরা তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারিব। যজ্ঞ, দান, তপ সব সাত্ত্বিক হওয়া চাই। ক্রিয়া কি ভাবে সাত্ত্বিক বানাইতে হইবে সেই তত্ত্ব আমরা চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখিয়াছি। সেই তত্ত্ব বিনিয়োগের কথা গীতা এই অধ্যায়ে বলিতেছে।

সাত্ত্বিকতার ব্যবস্থা গীতা দুই উদ্দেশ্যে করিয়াছে। বাহিরে যজ্ঞ-দান-তপরূপে আমার যে বিশ্বসেবা চলিতেছে, ভিতরে উহাকে আধ্যাত্মিক সাধন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। সৃষ্টির সেবা ও সাধন এ দুইয়ের কার্যক্রম ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত নহে। সাধনা ও সেবা এই দুইটি আসলে ভিন্ন বস্তু নহে। দুইয়ের জন্য একই প্রযত্ন, একই কর্ম। এই ভাবে কৃত যে কর্ম তাহাও অন্তে ঈশ্বরার্পণ করিতে হইবে। সেবা+সাধনা+ঈশ্বরার্পণতা এই যোগ একই ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধ হওয়া চাই।

যজ্ঞকে সাত্ত্বিক করার জন্য দুইটি বস্তু দরকার। নিষ্ফলতার অভাব ও সকামতার অভাব এই দুই বস্তু যজ্ঞে থাকা চাই। যজ্ঞে যদি সকামতা থাকে তবে তাহা রাজস হইয়া যাইবে। নিষ্ফলতা থাকে ত তাহা তামস হইয়া যাইবে।

সুতা কাটা এক যজ্ঞ। সুতা কাটাতে যদি আত্মা ঢালিয়া না দিই, তাহাতে যদি চিত্ত একাগ্র না হয় তবে সেই সূত্রযজ্ঞ জড় হইবে। বাহিরে যে ক্রিয়া চলিতেছে তাহার সহিত ভিতর হইতে যদি মনের যোগ না হয় ত সবটা কর্মই বিধিহীন হইবে। বিধিহীন কর্ম জড় কর্ম। বিধিহীন কর্মে তমোগুণ আসে। তাহা উৎকৃষ্ট সৃষ্টি করিতে অক্ষম। ফলের নিষ্পত্তি তাহা হইতে হইবে না। যজ্ঞে যদি সকামতা না থাকে তবে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হওয়ার কথা। কর্মে যদি মন না থাকে, আত্মা না থাকে, তবে সে কর্ম বোঝাস্বরূপ হইবে। তবে আর তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ফল কিরূপে মিলিবে? বাহিরের কাজ যদি বিগড়াইয়া যায় তবে নিশ্চিত বুঝিবে ভিতরে মনের যোগ ছিল না। কর্মে আত্মা ঢাল। অন্তরের

যোগ রাখ। সৃষ্টিসংস্থার ঋণ পরিশোধ করার জন্য আমাদিগকে উৎকৃষ্ট ফলোৎপত্তি করিতে হইবে। কর্মে ফলহীনতা না আসে এইজন্য অন্তরের যোগ বিধিযুক্ত হওয়া দরকার।

এইরূপে নিষ্কামতা যখন আমাদের ভিতরে আসিবে আর বিধি-পূর্বক ফলপ্রসূ কর্ম হইতে থাকিবে, তখনই আমাদের চিত্তশুদ্ধি আরম্ভ হইবে। চিত্তশুদ্ধির পরীক্ষা কি? বাহিরের কর্ম পরীক্ষা করিয়া দেখা। তাহা যদি নির্মল ও সুন্দর না হয় তবে চিত্ত মলিন একথা ধরিয়া লইতে বাধা নাই। ভাল, কর্মে সৌন্দর্য কখন আসে? শুদ্ধচিত্তে পরিশ্রম সহকারে কৃত কার্যের উপর পরমেশ্বর নিজ অনুমোদনের, নিজ প্রসন্নতার মোহর লাগাইয়া দেন। তুষ্ট পরমেশ্বর কর্মের পিঠে যখন প্রেমের হাত বুলান তখন তাহাতে সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। সৌন্দর্য মানে পবিত্র শ্রমের প্রাপ্য ভগবৎপ্রসাদ। মূর্তি গড়িতে গড়িতে শিল্পী যখন তন্ময় হইয়া যায় তখন তাহার মনে হয় ঐ যে সুন্দর মূর্তি তাহা সে বানায় নাই। মূর্তির আকার দিতে দিতে অন্তিম ক্ষণে কে জানে কোথা হইতে আপনা হইতে সৌন্দর্য আসিয়া যায়। চিত্তশুদ্ধি ছাড়া এই ঈশ্বরীয় কলা প্রকাশ হইতে পারে কি? মূর্তিতে যে স্বারস্য—মাধুর্য—তাহা নিজ অন্তঃকরণের সমস্ত সৌন্দর্য নিঃশেষে ঢালিয়া দেওয়ারই ফল। মূর্তি মানে আমাদের চিত্তের প্রতিমা। আমাদের সকল কর্ম আমাদের মনেরই মূর্তি। মন সুন্দর ত ঐ কর্মময় মূর্তিও সুন্দর। বাহিরের কর্মের শুদ্ধি মনের শুদ্ধি দিয়া আর মনের শুদ্ধি বাহিরের কর্ম দিয়া যাচাই করিতে হইবে।

আর এক কথা বাকী থাকিয়া গিয়াছে। তাহা এই যে, এই সব কর্মে মন্ত্রও থাকা চাই। মন্ত্রহীন কর্ম ব্যর্থ। সুতা কাটিতে কাটিতে মনে করিতে হইবে, এই যে আমি সুতা কাটিতেছি তাহা গরীব লোকের সহিত আমার সম্বন্ধ জুড়িয়া দিতেছে। এই মন্ত্র যদি হৃদয়ে না থাকে তবে ঘণ্টার পর ঘণ্টার ক্রিয়াও ব্যর্থ। সেই ক্রিয়াতে চিত্তশুদ্ধি হইবে না। কাপাসের ঐ পাঁজ হইতে অব্যক্ত পরমাত্মা সূত্ররূপে প্রকট হইতেছেন এই মন্ত্র ঐ ক্রিয়াতে জুড়িয়া দাও আর তারপরে ঐ ক্রিয়ার দিকে চাহিয়া দেখ। ঐ ক্রিয়া অতি সাত্ত্বিক ও সুন্দর হইবে। ঐ ক্রিয়া পূজা হইবে, যজ্ঞরূপ

সেবা হইবে। ঐ ক্ষীণপ্রায় সূতা দ্বারা সমাজের সহিত, জনতার সহিত, জগদীশ্বরের সহিত আমরা যুক্ত হইয়া যাইব। বালকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মুখে মাতা যশোদা সারা বিশ্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন। তোমার এই মন্ত্রময় সূতার তারেও তুমি বিশাল বিশ্ব দেখিতে থাকিবে।

(১৭)

এইরূপ সেবার জন্য আহারশুদ্ধি প্রয়োজন। যেমন আহার তেমন মন। আহার পরিমিত হওয়া চাই। আহার কি হইবে তাহা অপেক্ষা কতটা হইবে একথার মূল্য অধিক। আহার নির্বাচনের গুরুত্ব নাই তাহা নহে। কিন্তু যে আহার গ্রহণ করি তাহা পরিমাণ মত গ্রহণ করি কিনা তাহার গুরুত্ব অধিক। আমরা যাহা কিছু খাই তাহার পরিণাম অবশ্যই আছে। আমরা খাই কেন? উৎকৃষ্ট সেবা করার জন্য আহার যজ্ঞেরই অঙ্গ। সেবারূপ যজ্ঞ ফলপ্রদ হউক তাই না আহার। আহারকে এই দৃষ্টিতে দেখ। তাহা পরিষ্কার ও শুদ্ধ হওয়া চাই। কোন লোক নিজ জীবনে কতটা আহারশুদ্ধি করিবে তাহার কোন সীমা-রেখা নাই। কিন্তু আমাদের সমাজ আহারশুদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত তপস্যা করিয়াছে। আহারশুদ্ধির জন্য ভারতে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। ঐ পরীক্ষা হাজারো বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে। ঐ তপস্যার জন্য যে কত মূল্য দিতে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। জগতে একমাত্র ভারতবর্ষই সেই দেশ যেখানে সমগ্র জাতি মাংসাশন হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। যে সকল জাতির লোকে মাংসাহার করে তাহাদের আহারেও মাংস নিত্যবস্তু, মুখ্য বস্তু নহে। আর যাহারা মাংস খায় তাহারা তজ্জন্য নিজেদের কিছুটা ছোটও মনে করে। মনে তাহারাও মাংস ত্যাগ করিয়া বসিয়াছে। মাংসাহারের প্রবৃত্তি রোধ করার জন্য যজ্ঞের প্রচলন হয়। আর যজ্ঞ বন্ধও হইয়া যায় তদর্থে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত যজ্ঞের সংজ্ঞাই বদলাইয়া দেন। কৃষ্ণ দুধের মহিমা বাড়াইলেন। অসাধারণ কার্য কৃষ্ণ কিছু কম করেন নাই। কিন্তু হিন্দু জনসাধারণ কোন কৃষ্ণের আকর্ষণে পাগল? হিন্দু জনতার কাছে গোপালকৃষ্ণের নামই প্রিয়। ঐ কৃষ্ণ, পাশে তাঁর গাই, অধর-ওষ্ঠে মুরলী, এইরূপ যে গো-সেবক

গোপালকৃষ্ণ আবাল-বৃদ্ধ তাঁকেই জানে। মাংসাহার বন্ধের ফলে গো-রক্ষার পথ সুগম হইল। গরুর দুধের মহিমা বাড়িল ও মাংসাহার কমিল।

তাহা হইলেও সম্পূর্ণ আহারশুদ্ধি হইয়াছে তাহা নহে। আমাদের তাহা অগ্রসর করিতে হইবে। বাঙালীরা মাছ খায় বলিয়া বহুলোকে আশ্চর্য হয়। কিন্তু তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। বাংলায় কেবল ধান হয়। তাহা হইতে শরীরের সব রকম পুষ্টি মেলে না। এদিকে গবেষণার আবশ্যকতা আছে। মাছের পরিবর্তে কি রকম শাক-সব্জি খাইলে মাছের তুল্য পুষ্টি মিলে সেই পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, অসামান্য ত্যাগী ব্যক্তির উদ্ভব হইবে আর এরূপ পরীক্ষা চলিবে। এইরূপ ব্যক্তিই কেবল সমাজকে আগে লইয়া যাইতে পারে। সূর্য জ্বলিতেছে, তাই না জীবনধারণের উপযোগী আটানব্বই ডিগ্রী তাপ আমাদের শরীরে আছে। সমাজে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে যখন বৈরাগ্যের জ্বলন্ত সূর্য উদয় হয় আর সে যখন একান্ত নিষ্ঠাসহকারে পরিস্থিতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিনাপক্ষে ধ্যেয়াকাশে উড়িতে থাকে কেবল তখনই সংসারোপযোগী অল্পস্বল্প বৈরাগ্য আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মাংসাহার বন্ধ করার নিমিত্ত ঋষিদের কতই না তপস্যা করিতে হইয়াছে। কতই না প্রাণদান করিতে হইয়াছে, সেকথা এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে।

সারাংশ, আজ আমাদের সাম্প্রদায়িক আহারশুদ্ধি এতটা অগ্রসর হইয়াছে। অশেষ ত্যাগ করিয়া পূর্বজগণ যাহা কামাই করিয়াছেন তাহা যেন আমরা না খোয়াই। ভারতীয় সংস্কৃতির এই বিশেষত্ব যেন আমরা না ডুবাই। যে কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকা ত কথা নয়। কোন প্রকারে যে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহার কাজ সোজা। পশুও কোন না কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে। আমরা কি পশুর সমান? পশু ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান আছে। সে পার্থক্য বাড়ানোতেই সংস্কৃতির বৃদ্ধি। এই দেশ মাংসাহার ত্যাগের খুব বড় পরীক্ষা করিয়াছে। তাহা আরও অগ্রসর করিয়া দাও। নিদান পক্ষে যতটা আসিয়াছি তাহার পেছনে যেন না যাই।

এই কথা বলার হেতু আজকাল মাংসাহার অনেকের কাছে ভাল মনে হইতেছে। আজ পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতির প্রভাব একে অন্যের উপর পড়িতেছে। আমার বিশ্বাস অন্তে ইহার পরিণাম ভাল হইবে। পাশ্চাত্য

সংস্কৃতির হেতু আমাদের জড় শ্রদ্ধা ধ্বসিয়া পড়িতেছে। অন্ধ বিশ্বাস ধ্বসিলে কোন ক্ষতি নাই। যাহা ভাল তাহা টিকিবে, মন্দ দূর হইবে। অন্ধ শ্রদ্ধা গিয়া তাহার স্থলে অন্ধ অশ্রদ্ধার উৎপত্তি বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রদ্ধাই যে কেবল অন্ধ হয় তাহা নয়। অন্ধ বিশেষণের ঠিকাদারী শ্রদ্ধাই কেবল লইয়াছে তাহা নহে। অশ্রদ্ধাও অন্ধ হইতে পারে।

মাংসাহারের বিষয়ে আজ আবার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। যাহাই হোক, নবীন চিন্তা দেখা দেয় ত আমার খুব আনন্দ হয়। লোকে জাগ্রত হইতেছে, ধাক্কা দিতেছে, অন্তত ইহা ত বোঝা যায়। জাগৃতির লক্ষণ দেখিয়া আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু জাগ্রত হইয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে তেমনই চলিতে থাকিলে পতনের আশংকা থাকে। তাই পূর্ণ জাগৃতি না হওয়া পর্যন্ত, চক্ষু পুরা না খোলা পর্যন্ত, হাত-পাকে সীমাবদ্ধ রাখা ভাল। খুব বিচার করুন। এদিক ওদিক সব দিক হইতে বিচার করুন। ধর্মের উপর বিচারের কাঁচি চালান। এই বিচাররূপ কাঁচিতে যে ধর্ম কাটা যাইবে, জানিবেন তাহা নেহাত অকেজো। যে টুকরো এই-ভাবে কাটা যায় তাহাকে যাইতে দিন। সেই ধর্মই খাঁটি, আপনার কাঁচিতে যাহা কাটে না, উল্টা আপনার কাঁচি যাহাতে ভাঙ্গে। ধর্মের বিচারে ভয় নাই। বিচার করুন, কিন্তু হঠাৎ কাজ করিবেন না। অর্ধ জাগ্রত অবস্থায় কাজ করিবেন ত পড়িবেন। বিচার জোর চলে চলুক, তাহা হইলেও এখন আচার রক্ষা করিয়া চলুন। কার্যে সংযম রক্ষা করুন। পূর্ব-পুণ্য খোয়াইবেন না।

(১৮)

আহার-শুদ্ধি হইতে চিত্তশুদ্ধি আসিবে। শরীরেও বল লাভ হইবে। উত্তমরূপে সমাজসেবা করা যাইবে। চিত্তে সন্তোষ থাকিবে। সমাজে সন্তোষ বাড়িবে। যে সমাজে যজ্ঞ-দান-তপ ক্রিয়া বিধিবৎ ও মন্ত্র অনুসারে চলে সে সমাজে বিরোধ দেখা দেয় না। দুইখানি আরশি মুখো-মুখি রাখিলে যেমন ইহাতে উহা আর উহাতে ইহা দেখা যায়, তদ্রূপ বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ন্যায় অনুসারে ব্যক্তি ও সমাজে সন্তোষ প্রতিফলিত হইবে।

আমার সন্তোষ সমাজের সন্তোষ আর সমাজের সন্তোষ আমার সন্তোষ। উভয় সন্তোষ যাচাই করার সুযোগ হইবে, আর দেখা যাইবে যে তাহা একরূপই বটে। সর্বত্র অদ্বৈতের অনুভব হইবে। দ্বৈত ও দ্রোহ অস্ত যাইবে। যে যোজনা দ্বারা এইরূপ সুব্যবস্থা সমাজে আনা যায় সেই যোজনার কথাই গীতা প্রতিপাদন করিতেছে। আমাদের প্রতিদিনের কার্যক্রম যদি গীতার নির্দেশ অনুসারে বানাই তবে কতই না ভাল হইবে।

কিন্তু আজ ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সেই বিরোধ কিরূপে দূর করা যাইবে সে চর্চা সর্বত্র চলিতেছে। ব্যক্তি ও সমাজ এই দুইয়ের সীমা কোথায়? ব্যক্তি গৌণ কি সমাজ গৌণ? শ্রেষ্ঠ কোনটি? ব্যক্তিবাদের কোন কোন অগ্রণী সমাজকে জড় মনে করে। সেনাপতির কাছে কোন সৈনিক আসিলে সেনাপতি সৌম্য ভাষা ব্যবহার করে। তাহাকে 'আপনি' বলে। কিন্তু সৈন্যকে সে যেমন খুশি হুকুম দেয়। সৈন্য অচেতন, যেন কাঠের কুঁদা। এখান হইতে সেখানে রাখিবে আর সেখান হইতে এখানে। ব্যক্তি চৈতন্যময়। সমাজ জড়। দেখুন, এখানেও তাহা দেখা যাইতেছে। আমার সামনে দুই তিন শত লোক রহিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদের ভাল লাগুক বা নাই লাগুক আমি বলিয়া যাইতেছি। মনে যাহা আসিতেছে বলিতেছি। আপনারা যেন জড় পদার্থ। কিন্তু আমার কাছে কেহ আসিলে তাহার কথা শুনিতে হয় আর বিচার করিয়া জবাব দিতে হয়। অথচ এখানে আমি আপনাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি বসাইয়া রাখিয়াছি।

সমাজ জড় আর ব্যক্তি চৈতন্যময় একথা বলিয়া কেহ কেহ ব্যক্তি-চৈতন্যবাদ প্রতিপাদন করে আর কেহ বা সমুদায়কে গুরুত্ব দেয়। আমার চুল গিয়াছে, চক্ষু গিয়াছে, হাত অসাড় হইয়াছে, দাঁত পড়িয়াছে, এমন কি একটি ফুসফুসও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবুও আমি বাঁচিয়া আছি। পৃথক পৃথকভাবে এক একটি অবয়ব জড়। তাহাদের কোন একটি অবয়বের নাশে সর্বনাশ হয় না। সমগ্র শরীর চলিতেই থাকে। এইরূপ পরস্পরবিরোধী দুই বিচারধারা রহিয়াছে। যে দৃষ্টিতে দেখিবে, তেমনি পাইবে। যে রঙের চশমা, সে রঙেরই সৃষ্টি।

কেহ ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেয় আর কেহ সমাজকে। এই কারণে সমাজে জীবন-কলহের ভাব প্রসূত হইয়াছে। কিন্তু জীবন কি কলহের নিমিত্ত? তাহা অপেক্ষা আমরা মরিয়া যাই না কেন? কলহ ত মরণের নিমিত্ত। এই হেতু স্বার্থে ও পরমার্থে আমরা ভেদ করি। স্বার্থ ও পরমার্থে ব্যবধান রহিয়াছে এ কল্পনা সর্বপ্রথমে যে মানুষ করিয়াছিল তাহাকে শত ধন্যবাদ! যে বস্তুই আসলে নাই তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করার সামর্থ্য যে বুদ্ধির হইয়াছিল, মন তার যশোগান করিতে চাহে। যে ভেদ নাই তাহা সে খাড়া করিল ও লোককে শিখাইল, ইহা ভাবিয়া অবাক হই। ইহা চীনের দেওয়ালের মত। দিগন্তকে সীমাবদ্ধ করা আর তারপর বলা যে দিগন্তের ওপারে কিছু নাই। ইহাও তদ্রূপ। এই সব কারণে আজ যজ্ঞময় জীবনের অভাব হইয়াছে। আর তাহার ফলে ব্যক্তি ও সমাজে ভেদ দেখা দিয়াছে।

ব্যক্তি আর সমাজে বাস্তবিক ভেদ করা যায় না। কেমন ঘরকে দুই ভাগ করার জন্য যদি পর্দা ঝুলানো যায়, আর হাওয়াতে পর্দা আগে-পিছে দুলিতে থাকে তবে কখনও এই ভাগ বড় মনে হয়, কখনও ঐ ভাগ। হাওয়ার লহরের উপর ঐ বিভাগ নির্ভর করে। ঐ বিভাগ স্থায়ী নহে। গীতা এই ঝগড়ার পরে। কাল্পনিক এই ঝগড়া। গীতা অন্তঃশুদ্ধির নিয়ম পালন করিতে বলে। তাহা করিলে ব্যক্তি আর সমাজের হিতে কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় না। একে অপরের হিতের ঘাতক হইবে না। এই বাধা, এই বিরোধ দূর করাই গীতার বিশেষত্ব। গীতার এই নিয়ম আচরণ করিতে একজনও যদি পাওয়া যায় ত সেই একের দ্বারাই সারা দেশ সমৃদ্ধ হইবে। দেশ মানেই দেশের ব্যক্তি। যে দেশে এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন, আচারসম্পন্ন ব্যক্তি নাই সে দেশকে দেশ কিরূপে বলা যাইবে? হিন্দুস্থান মানে কি? হিন্দুস্থান মানে রবীন্দ্রনাথ, হিন্দুস্থান মানে গান্ধী বা তাদৃশ পাঁচ সাতটি নাম। বাহিরের জগৎ হিন্দুস্থানের ধারণা এই পাঁচ-সাত ব্যক্তি দিয়া করিয়া থাকে, প্রাচীনকালের দুই-চার ব্যক্তি, মধ্যযুগের চার-পাঁচ ও আজিকার সাত-আট নিন আর ইঁহাদের সহিত হিমালয় গঙ্গা আদি মিলাইয়া দিন। বস্, এই ত হিন্দুস্থান। ইহাই হিন্দুস্থানের সংজ্ঞা। বাকী সব এই

সংজ্ঞার ভাষ্য। ভাষ্য মানে সূত্রের বিস্তার। দুধ হইতে দই আর দই হইতে মাঠা-মাখন। দুধ, দই, মাঠা, মাখন, ইহাদের মধ্যে ঝগড়া নাই। দুধের পরীক্ষা তার মাখনে। তদ্রূপ সমাজের পরীক্ষা সমাজের ব্যক্তি দ্বারা করা যায়। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিরোধ নাই। বিরোধ থাকিবেই বা কি প্রকারে? ব্যক্তি-ব্যক্তিতেও বিরোধ হওয়া উচিত নহে। এক ব্যক্তি হইতে যদি অপর ব্যক্তি সম্পন্ন হয় ত তাহাতে ক্ষতি কি? কেহ বিপন্ন অবস্থায় না থাকে আর বিত্তবানের বিত্ত সমাজের কাজে আসে এই না চাই। অতএব আমার ডান জেবে পয়সা থাকিলেই বা কি, আর বাম জেবে থাকিলেই কি? দুই পকেটই ত আমার। কোন লোক ধনী হইলে, তাহাতে আমিই ধনী হই, দেশ ধনী হয়। এই পন্থার সাধনা করা যাইতে পারে।

কিন্তু আমরা ব্যবধান করি। ধড় ও শির পৃথক পৃথক হইলে উভয়েই মরিবে। ব্যক্তি ও সমাজে ভেদ করিও না। একই ক্রিয়া স্বার্থ ও পরমার্থকে কি ভাবে অবিরোধী বানাইয়া দেয় ইহাই গীতার শিক্ষা। আমার ঘরের হাওয়ায় আর বাহিরের অনন্ত হাওয়ায় বিরোধ নাই। বিরোধ কল্পনা করিয়া আমি যদি ঘর বন্ধ করিয়া দিই তবে দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইব। অবিরোধ কল্পনা করিয়া ঘর খুলিয়া দিতে দাও, অনন্ত হাওয়া ঘরে প্রবেশ করিবে। যে মুহূর্তে নিজ জমির ও নিজ ঘরের অংশ অপরের হইতে আলাদা করি, সেই মুহূর্তেই আমি অনন্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া যাই। আমার সেই ছোট ঘর পুড়িয়া যায়, পড়িয়া যায় ত আমার সর্বস্ব গিয়াছে বলিয়া কাঁদি। কিন্তু এরূপ কেন মনে করিতে যাইব, কাঁদিতে যাইব? সংকীর্ণ কল্পনা করি, আর তারপরে কাঁদি! এই পাঁচ শত টাকা আমার এরূপ বলিয়াছি কি সৃষ্টির অপার সম্পত্তি হইতে আমি দূরে সরিয়া গিয়াছি। এই দুই ভাই আমার এরূপ মনে করিয়াছি কি সংসারের অগণিত ভাই আমা হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। এ খেয়াল আমাদের থাকে না। মানুষ নিজকে কত সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে! বস্তুত মানুষের স্বার্থই পরমার্থ হওয়া চাই। যে পথে ব্যক্তি ও সমাজে উত্তম সহযোগ হইবে এমন সোজা সুন্দর পথ গীতা দেখাইতেছে। জিভে ও পেটে কি বিরোধ আছে? পেটের যতটা ভাত দরকার জিভের ততটা

দেওয়া উচিত। পেট বস্ বলিয়াছে ত জিভের বন্ধ করা চাই। পেট এক সংস্থা, জিভও এক সংস্থা। আমি এই সকল সংস্থার সম্রাট। এই সকল সংস্থায় অদ্বৈত বিদ্যমান। কোথা হইতে আনিলেন এই অভাগা বিরোধ? এক দেহস্থিত এই সকল সংস্থায় যেমন বাস্তবিক বিরোধ নাই, সহযোগ রহিয়াছে, সমাজ সম্বন্ধেও সেকথা। গীতার চিত্তশুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞ-দান-তপ-ক্রিয়ার বিধান সমাজে এই সহযোগ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে। এরূপ কর্মের দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়।

জীবন যাহার যজ্ঞময় সে সকলের হইয়া যায়। সন্তানমাত্রেই মনে করে মায়ের টান আমার উপরে। এই মানুষও তদ্রূপ সকলের কাছে আপন মনে হয়। সারা দুনিয়ার সে প্রিয় হয়। সারা দুনিয়া তাহাকে পাইতে চায়। সকলেই মনে করে এ আমার প্রাণ, মিত্র, সখা।

'সে পুরুষ ধন্য, লোকে যাহে চাহে অনন্য।'

সমর্থ রামদাস একথা বলিয়াছিলেন। এইরূপ জীবন গঠনের পথ গীতা দেখাইয়াছে।

(৯৯)

জীবন যজ্ঞময় বানাও আর তাহা ঈশ্বরে অর্পণ কর একথাও গীতা বলে। জীবন সেবাময় হইয়া গেল ত আর ঈশ্বরার্পণতা কেন? সমগ্র জীবন সেবাময় করিয়া দিতে হইবে একথা ত সহজে বলিয়া দিলাম। কিন্তু তাহা করা খুব কঠিন। তাহাতে অল্পাধিক সিদ্ধিলাভ সেও বহুজন্মসাপেক্ষ। তাহা ছাড়া সর্বকর্ম সেবাময়, অক্ষরে অক্ষরে সেবাময় হইলেও যে জীবন পূজাময় হইবে তাহা নহে। তাই 'ওঁ তৎসৎ' এই মন্ত্রের সহিত সব কিছু কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে।

সেবাকর্ম ষোল আনা সেবাময় হওয়া কঠিন। পরার্থেও স্বার্থের ছোপ লাগে। নিছক পরার্থ সম্ভবও নহে। এমন কোন কর্ম নাই যাহাতে আমার লেশমাত্র স্বার্থ নাই। তাই আমার সেবা দিনের পর দিন অধিকতর নিষ্কাম, অধিকতর নিঃস্বার্থ হোক এই ইচ্ছা পোষণ করা চাই। সেবা উত্তরোত্তর অধিকতর শুদ্ধ হোক ইহা যদি কাম্য হয় তবে সকল ক্রিয়া

ঈশ্বরে অর্পণ কর। জ্ঞানদেব বলিয়াছেন :

"জীবন-কলা সাধেন যোগী, বৈষ্ণব ভজে নাম মধুর।"

নামামৃতের মধুরতা ও জীবন-কলা ভিন্ন বস্তু নহে। নামের আন্তরিক জপ ও বাহ্য-জীবন-কলা এই দুইয়ে মিল আছে। যোগী আর বৈষ্ণব একই। পরমেশ্বরে ক্রিয়া অর্পণ করিলে স্বার্থ, পরার্থ ও পরমার্থ সব একরূপ হইয়া যায়। সুরুতে 'আমি' আর 'তুমি' পৃথক পৃথক থাকে। তাহা এক করা চাই। 'তুমি' ও 'আমি' মিলিলে না আমরা হয়। এখন 'আমরা' ও 'উহা'কে এক করিয়া লইতে হইবে। প্রথমে আমাকে এই সৃষ্টির সহিত যোগ সাধিতে হইবে, তারপরে পরমাত্মার সহিত। 'ওঁ তৎসৎ' মন্ত্রে ইহাই সূচিত হইয়াছে।

পরমাত্মার অনন্ত নাম। ব্যাসদেব সেই নামসমূহকে বিষ্ণুসহস্রনাম বানাইয়াছেন। যে নামই কল্পনা করিয়া লই তাহা তাঁহারই নাম। যে নামে আমাদের রুচি, সে অর্থেই এই সৃষ্টি আমাদের দেখিতে হইবে, আর জীবনও তদনুসারে গড়িতে হইবে। পরমেশ্বরের যে নাম মনে আসে সৃষ্টিতে তাহা দেখিব আর তদনুযায়ী আচরণ করিব। ইহাকে আমি ত্রিপদা গায়ত্রী বলি। উদাহরণার্থ, পরমেশ্বরের 'দয়াময়' এই নাম নিন। মনে করুন তিনিই রহিম। এবার চোখ মেলিয়া সেই দয়ার সাগর পরমেশ্বরকে এই সৃষ্টিতে দেখুন। পরমেশ্বর হরেক শিশুর সেবার জন্য মাতা দিয়াছেন, বাঁচিয়া থাকার জন্য হাওয়া দিয়াছেন। এইভাবে দয়াময়ের সৃষ্টিতে দয়ার ব্যবস্থা দেখুন আর নিজ জীবনও দয়াময় বানান। ভগবদ্‌গীতার সময়ে ভগবান যে নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন সে নাম ভগবদ্‌গীতা দিয়াছে। তাহা হইতেছে 'ওঁ তৎসৎ'।

'ওঁ'-এর অর্থ হাঁ, পরমাত্মা আছেন। এই বিংশ শতাব্দীতেও তিনি আছেন। "স এব অদ্য স উ শ্বঃ।" তিনি আজ আছেন, কাল ছিলেন আর কাল থাকিবেন। তিনি আছেন, সৃষ্টি আছে আর সাধনার জন্য কোমর কষিয়া আমিও তৈরি আছি। আমি সাধক, তিনি পরমেশ্বর আর এই সৃষ্টি পূজা-দ্রব্য, পূজা-সাধন। এই ভাবে যখন আমি বিভোর হইয়া যাইব তখন বলা যাইবে যে 'ওঁ' এই অক্ষর

আমার অন্তরে পশিয়াছে। তিনি আছেন, আমি আছি আর আমার সাধনাও আছে। এরূপে এই 'ওঁ'কার ভাব অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া চাই, সাধনায় প্রকট হওয়া চাই। সূর্যকে যখনই দেখিবেন, কিরণ সহিত তাহাকে দেখিতে পাইবেন। কিরণ দূরে রাখিয়া সে কখনও থাকিতে পারে না। সে কিরণ কখনও ভুলে না। তদ্রূপ যখনই যে দেখুক আমাদের মধ্যে সাধনা যেন দেখিতে পায়। তখনই কেবল বলা যাইবে যে 'ওঁ' অক্ষর আমরা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি।

অনন্তর 'সৎ'। পরমেশ্বর সৎ অর্থাৎ শুভ, মঙ্গল। এই ভাবনা মনে আনিয়া তাঁহার মাঙ্গল্য সৃষ্টিতে অনুভব কর। ঐ জল দেখ। জল হইতে এক কলসী ভরিয়া লও। ইহার ফলে যে গর্ত হয় তাহা তৎক্ষণাৎ ভরিয়া যায়। কিরূপ এই মাঙ্গল্য, কিরূপ এই প্রীতি! গহ্বর নদীর কাছে অসহ্য। গহ্বর ভরিতে সে ছুটে। 'নদী বেগেন শুদ্ধ্যতি।' বেগের কারণে সৃষ্টিরূপী দেহ অনুক্ষণ শুদ্ধ হইতেছে। তাই সমস্ত সৃষ্টি শুভ ও মঙ্গল। আমার কর্মও সেইরূপ হোক। পরমেশ্বরের এই 'সৎ' নাম আত্মসাৎ করার জন্য আমাদের সকল কর্ম নির্মল ও ভক্তিময় হওয়া চাই। পবিত্রকের দ্বারা যেমন সোমরস পরিস্রুত করা হইত তদ্রূপ নিরন্তর পরীক্ষা দ্বারা সকল কর্ম, আমাদের সকল সাধনা নির্দোষ করিয়া লইতে হইবে।

বাকী থাকিল 'তৎ'। 'তৎ' মানে তিনি, কিছু একটু স্বতন্ত্র, এই সৃষ্টি হইতে অলিপ্ত। পরমাত্মা এই সৃষ্টি হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ অলিপ্ত। সূর্য উঠিলে কমল ফোটে, পাখী ওড়ে, আঁধার দূর হয়। কিন্তু সূর্য ত দূরেই থাকে। এই সকল পরিণাম হইতে একেবারেই অলিপ্ত। নিজ কর্মে যখন অনাসক্তি দেখা দিবে, অলিপ্ততা আসিবে, তখন বুঝিবেন আমাদের জীবনে 'তৎ' অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

এরূপে 'ওঁ তৎসৎ' এই বৈদিক নাম অবলম্বন করিয়া গীতা সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখাইয়াছে। সর্ব কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করার কথা পূর্বে নবম অধ্যায়ে আসিয়াছে। 'যৎকরোষি যদশ্নাসি' এই শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। সেই কথাই সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে।

পরমেশ্বরার্পণ কর্ম সাত্ত্বিক হওয়া চাই। তবেই তাহা পরমেশ্বরে অর্পণ করা যাইতে পারে, এই কথাই এখানে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

(১০০)

এই সবই ঠিক। কিন্তু এক প্রশ্ন। 'ওঁ তৎসৎ' এই নাম একমাত্র পবিত্র পুরুষই হজম করিতে পারে। পাপী লোক কি করিবে? পাপীর মুখে শোভা পায় এমন কোন নাম আছে কি? 'ওঁ তৎসৎ' এই নামেই সে শক্তি রহিয়াছে। ঈশ্বরের যেকোন নামে অসত্য হইতে সত্যে নেওয়ার শক্তি আছে। পাপ হইতে নিষ্পাপের দিকে তাহা লইয়া যাইতে পারে। ধীরে ধীরে জীবন শুদ্ধ করা চাই। পরমাত্মা অবশ্য সাহায্য করিবেন। তোমার দুর্বল মুহূর্তে তোমার হাত ধরিবেন।

একদিকে পুণ্যময় অথচ অহংকারী জীবন আর অপর দিকে পাপময় অথচ নম্র জীবন; এই দুইয়ের একটি কেহ যদি আমায় বাছিয়া লইতে বলে ত মুখে বলিতে না পারিলেও অন্তরে আমি বলিব, "যে পাপে পরমেশ্বরের কথা স্মরণ থাকবে সে পাপই আমায় দাও।" পুণ্যময় জীবনে যদি পরমেশ্বরের বিস্মৃতি আসে তবে যে পাপময় জীবনে তাঁর কথা মনে থাকিবে সে জীবনই আমায় দাও, আমার মন একথাই বলিবে। একথার অর্থ এ নয় যে পাপময় জীবনের আমি সমর্থন করিতেছি। কিন্তু পাপ ততটা পাপ নয় পুণ্যের অহংকার যতটা পাপময়।

বহুবিধ জ্ঞান অভিমানে। নাহি যেন ঢাকে নারায়ণে॥

তুকারাম এইরূপ বলিয়াছেন। ঐরূপ জ্ঞানের দরকার নাই। তাহা অপেক্ষা পাপী থাকিব, দুঃখী থাকিব, তাহাও ভাল।

"জ্ঞানী যে ছেলে, মাও রাখে তারে দূরে।"

কিন্তু অজ্ঞান পুত্রকে মা নিজ কোলে তুলিয়া লইবেন। 'স্বাবলম্বী পুণ্যবান' আমি হইতে চাই না। 'পরমেশ্বরাবলম্বী পাপী' হওয়াই আমার কাছে প্রিয়। পরমাত্মার পাবিত্র্য আমার পাপ জীর্ণ করিয়া বাঁচিয়া থাকার মত শক্তি ধরে। পাপ হইতে বাঁচার প্রযত্ন আমাদের করিতেই হইবে। পাপ যদি রাখা না-ই যায় হৃদয় কাঁদিবে, মন ছটফট্ করিবে, পরমেশ্বরের

কথা তখন মনে হইবে। তিনি ত দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছেন। চিৎকার করিয়া বল, "আমি পাপী, তাই ত তোর দ্বারে এসেছি।" পুণ্যবানের ঈশ্বর-স্মরণের অধিকার আছে, কারণ সে পুণ্যবান। পাপীর ঈশ্বর-স্মরণের অধিকার আছে, কারণ সে পাপী।

রবিবার, ১২-৬-৩২

অষ্টাদশ অধ্যায়

(১০১)

বন্ধুগণ,

ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজ আমরা অষ্টাদশ অধ্যায়ে আসিয়া গিয়াছি। জগৎ ক্ষণে ক্ষণে বদলাইতেছে। এখানে কোন সংকল্প পুরা হওয়া না হওয়া ঈশ্বরের হাতে। তাহা ছাড়া জেলের অনিশ্চয়তা ত আছেই। এখানে কোন কাজ সুরু করিয়া পুরা করা যাইবে এই ভরসা কম! আরম্ভ করার সময় এই আশা আদৌ ছিল না যে গীতা শেষ করা যাইবে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমরা আজ উপসংহারে আসিয়া গিয়াছি।

চতুর্দশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন ভাগে জীবন বা কর্মকে ভাগ করা হইয়াছে। তাহা হইতে রাজস ও তামস বাদ দিয়া সাত্ত্বিক গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। পরে সপ্তদশ অধ্যায়ে একথাই আর এক ভাবে বলা হইয়াছে। যজ্ঞ, দান, তপ কিংবা এক কথায় বলিলে যজ্ঞই জীবনের সার। যজ্ঞোপযোগী যে আহারাদি কর্ম, তাহাকেও সাত্ত্বিক ও যজ্ঞরূপ দিয়া গ্রহণ করিবে। যজ্ঞরূপ ও সাত্ত্বিক কর্মই করার যোগ্য, অন্য সব ত্যাজ্য, এই কথা সপ্তদশ অধ্যায়ে ধ্বনিত হইয়াছে। ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্র কেন যে অনুক্ষণ স্মরণ করিতে হইবে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। ওঁ মানে সাতত্য, তৎ মানে অলিপ্ততা, সৎ মানে সাত্ত্বিকতা। আমাদের সাধনাতে সাতত্য, অলিপ্ততা ও সাত্ত্বিকতা আসা চাই। তবেই না সে সাধনা পরমেশ্বরে অর্পণ করার মত হইবে। কোন কর্ম গ্রাহ্য আর কোন কর্ম ত্যাজ্য, তাহা এই সব কথা হইতে বুঝা যায়।

গীতার শিক্ষা পূর্বাপর লক্ষ্য করিলে এই ধারণা জন্মে যে, স্থল-বিশেষেও কর্ম ত্যাগ করিতে নাই। গীতা কর্মফল ত্যাগের কথা বলে। কর্ম সতত করিবে, কিন্তু ফল ত্যাগ করিবে এই শিক্ষা গীতার সর্বত্র দেখা যায়। কিন্তু এ ত গেল এক দিক। অন্য দিক হইতেছে এই যে কিছু কর্ম করিবে আর কিছু কর্ম ত্যাগ করিবে। তাই শেষটায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন প্রশ্ন করিলেন, "এক দিকে হচ্ছে, যে কোন কর্ম ফলত্যাগপূর্বক

করবে। আর এক দিকে বলা হচ্ছে, কিছু কর্ম অবশ্যই ত্যাজ্য, আর কিছু করার যোগ্য। এ দুইয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে করা যায়?" জীবনের দিক স্পষ্ট করিয়া লওয়ার জন্য আর ফলত্যাগের মর্ম বুঝার জন্য এই প্রশ্ন। শাস্ত্রে যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাতে কর্ম স্বরূপত ছাড়িতে হয়। কর্মের যাহা স্বরূপ তাহা ত্যাগ করিতে হয়। ফলত্যাগে কর্ম ফলত ত্যাগ করিতে হয়। এখানে প্রশ্ন উঠিবে—গীতার ফলত্যাগের জন্য কর্মত্যাগের আবশ্যকতা আছে কি? সন্ন্যাসের পক্ষে ফলত্যাগের কষ্টিপাথর প্রয়োজন কি? সন্ন্যাসের সীমা কোন পর্যন্ত? সন্ন্যাস ও ফলত্যাগ এই দুইয়ের সীমা কি ও কতটা? ইহাই অর্জুনের প্রশ্ন।

(১০২)

ফলত্যাগের কষ্টিপাথর যে সার্বভৌম বস্তু সেকথা ভগবান উত্তরে সাফ করিয়া দিলেন। ফলত্যাগের তত্ত্ব সর্বত্র প্রয়োগ করা যায়। সর্ব কর্মের ফলত্যাগ আর রাজস ও তামস কর্মের ত্যাগ এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। কিছু কর্মের স্বরূপই এই যে, ফলত্যাগের যুক্তি প্রয়োগ করিলে তাহা আপনা হইতেই বাদ পড়ে। ফলত্যাগপূর্বক কর্ম করার অর্থই এই যে, কিছু কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে! ফলত্যাগপূর্বক কর্ম করার কথায় কিছু কর্মের প্রত্যক্ষ ত্যাগের প্রসঙ্গ আসিয়া যায়।

কথাটা একটু গভীরভাবে বিচার করুন। যাহা কাম্য কর্ম, যাহার মূলে কামনা রহিয়াছে, ফলত্যাগপূর্বক কর একথা বলা মাত্র সে কর্মের মূলে ছাই পড়ে। ফলত্যাগের সামনে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম তিষ্ঠিতেই পারে না। ফলত্যাগপূর্বক কর্ম করা—কৃত্রিম, তান্ত্রিক, যান্ত্রিক ক্রিয়া নহে। কোন কর্ম করিতে হইবে, আর কোন কর্ম করিতে নাই এই কষ্টিপাথরে কষিলেই তাহা ঠিক ধরা পড়িবে। কেহ কেহ বলেন, "গীতা বলে ফলত্যাগপূর্বক কর্ম কর। বস্ এই পর্যন্ত। কিরূপ কর্ম করিবে একথা বলে না।" এরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ ফলত্যাগপূর্বক কর্ম কর—একথা বলামাত্র কোন কর্ম করার যোগ্য আর কোন কর্ম অযোগ্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া যায়। হিংসাত্মক কর্ম, অসত্যময় কর্ম, চৌর্যকর্ম ইত্যাদি ফলত্যাগ-পূর্বক করা যায় না। ফলত্যাগের কষ্টিপাথরে কষিতেই তাহা নাকচ হইয়া

যায়। সূর্যের আলো পড়ামাত্র সব বস্তু উজ্জ্বল দেখায়; কিন্তু আঁধার উজ্জ্বল হয় কি? তাহা নষ্ট হইয়া যায়। নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্মের অবস্থাও তদ্রূপ। ফলত্যাগের কষ্টিপাথরে কর্ম যাচাই করিয়া লইতে হইবে। আমি যে কর্ম করিতে চাই, ফলের লেশমাত্র বাসনা না রাখিয়া অনাসক্তিপূর্বক তাহা করিতে পারিব কিনা তাহা আগে দেখিয়া লওয়া দরকার। ফলত্যাগই কর্ম করার কষ্টিপাথর। এই যাচাইয়ে কাম্য কর্ম আপনা হইতেই ত্যাজ্য প্রমাণিত হইবে। উহার সন্ন্যাসই বাঞ্ছনীয়। বাকী থাকিতেছে শুদ্ধ সাত্ত্বিক কর্ম। তাহা অনাসক্তভাবে অহঙ্কার ত্যাগপূর্বক করা চাই। কাম্য কর্মের ত্যাগ, তাহাও ত এক কর্মই। তাহাতেও ফলত্যাগের কাঁচি চালাও। কাম্য কর্মের ত্যাগও সহজ হওয়া চাই।

এই ভাবে তিন বস্তু আমরা পাইলাম। এক—যে কর্ম আমরা করি তাহা ফলত্যাগপূর্বক করা চাই। দুই—রাজস ও তামস কর্ম নিষিদ্ধ আর কাম্য কর্ম ফলত্যাগের কাঁচির সংস্পর্শে আপনা হইতেই বাদ যায়। তৃতীয় কথা—এত ত্যাগ করিয়াছি এমন অভিমান মনে না জন্মে, তজ্জন্য যে ত্যাগ করা হইবে তার উপরও ফলত্যাগের কাঁচি চালাইতে হইবে।

রাজস ও তামস কর্ম কেন ত্যাজ্য? কারণ তাহা শুদ্ধ নহে। শুদ্ধ নয় বলিয়া কর্তার চিত্তে ছাপ পড়িয়া থাকে। কিন্তু আরও বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সাত্ত্বিক কর্মও সদোষ। কর্মমাত্রেই দোষ আছে। চাষ-আবাদরূপ কর্মের কথা ধরুন। তাহা শুদ্ধ সাত্ত্বিক ক্রিয়া। কিন্তু যজ্ঞময় এই স্বধর্মরূপ চাষেও হিংসা আছে। চাষ-আবাদের ক্রিয়ায় অসংখ্য জীব মারা যায়। কূপের ধারে কাদা না হয় এই জন্য পাথর বসাইতে গেলেও বহু জীব নষ্ট হয়। সকালে ঘরের দরজা খুলিতেই সূর্যকিরণ ঘরে প্রবেশ করে, আর অগণিত প্রাণী মারা যায়। যাহাকে আমরা শুদ্ধীকরণ বলি তাহা মারণক্রিয়া ছাড়া আর কি! সারাংশ ঃ সাত্ত্বিক, স্বধর্মরূপ কর্মেও যদি দোষ স্পর্শে ত উপায়?

আগেই বলিয়াছি যে, সকল গুণের বিকাশ হইতে এখনও বাকী আছে। জ্ঞান, ভক্তি, সেবা, অহিংসা, এ সকলের কেবল বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হইয়াছে। সুরুতেই সকল উপলব্ধি লাভ হইয়াছে, তাহা নহে। উপলব্ধি করিতে

করিতে জগৎ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। চাষ-আবাদের কাজেও হিংসা আছে, অতএব অহিংসায় বিশ্বাসী লোকেরা তাহা করিতে পারে না। তাহারা ব্যবসা করুক। এইরূপ এক ভাব মধ্যযুগে দেখা গিয়াছিল। তাহারা বলিত—ধান বোনা পাপ, ধান বেচা পাপ নহে। কিন্তু এভাবে কর্ম এড়াইলে হিত হয় না। লোকে যদি এভাবে কর্ম সঙ্কোচ করিতে থাকে তবে শেষটায় আত্মনাশ হইবে। কর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা মানুষ যত ভাবিবে কর্মের প্রসার তত বাড়িবে। আপনার ধানের ব্যবসায়ের জন্য কাহাকে কি চাষ করিতে হইবে না? সেই চাষ-বাসের হিংসার ভাগ আপনাতে বর্তাইবে না কি? কার্পাস বুনিলে যদি পাপ হয়, তবে সেই উৎপন্ন কার্পাস বেচাও পাপ। কার্পাস উৎপাদন করা দোষের বলিয়া সে কর্ম ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে বুদ্ধি-দোষ রহিয়াছে। সকল কর্ম বর্জন করা, এ কর্ম নয়, ও কর্ম নয়, কিছুই করিও না, এই যে ভাব তাহাতে দয়ার লেশও নাই, দয়া মরিয়া গিয়াছে একথা বুঝা চাই। পাতা ছিঁড়িলে গাছ মরে না, উল্টা তাহা পল্লবিত হয়। ক্রিয়ার সঙ্কোচ করিলে আত্মসঙ্কোচ ঘটে।

(১০৩)

এখন প্রশ্ন এই, সব ক্রিয়াতেই যদি দোষ তবে সকল কর্মই কেন না ত্যাগ করিব? পূর্বে একবার একথার উত্তর দিয়াছি। সকল কর্মত্যাগের কল্পনা খুব সুন্দর। এই চিন্তা মনভুলানো। কিন্তু এই অসংখ্য কর্ম ছাড়ার যাহা উপায়, তাহা সাত্ত্বিক কর্মের বেলায়ও কি প্রযুক্ত? সদোষ সাত্ত্বিক কর্ম হইতে বাঁচার উপায় কি? মজা হইতেছে এই যে, "ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা" নীতি অবলম্বনে মানুষ যখন চলিতে থাকে তখন অমর বলিয়া ইন্দ্র মরে না, আর তক্ষকও মরে না, উল্টা দৃঢ় হইয়া বসে। সাত্ত্বিক কর্মে পুণ্য আছে, আর দোষও কিছু আছে। কিন্তু কিছু দোষ আছে বলিয়া সেই দোষের সহিত যদি পুণ্যকেও আহুতি দাও ত নাশ হওয়ার নয় বলিয়া পুণ্যক্রিয়া নষ্ট হইবে না, কিন্তু দোষক্রিয়া কেবল বাড়িয়া চলিবে। এরূপ গড়পড়তা নির্বিচার ত্যাগ দ্বারা পুণ্যরূপ ইন্দ্র ত মরেই না, আর দোষরূপ তক্ষক যে মরিতে পারিত সেও মরে না। অতএব উহা ত্যাগ করার উপায়

কি? হিংসা করে বলিয়া বিড়াল ত্যাগ করেন ত ইঁদুর হিংসা করিবে। সাপ হিংসা করে বলিয়া সাপ দূর করিলে শত শত জীব ফসল নষ্ট করিবে। ফসল নাশ হইলে হাজারো লোক মরিবে। ত্যাগ বিচারযুক্ত হওয়া চাই।

গোরখনাথকে মচ্ছীন্দ্রনাথ বলিলেন, "এ বালককে ধুয়ে আন।" পা ধরিয়া গোরখ বালককে খুব আছড়াইল আর বেড়ার উপর শুকাইতে দিল। মচ্ছীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধুয়ে এনেছ বালককে?" গোরখনাথ বলিল, "ধুয়ে শুকাতে দিয়েছি।" এই কি বালক ধোয়ার রীতি? কাপড় ধোয়ার আর মানুষ ধোয়ার রীতি এক নয়। এই দুই উপায় ভিন্ন ভিন্ন। তদ্রূপ রাজস ও তামস কর্মের ত্যাগে আর সাত্ত্বিক কর্মের ত্যাগে ব্যবধান আছে। সাত্ত্বিক কর্মত্যাগের উপায় আলাদা।

বিবেকহীন ভাবে কর্ম করিলে কিছু উল্টাপাল্টা ত হইবেই। তুকারাম বলিয়াছেন :

"ত্যাগ থেকে অন্তরে জাগে ভোগ।
বল দাতা! কি করে যাবে এ রোগ।"

ছোট ত্যাগ করিতে যাই ত বড় ভোগ মনে আসিয়া বাসা বাঁধে। তাই ঐ সামান্য ত্যাগও মিথ্যা হইয়া যায়। ছোটখাটো ত্যাগের পূর্তির জন্য বড় বড় ইন্দ্রপুরী রচনা করি। তাহা অপেক্ষা ঐ কুড়েই ত ভাল ছিল, পর্যাপ্ত ছিল। নেংটি পরিয়া রাজ্যের বিলাস-বৈভব আশপাশে জড়ো করা অপেক্ষা ধুতি ও শার্ট-কোট পরা অনেক ভাল। তাই ভগবান সাত্ত্বিক কর্মত্যাগের পদ্ধতিই পৃথক ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। সাত্ত্বিক কর্মমাত্রই করিতে হইবে, কিন্তু ফল তার ফেলিয়া দিতে হইবে। কিছু কর্ম ত মূলেই ত্যাজ্য। আর কিছুর ফলত্যাগ করিতে হয়। শরীরে দাগ লাগে ত ধুইয়া ফেলা যায়। কিন্তু প্রকৃতি যেখানে কালো রং দিয়াছে, সেখানে গায়ে হোয়াইট ওয়াশ লাগাইয়া কি লাভ? কালো রং আছে থাকিতে দাও। সেকথাই ভাবিও না। তাকে অমঙ্গলের মনে করিও না।

একটি লোক ছিল। নিজ গৃহ তার অশুভ মনে হইতেছিল। গৃহ ছাড়িয়া সে এক গাঁয়ে গেল। সেখানেও সে আবর্জনা দেখিতে পাইল। তাই গেল সে বনে। এক আম গাছের নীচে সে বসিয়াছে। একটা পাখী উপর

হইতে তার মাথায় মলত্যাগ করিল। জঙ্গলও অমঙ্গল একথা বলিয়া সে নদীজলে গিয়া দাঁড়াইল। নদীতে বড় মাছ ছোট মাছ খায়। ইহা দেখিয়া তার ঘৃণার অবধি রহিল না। সারা সংসারই অমঙ্গলে ভরা। সে ঠিক করিল মরা ছাড়া আর কোন পথ নাই। জল হইতে উঠিয়া আসিয়া সে আগুন জ্বালাইল। ওদিক হইতে এক ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "জীবন দেবে নাকি?" লোকটি বলিল, "কি আর করি! এ জগৎটাই অমঙ্গল।" গৃহস্থ বলিলেন, "তোমার এ দুর্গন্ধময় শরীর, এ চর্বি এখানে পোড়ালে মহা দুর্গন্ধ ছড়াবে। পাশেই আমরা থাকি। আমরা তখন যাব কোথায়? একটি চুল পোড়ে ত কি গন্ধ! আর তোমার সব চর্বি যে পুড়বে। চিন্তা করে দেখ কেমন দুর্গন্ধ ছড়াবে।" লোকটি হয়রান হইয়া বলিল, "বেঁচে থাকার সুযোগ নেই, মরারও সুবিধা নেই, এমনি এ দুনিয়া। কি করি!"

তাৎপর্য : অশুভ, অমঙ্গল বলিয়া সব কিছু ছাড়িলে ত চলে না। ছোট কর্ম হইতে বাঁচিতে যাইবে ত অপর বড় কর্ম কাঁধে চাপিয়া বসিবে। স্বরূপত বাহির হইতে ত্যাগ করিলেই ত কর্ম ছাড়ে না। প্রবাহপ্রাপ্ত কর্মের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য যদি কেহ শক্তি ক্ষয় করে, প্রবাহের উল্টা দিকে যাইতে চাহে ত শেষটায় ক্লান্ত হইয়া প্রবাহের দিকেই সে ভাসিয়া যাইবে। প্রবাহের অনুকূল যে কর্ম তাহা করিয়াই তাহাকে আত্মোদ্ধারের পথ দেখিতে হইবে। তাহার ফলে মনের মলিনতা কমিতে থাকিবে, চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকিবে। আগে চলিতে চলিতে আপনা হইতে ক্রিয়ার শেষ হইতে থাকিবে। কর্মত্যাগ না হইয়াও ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে। কর্ম যাইবে না, ক্রিয়া লোপ হইবে।

ক্রিয়া ও কর্ম এই দুইয়ে ব্যবধান আছে। উদাহরণার্থ, কোথাও খুব গোলযোগ চলিতেছে আর তাহা বন্ধ করা দরকার। কোন সিপাহী আসিল আর সোরগোল বন্ধ করার জন্য নিজে জোরে চিৎকার করিল। গোলমাল বন্ধ করার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলা-রূপ তীব্র কর্ম তাহাকে করিতে হইল। অপর একজন আসিল, স্রেফ দাঁড়াইয়া থাকিল আর অঙ্গুলি তুলিল। বস্, যথেষ্ট। তাহাতেই লোক শান্ত হইয়া গেল। তৃতীয় একজনের উপস্থিতি মাত্রেই সব শান্ত হইল। একজনের করিতে হইল তীব্র ক্রিয়া, দ্বিতীয়ের ক্রিয়া অনেকটা সৌম্য, আর তৃতীয়ের ক্রিয়া সূক্ষ্ম। ক্রিয়া ক্রমশঃ কমিয়া

চলিল। কিন্তু লোককে শান্ত করার কর্ম ছিল সমান। যেমন যেমন চিত্ত-শুদ্ধি হইতে থাকিবে, ক্রিয়ার তীব্রতা তেমন তেমন কমিতে থাকিবে। তীব্র হইতে সৌম্য, সৌম্য হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে শূন্য হইতে থাকিবে। কর্ম এক, ক্রিয়া আর এক। কর্তার যাহা ইষ্ট তাহাই কর্ম। ইহাই কর্মের সংজ্ঞা। কর্মে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় ত ক্রিয়ার জন্য এক স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে হয়।

কর্ম ও ক্রিয়াতে যে ব্যবধান তাহা বুঝিয়া লউন। চটিয়া গেলে কেহ খুব চিৎকার করিয়া আর কেহ আদৌ কিছু না বলিয়া রাগ প্রকাশ করে। জ্ঞানী পুরুষ লেশমাত্রও ক্রিয়া করেন না। কিন্তু অনন্ত কর্ম করেন। তাঁহার অস্তিত্বমাত্রই অপার লোকসংগ্রহ করিতে সক্ষম। জ্ঞানী পুরুষের উপস্থিতিই যথেষ্ট। তাঁহার হাত-পা কার্য না করিলেও তিনি কাজ করেন। ক্রিয়া যত সূক্ষ্ম হইতে থাকে কর্ম তত বাড়িতে থাকে। বিচারের এই ধারা যদি আরও অগ্রসর করিয়া দেন আর চিন্তা পরিপূর্ণ শুদ্ধ হইয়া যায়, তবে অন্তে শূন্যময় হইয়া অনন্ত কর্ম হইতে থাকিবে, একথা বলা চলে। প্রথমে তীব্র, পরে তীব্র হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে শূন্য, এইভাবেই ক্রিয়া শূন্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তখন অনন্ত কর্ম আপনা হইতে হইতে থাকিবে।

উপর উপর দূর করিলে কর্ম দূর হওয়ার নয়। নিষ্কামতাপূর্বক করিতে করিতে আস্তে আস্তে সে উপলব্ধি হইবে। কবি ব্রাউনিং 'কপটাচারী পোপ' নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। পোপকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি সাজগোজ কর কেন? এই সব আঙরাখা কেন? ওপরের এ ঢং কেন? কেনই বা এ গম্ভীর মুদ্রা?" পোপ বলিলেন, "কেন যে করি তা বলি। এ অভিনয় করতে করতে অজ্ঞাতেই সম্ভবত শ্রদ্ধার ছোঁয়াচ লাগবে।" তাই নিষ্কাম ক্রিয়া করিয়া যাইতে হইবে। আস্তে আস্তে নিষ্ক্রিয়তা আয়ত্ত হইয়া যাইবে।

(১০৪)

তাৎপর্য এই, রাজস ও তামস কর্ম অবশ্য ত্যাগ করিতে হইবে আর সাত্ত্বিক কর্ম করিতে হইবে এবং এই বিচার জাগ্রত হওয়া চাই যে, যে সাত্ত্বিক

কর্ম সহজ প্রবাহে আসে, সদোষ হইলেও তাহা ত্যাজ্য নহে। দোষ আছে থাক। তুমি নাককাটা। হইলেই বা। কাটিয়া সুন্দর করিতে যাইবে ত আরও অধিক বিশ্রী তাহা হইবে। তাহা যেমন আছে তেমনই ভাল। সাত্ত্বিক কর্ম সদোষ হইলেও সহজ প্রবাহপ্রাপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিতে নাই। তাহা করিতে হইবে, কিন্তু ফল ত্যাগ করিতে হইবে।

আর এক কথা। যে কর্ম সহজ স্বাভাবিকরূপে প্রাপ্ত নহে, তাহা উত্তমরূপে করা যাইবে মনে হইলেও করিতে যাইও না। যাহা প্রবাহ-প্রাপ্ত তাহা কর। ব্যস্তসমস্ত হইয়া, দৌড়-ঝাঁপ করিয়া অন্য নূতন কর্মের চক্রে পড়িতে যাইও না। যে কাজ স্পষ্টতই তোড়জোড় করিয়া করিতে হয়, যতই ভাল হোক, তাহা হইতে দূরে থাক। তাহার মোহে পড়িও না। কেবল সহজপ্রাপ্ত কর্মের ফলত্যাগ করা যাইতে পারে। এ কর্ম ভাল, ও কর্ম ভাল এই লোভে যদি মানুষ চারিদিকে দৌড়াইতে থাকে তবে আর ফলত্যাগ কি করিয়া হইবে? সারা জীবনটাই নাশ হইবে। ফলের আশায় সে পর-ধর্মরূপ কর্ম করিতে চাহিবে, আর ফলও হাত হইতে খোয়াইয়া বসিবে। জীবনে কোনরূপ স্থিরতাই তার লাভ হইবে না। মনে ঐ কর্মের আসক্তি জড়াইয়া যাইবে। সাত্ত্বিক কর্মেরও যদি লোভ জন্মে ত সে লোভ দূর করিতে হইবে। ঐ নানাবিধ সাত্ত্বিক কর্ম যদি করিতে যাও ত তাহাতে রাজস ও তামস ভাব আসিবে। তাই যাহা তোমার সহজপ্রাপ্ত সাত্ত্বিক স্বধর্ম তাহাই তুমি কর।

স্বধর্মে স্বদেশী ধর্ম, স্বজাতীয় ধর্ম ও স্বকালীন ধর্ম থাকে। এই তিনে মিলিয়া স্বধর্ম। আমার বৃত্তির পক্ষে কি অনুকূল ও অনুরূপ, কিরূপ কর্তব্য আমি পাইয়াছি, স্বধর্ম নির্ধারণ করার সময় এ সব দেখিতে হয়। তোমাতে 'তুমিত্ব' বলিয়া কিছু আছে আর তাই ত তুমি 'তুমি'। প্রত্যেকেরই বিশেষ কিছু থাকে। ছাগ থাকাতেই ছাগের বিকাশ। ছাগ থাকিয়াই উহাকে নিজ বিকাশ করিয়া লইতে হইবে। ছাগ যদি গরু হইতে চায় ত তাহা সম্ভব নহে। স্বয়ংপ্রাপ্ত ছাগত্ব ত্যাগ সে করিতে পারে না। তাহার জন্য তাহাকে শরীর ত্যাগ করিতে হইবে। নবধর্ম, নবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এ জন্মে ঐ ছাগত্বই তাহার পক্ষে পবিত্র! বলদ ও ব্যাঙের

গল্প আছে না? ব্যাঙের বড় হওয়ার একটা সীমা আছে। ব্যাঙ যদি বলদের সমান হইতে যায় ত মরিবে। অপরের রূপ নকল করিতে যাওয়া ঠিক নহে। তাই পরধর্মকে ভয়াবহ বলা হইয়াছে।

স্বধর্মের আবার দুই ভাগ। এক বদলায়, আর এক বদলায় না। আজিকার আমি আগামী কালের আমি নহি, কালের আমি পরশুর নহি। আমি নিরন্তর বদলাইতেছি। বাল্যকালের স্বধর্ম কেবল সংবর্ধন। যৌবনে আমাতে কর্মশক্তি ভরপুর থাকিবে আর তদ্দ্বারা আমি সমাজসেবা করিব। প্রৌঢ়াবস্থায় অপরে আমার জ্ঞানের ফল পাইবে। কতকগুলি স্বধর্ম এই-ভাবে বদলাইয়া থাকে, আর কতকগুলি আদৌ বদলায় না। পুরাতন শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় বলিলে বলিব, "মানুষের স্বধর্ম দ্বিবিধ—বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম। বর্ণ-ধর্ম বদলায় না। আশ্রমধর্ম বদলায়।"

আশ্রমধর্ম বদলায় মানে, ব্রহ্মচারীপদ পূর্ণ করিয়া গৃহস্থ হই, গৃহস্থ হইতে বানপ্রস্থী, আর বানপ্রস্থী হইতে সন্ন্যাসী। আশ্রমধর্ম এইভাবে বদলাইলেও, বর্ণধর্ম বদলানো যায় না। নিজ নৈসর্গিক সীমা আমার পক্ষে লংঘন করা সম্ভব নয়। সেই প্রযত্নই মিথ্যা। তোমাতে যে তুমিত্ব রহিয়াছে তাহা ছাড়ার সাধ্য নাই, এই কল্পনার উপর বর্ণধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বর্ণধর্মের কল্পনা মধুর। বর্ণধর্ম একেবারেই অপরিবর্তনীয় কি? ছাগীর যেমন ছাগীত্ব, গাভীর যেমন গাভীত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্বও কি তদ্রূপ? একথা আমি স্বীকার করি যে, বর্ণধর্ম এরূপ অনড় নহে। তবে উহার মর্ম বুঝা চাই। সামাজিক ব্যবস্থার উপায় স্বরূপে যখন বর্ণধর্মের ব্যবহার হয়, তখন উহার ব্যতিক্রম অবশ্যই হইবে। এরূপ ব্যতিক্রম গৃহীত বলিয়া ধরিতে হইবে। এই ব্যতিক্রম গীতা স্বীকার করিয়াছে। তাৎপর্য, এই দ্বিবিধ ধর্ম চিনিয়া লওয়ার পরে, অবান্তর ধর্ম সুন্দর ও মনোহর মনে হইলেও তার ফাঁদে পড়িবে না।

(১০৫)

ফলত্যাগ-কল্পনার যে ব্যাখ্যা আমরা এ পর্যন্ত করিয়াছি তাহা হইতে নিম্ন অর্থ পাওয়া যায়ঃ

১। রাজস ও তামস কর্মের পূর্ণ ত্যাগ।

২। সেই ত্যাগেরও ফলত্যাগ। উহার অহঙ্কার যেন না থাকে।

৩। সাত্ত্বিক কর্ম স্বরূপত ত্যাগ না করিয়া কেবল ফলত্যাগ।

৪। সাত্ত্বিক কর্ম সদোষ হইলেও তাহা ফলত্যাগপূর্বক করা।

৫। ফলত্যাগপূর্বক ঐ সব কর্ম সতত করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং তীব্র হইতে সৌম্য, সৌম্য হইতে সূক্ষ্ম আর সূক্ষ্ম হইতে শূন্য —এই ভাবে যাবতীয় ক্রিয়া লোপ পাইবে।

৬। ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু কর্ম, লোক-সংগ্রহরূপ কর্ম, চলিতেই থাকিবে।

৭। সাত্ত্বিক কর্মের মধ্যে যে কর্ম স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত তাহা করিতে হইবে। যাহা সহজপ্রাপ্ত নহে, যতই ভাল মনে হোক, তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। তার মোহ যেন না হয়।

৮। সহজপ্রাপ্ত স্বধর্ম আবার দুই প্রকারের। এক বদলায়, আর এক বদলায় না। বর্ণধর্ম পরিবর্তিত হয় না। আশ্রমধর্ম বদলায়। পরিবর্তনশীল স্বধর্মের পরিবর্তন হইতে থাকা চাই। তাহা হইলে প্রকৃতি বিশুদ্ধ থাকিবে।

প্রকৃতির বহিতে থাকা চাই। ঝরনা যদি না বহে তবে তাহা হইতে দুর্গন্ধ আসিবে। আশ্রমধর্ম সম্বন্ধেও ঐ কথা। প্রথমে মানুষ পায় পরিবার। আত্মবিকাশের জন্য সে নিজেকে পরিবারের বন্ধনে বাঁধে। তাহা হইতে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু পারিবারিক বন্ধনে যদি সে বরাবরের মত জড়াইয়া যায় ত তার বিনাশ হয়। পরিবারে ভুক্ত হওয়া যাহা এক সময়ে ধর্মরূপ ছিল, তাহা তখন অধর্মরূপ হইবে। কারণ সেই ধর্ম বন্ধনের হেতু হইয়া গিয়াছে। পরিবর্তনশীল ধর্ম যদি আসক্তিহেতু না ছাড় ত তার পরিণাম ভয়ানক হইবে। ভাল জিনিষেও যেন আসক্তি না জন্মে। আসক্তি হইতে ঘোর অনর্থ ঘটে। ক্ষয়ের জীবাণু ফুসফুসে প্রবেশ করিলে সারা দেহটাই ভিতরে ফোপরা করিয়া দেয়। সাত্ত্বিক কর্মে আসক্তির জীবাণু যদি অসাবধানতাবশতঃ প্রবেশ করিতে দাও ত স্বধর্মে পচন ধরিবে। সেই সাত্ত্বিক স্বধর্মে রাজস ও তামসের দুর্গন্ধ জন্মিবে। তাই পরিবাররূপ পরিবর্তনশীল স্বধর্ম সময়মত খসিয়া পড়া চাই। দেশধর্ম সম্বন্ধেও ঐ

কথা। দেশধর্মে যদি আসক্তি আসে, আর কেবল নিজ দেশের কথাই যদি আমরা ভাবিতে থাকি তবে দেশভক্তি ভয়ঙ্কর বস্তু হইবে। তার ফলে আত্ম-বিকাশ বন্ধ হইয়া যাইবে। চিত্তে আসক্তি ঘর বাঁধিবে আর অধঃপাত সুরু হইবে।

(১০৬)

সারাংশ, জীবনের ফলিত পাইতে চাও ত ফলত্যাগরূপী চিন্তামণির শরণ লও। সে তোমায় পথ দেখাইবে। ফলত্যাগের তত্ত্ব নিজ সীমাও নির্দেশ করে। এই দীপ নিকটে থাকিলে কি করিতে হইবে, কি করিতে হইবে না, কখন কি বদলাইতে হইবে এ সবই বুঝা যাইবে। কিন্তু আর একটি বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাক। সম্পূর্ণ ক্রিয়ালোপের যে অন্তিম স্থিতি সে দিকে কি সাধকের লক্ষ্য রাখা দরকার? ক্রিয়া না করিলেও অসংখ্য কর্ম হইতে থাকে, জ্ঞানী পুরুষের এই যে স্থিতি সে দিকে কি সাধকের দৃষ্টি রাখিতে হইবে?

বস্তুত তাহা নহে। এখানেও ফলত্যাগের কষ্টিপাথর ব্যবহার কর। আমাদের জীবনের স্বরূপ এমনই সুন্দর যে, যাহা আমাদের প্রয়োজন সে দিকে দৃষ্টি না রাখিলেও তাহা আমাদের লাভ হইবে। জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ফল মোক্ষ। ঐ মোক্ষ, ঐ অকর্মাবস্থা তাহাতেও লোভ করিও না। ঐ স্থিতি অজ্ঞাতেই লাভ হইবে। সন্ন্যাস বস্তুটি এরূপ নয় যে অকস্মাৎ দুই পাঁচ মিনিটে আসিয়া যাইবে। সন্ন্যাস যান্ত্রিক বস্তু নহে। তোমার জীবনে তাহা কি ভাবে বিকশিত হইতে থাকিবে, তুমি টেরও পাইবে না। তাই মোক্ষের চিন্তা ছাড়।

ভক্ত সদা ভগবানকে বলে, "এ ভক্তিই আমার যথেষ্ট। ঐ মোক্ষ, ঐ অন্তিম ফল তা আমি চাই না।" মুক্তি মানে এক প্রকারের ভুক্তিই বটে। মোক্ষ এক প্রকারের ভোগই বটে, এক ফলই বটে। এই মোক্ষরূপ ফলের উপরও ফলত্যাগের কাঁচি চালাইবে। কিন্তু তাহাতে মোক্ষ হাতছাড়া হওয়ার নয়। কাঁচি ভাঙ্গিবে, ফল অধিক দৃঢ় হইবে। মোক্ষের বাসনা ছাড়িয়াছ ত অজ্ঞাতেই মোক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছ। সাধনাতে এমন তন্ময় হইয়া যাও যে, মোক্ষের কথাই যেন মনে না থাকে আর মোক্ষ তখন তোমায় খুঁজিয়া

তোমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে। সাধক সাধনাতেই মজিয়া যাইবে। 'মা তে সঙ্গোঽস্তকর্মণি'—অকর্মদশার, মোক্ষের আসক্তি রাখিও না—একথা ভগবান আগেই বলিয়াছেন। এখন অন্তে আবার বলিতেছেন :

'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'

আমি মোক্ষদাতা, সমর্থ। মোক্ষের ভাবনা ভাবিও না। তুমি সাধনার কথাই ভাব। মোক্ষের কথা ভুলিয়া গেলে সাধনা উৎকৃষ্ট হইবে আর মোক্ষ বশীভূত হইয়া তোমার কাছে আসিবে। মোক্ষনিরপেক্ষ বৃত্তিতে একমাত্র সাধনায় তন্ময় হইলে মোক্ষলক্ষ্মী সাধকের গলায় মাল্যদান করেন।

সাধনার যেখানে পরাকাষ্ঠা সেখানে সিদ্ধি করজোড়ে দণ্ডায়মান। যাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে, সে গাছের তলায় বসিয়া যদি 'বাড়ী বাড়ী' বলিতে থাকে তবে বাড়ী দূরেই থাকিয়া যাইবে, আর তার জঙ্গলে থাকার পালা আসিবে। বাড়ীর কথা ভাবিতে ভাবিতে যদি রাস্তায় বিশ্রাম করিতে থাক তবে ঐ অন্তিম বিশ্রামস্থান হইতে দূরেই থাকিবে। চলার চেষ্টা আমায় করিতে হইবে। বাড়ী তখন একেবারে সামনে আসিয়া যাইবে। মোক্ষের নিশ্চেষ্ট স্মরণে, আমার প্রযত্নে, আমার সাধনায় শিথিলতা দেখা দিবে আর মোক্ষ দূরে চলিয়া যাইবে। মোক্ষ উপেক্ষা করিয়া সতত সাধনা করা মোক্ষ হাতে পাওয়ার উপায়। অকর্মাবস্থার, বিশ্রামের, লালসা রাখিও না। সাধনার প্রেমে মজ, মোক্ষ আসিবেই আসিবে। উত্তর উত্তর করিয়া চিৎকার করিলে প্রশ্নের উত্তর মেলে না। উহার যে উপায় আমি পাইয়াছি তাহা দ্বারা ক্রমশঃ উত্তর মিলিবে। সে উপায়ের যেখানে সমাপ্তি সেখানে উত্তর তোমার অপেক্ষায় হাজির। সমাপ্তির পূর্বে কিরূপে সমাপ্তি হইবে? উপায়ের আগে উত্তর কি করিয়া পাওয়া যাইবে? সাধকের অবস্থায় সিদ্ধাবস্থা কিরূপে পাওয়া যাইবে? জলে হাবুডুবু খাইতে খাইতে অপর পারের মজার কথায় মশগুল হইলে কিরূপে চলিবে। সে অবস্থায় এক এক হাত করিয়া জল কাটিয়া আগে যাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই। তাহাতে সারা শক্তি লাগানো চাই। সাধনা পূর্ণ কর, সমুদ্র লঙ্ঘন কর, মোক্ষ আপনা হইতে আসিয়া হাজির হইবে।

(১০৭)

জ্ঞানী পুরুষের অন্তিম অবস্থায় সকল ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যায়, শূন্য-রূপ হইয়া যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঐ অন্তিম অবস্থায় ক্রিয়া হইবেই না। তাহা দ্বারা ক্রিয়া হইবে আর হইবেও না। এই অন্তিম অবস্থা অতীব রমণীয়, উদাত্ত। এই অবস্থায় যাহা কিছু হইবে তাহার ভাবনা তাহার থাকে না। যাহা কিছু হইবে, শুভ ও সুন্দর হইবে। সাধনার পরাকাষ্ঠার অবস্থায় তখন সে উপস্থিত। এ অবস্থায় সব কিছু করিয়াও সে কিছু করে না। সংহার করিয়াও সংহার করে না। কল্যাণ করিয়াও কল্যাণ করে না।

এই অন্তিম মোক্ষাবস্থা বলিতে সাধকের সাধনার পরাকাষ্ঠা বুঝায়। সাধকের সাধনার পরাকাষ্ঠা মানে সাধকের সহজ অবস্থা। আমি কিছু করিতেছি এ বোধ পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকে না। অথবা এই দশাকে আমি সাধকের সাধনার 'অনৈতিকতা' বলিব। সিদ্ধাবস্থা নৈতিক অবস্থা নহে। ছোট শিশু সত্য কথা বলে। কিন্তু তাহা নৈতিক নহে। কারণ অসত্য যে কি তা সে জানেই না। অসত্যের জ্ঞান হওয়ার পরে সত্য বলে ত তাহা নৈতিক কর্ম। সিদ্ধাবস্থায় অসত্য বলিয়া কিছু থাকে না। সেখানে একমাত্র সত্যই আছে। তাই সেখানে নীতি নাই। যাহা নিষিদ্ধ তার সেখানে ঠাঁই নাই। যাহা শোনার মত তাহা কানে প্রবেশ করে না। যাহা দেখার মত নয় তাহা চোখ দেখে না। যাহা করার যোগ্য হাত তাহা করে। চেষ্টা করিতে হয় না। যাহা করার অযোগ্য তাহা বর্জন করিতে হয় না। আপনা হইতেই তাহা দূরে থাকে। এরূপই এই নীতিশূন্য অবস্থা। সাধনার এই যে পরাকাষ্ঠা, সাধনার এই যে সহজ অবস্থা অথবা অনৈতিকতা বা অতি-নৈতিকতা যাহাই বলুন, সে অতিনৈতিকতায় নীতির চরমোৎকর্ষ রহিয়াছে। 'অনৈতিকতা' শব্দ আমার ভাল লাগিয়াছে। অথবা এই অবস্থাকে 'সাত্ত্বিক সাধনার নিঃসত্ত্বতা'ও বলা যাইতে পারে।

এ দশার বর্ণনা করা যায় কিরূপে? গ্রহণের আগেই যেমন বেধ* লাগে তদ্রূপ দেহান্তের পরে যে মোক্ষদশা লাভ হইবে তাহার আভাস দেহপাতের পূর্বেই দেখা দেয়। দেহাবস্থায়ই ভাবী মোক্ষাবস্থার উপলব্ধি হইতে

* বেধ—গ্রহণের পূর্বেকার আট বা বার ঘণ্টা কাল।

থাকে। এই যে স্থিতি তার বর্ণনা করিতে বাণী থতমত খায়। যত ইচ্ছা হিংসা করিলেও সে কিছু করে না। তাহার ক্রিয়া এখন কোন মাপকাঠিতে মাপা যাইবে? যা কিছু সে করিবে সবই হইবে সাত্ত্বিক কর্ম। সকল ক্রিয়া ক্ষয় হইয়া গেলেও সারা বিশ্বের লোকসংগ্রহ সে করে। কি ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় তা নির্ণয় করা কঠিন।

এই অন্তিম অবস্থায় তিন ভাব হয়। এক ত বামদেবের দশা। "এ বিশ্বে যাহা কিছু রহিয়াছে, সে আমি" তাঁহার এই প্রসিদ্ধ উক্তির কথা ধরুন। জ্ঞানী পুরুষ নিরহঙ্কার হইয়া থাকে। তাহার দেহাভিমান থাকে না। ক্রিয়া শেষ হইয়া যায়। তখন সে এক ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঐ অবস্থার ঠাঁই এক দেহে হয় না। ভাবাবস্থা ক্রিয়াবস্থা নহে। ভাবাবস্থা মানে ভাবনার উৎকটতার অবস্থা। এই ভাবাবস্থার উপলব্ধি ক্ষুদ্রাকারে আমাদের সকলেরই হয়। পুত্রের দোষে মাতা দোষী, আর গুণে গুণী হইয়া থাকেন। পুত্রের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইয়া থাকেন। মার এই ভাবাবস্থা পুত্রেতেই সীমাবদ্ধ। সন্তানের দোষ তিনি নিজ দোষ বলিয়া মানিয়া লন। জ্ঞানী পুরুষও ভাবনার উৎকর্ষ হেতু সারা জগতের দোষ নিজের উপর লইয়া থাকে।

ত্রিভুবনের পাপে সে পাপী, আর পুণ্যে পুণ্যবান। আর তাহা সত্ত্বেও ত্রিভুবনের পাপ-পুণ্যের ছোঁয়াচমাত্রও তার লাগে না। রুদ্রসূক্তে ঋষি বলেন নাই কি ঃ

"যবাশ্চ মে তিলাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে।"

আমাকে যব দাও, তিল দাও, গম দাও। এইরূপ যে বলে সেই ঋষির পেট কত বড়? কিন্তু ঐ প্রার্থনাকারী সাড়ে তিন হাত দেহধারী ছিলেন না। তাঁহার আত্মা বিশ্বাকার হইয়া বলিতেছে। ইহাকে আমি "বৈদিক বিশ্বাত্ম-ভাব" বলি। বেদান্তে এই ভাবনার পরমোৎকর্ষ দেখা যায়। গুজরাটের সাধু নরসী মেহতা কীর্তন করিতে করিতে বলিয়াছেন ঃ

"বাপজী পাপ মে কবণ কীধা হশে,
নাম লেতাঁ তারুঁ নিদ্রা আবে।"

"ভগবান, কি পাপ করেছি যে, কীর্তন করিতে থাকিলেই আমার নিদ্রা আসে?" ঘুম কি নরসী মেহতার আসিত? ঘুম আসিত শ্রোতাদের। কিন্তু শ্রোতাদের

সহিত একরূপ হইয়া নরসী মেহতা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহা তাঁহার ভাবাবস্থা। জ্ঞানী পুরুষদের এইরূপই ভাবাবস্থা হয়। এই ভাবাবস্থায় সকল পাপ-পুণ্য তাহা দ্বারা হইতেছে এরূপ আপনাদের মনে হইবে। সে নিজেও তেমন মনে করিবে। ঐ ঋষি বলিয়াছেন না কি, "করার অযোগ্য কত কর্মই না আমি করেছি, করছি আর করব।" এই ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হইলে আত্মা পাখীর মত উড়িতে থাকে। পার্থিবতার ঊর্ধ্বে তাহা উঠিয়া যায়।

এই অবস্থার মত জ্ঞানী পুরুষের এক ক্রিয়াবস্থাও আছে। জ্ঞানী পুরুষ স্বভাবত কি করিবেন? যাহা কিছু তিনি করিবেন তাহা সাত্ত্বিক হইবে। যদিও দেহের সীমায় আজও তিনি আবদ্ধ তথাপি তাঁহার সমস্ত শরীর, সকল ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক হইয়া গিয়াছে, আর তাহার ফলে তাঁহার সকল ক্রিয়া সাত্ত্বিকই হইবে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখেন ত সাত্ত্বিকতার চরম সীমা তাঁহার ব্যবহারে দেখা যাইবে। বিশ্বাত্মভাব হইতে দেখেন ত মনে হইবে ত্রিভুবনের সকল পাপপুণ্য যেন তিনি করিতেছেন। আর তাহা হইলেও তিনি অলিপ্ত। কারণ প্রলেপের মত লেপ্‌টানো এ দেহ তিনি উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। ক্ষুদ্র দেহ নিক্ষেপ করিলে না তিনি বিশ্বরূপ হইবেন।

ভাবাবস্থা ও ক্রিয়াবস্থা ছাড়া জ্ঞানী পুরুষের তৃতীয় আর এক অবস্থা আছে। তাহা হইতেছে জ্ঞানাবস্থা। এ অবস্থায় তিনি না করেন পাপ সহ্য, না করেন পুণ্য সহ্য। ঝাপ্‌টা দিয়া সব কিছু ফেলিয়া দেন। এই ত্রিভুবনকে আগুন ধরাইয়া জ্বালাইয়া দিতে তিনি প্রস্তুত হইয়া যান। একটি কর্মের দায়িত্ব লইতেও তিনি প্রস্তুত নহেন। তাহার স্পর্শ পর্যন্ত তাঁহার কাছে অসহ্য। এই যে তিন অবস্থা তাহা জ্ঞানী পুরুষের মোক্ষদশায়, সাধনার পরাকাষ্ঠা-দশায়ই সম্ভব।

এই অক্রিয়াবস্থা, এই অন্তিম দশা, এ দেহে আয়ত্ত করার উপায়? আমরা যে কর্মই করি না কেন, তাহার কর্তৃত্ব নিজেতে আরোপ না করার অভ্যাস করা। মনে করিবে আমি নিমিত্ত মাত্র, কর্মের কর্তৃত্ব আমার নহে। এই অকর্তৃত্ব-বাদের ভূমিকা আগে নম্রভাবে গ্রহণ কর। কিন্তু তাহা হইলেই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লোপ পাইবে, তেমন নহে। আস্তে আস্তে এই ভাবনার বিকাশ হইতে থাকিবে। আমি অতি তুচ্ছ, তাঁহার হাতের পুতুল, তিনি যেমন নাচান তেমন

নাচি এ ভাব প্রথমে জন্মিতে দাও। তারপরে একথা মনে করার প্রযত্ন কর যে, যত কিছু কর্ম তাহা এই দেহের। তাহার সহিত আমার সম্পর্ক মাত্র নাই। এ সকল ক্রিয়া এ শবের। আমি শব নহি, আমি শিব। একথা মনে করিয়া দেহপ্রলেপের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত হইও না। তাহা হইলে, দেহের সহিত যেন কোন সম্পর্ক নাই—এই যে জ্ঞানী পুরুষের অবস্থা তাহা প্রাপ্ত হইবে। ঐ অবস্থায় পুনরায় উপরে বর্ণিত তিন অবস্থা হইবে। এক, তাহার ক্রিয়া-বস্থা, যাহাতে অত্যন্ত নির্মল ও আদর্শ ক্রিয়া তাহার দ্বারা হইবে। দুই—ভাবাবস্থা, যাহাতে ত্রিভুবনের সকল পাপ-পুণ্য আমি করি এরূপ অনুভব হইবে, অথচ তাহাতে তার ছোঁয়াচ পর্যন্ত লাগিবে না। তিন—তাহার জ্ঞানাবস্থা, যে অবস্থায় কর্মের লেশও তিনি নিজের কাছে রাখিবেন না। সকল কর্ম ভস্মসাৎ করিয়া দিবেন। এই তিন অবস্থার দ্বারা জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করা যাইতে পারে।

(১০৮)

এই সব বলার পরে ভগবান অর্জুনকে বলিলেন, "আমি তোমায় এই যে সব বললাম, তা তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছ ত? এবার আগাগোড়া বিচার করে যা তোমার ভাল মনে হয় কর।" ভগবান উদার চিত্তে অর্জুনকে স্বাধীনতা দিলেন। ভগবদ্‌গীতার বিশেষত্বই এই। কিন্তু ভগবানের আবার দয়া হইল। যে ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য দিয়াছিলেন তাহা তিনি ফিরাইয়া লইলেন। বলিলেন, "অর্জুন, তোমার ইচ্ছা, তোমার সাধনা সব কিছু ফেলে দাও, আমার শরণ লও।" নিজের শরণ লইতে বলিয়া যে ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য তিনি দিয়াছিলেন তাহা স্বয়ং কাড়িয়া লইলেন। এর অর্থ এই যে, "নিজ মনে তুমি স্বতন্ত্র ইচ্ছা আসতে দিও না। আপন ইচ্ছা নয়, তাঁর ইচ্ছা চলুক, এ ভাব অবলম্বন কর।" স্বাতন্ত্র্যে আমার দরকার নাই, এরূপ আমায় ভাবিতে দাও। আমি নাই, সব কিছু তুমি, এরূপ হোক। ঐ বকরী জীবিত দশায়—"মেঁ মেঁ মেঁ..." করে, অর্থাৎ "আমি আমি আমি" বলে। কিন্তু দাদু বলেন, মরার পরে উহার তাঁত যখন পিঞ্জনে পরানো হয় তখন সে বলে, "তুহী তুহী তুহী—তূহী তূহী তূহী।" তখন ত সব "তুহী...তুহী...তুহী।"

রবিবার, ১৯-৬-৩২

পরিশিষ্ট

(১)

গীতা-প্রবচনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আঠার পৃষ্ঠায় রজোগুণ ও তমোগুণের তুলনা করা হইয়াছে। তাহা পড়িয়া কোন ব্যক্তির সংশয় জন্মে। বিনোবাজীকে তাহা তিনি জানান। বিনোবাজী পত্রে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রশ্ন ও তার উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ঃ

প্রশ্ন ঃ গীতা-প্রবচনে (মারাঠী দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২০) কর্মকারীদের দ্বিবিধ বৃত্তির আলোচনাপ্রসঙ্গে রজোগুণ ও তমোগুণকে আপনি এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। 'নেব ত ফলসমেত নেব' ইহা রজোগুণের বৃত্তি আর 'ছাড়ব ত কর্মসমেত ছাড়ব' ইহা তমোগুণের বৃত্তি একথা আপনি বলিয়াছেন। দুই বৃত্তিতে ব্যবধান নাই, একথাও আপনি বলেন। আমি মনে করি রজোগুণেই এই দুই বৃত্তির সমাবেশ করা যায়। ১. ৩. ৯-এ যে ব্যবধান তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণে সে ব্যবধান। রজোগুণ ও তমোগুণ একই বৃত্তির পজিটিভ্ ও নিগেটিভ্ স্বরূপ নহে। কর্ম করিয়া ফল ত্যাগ করা সত্ত্বগুণ। 'নিই ত ফলসমেত নেব' আর 'ছাড়ি ত কর্মসমেত ছাড়ব'—এই দুইয়েরই রজোগুণের ছকে পড়া চাই। 'কেবল ফল নেব, কর্ম করব না' এই বৃত্তি তমোগুণের ছকে যাইবে। ইহা বাদে আর এক বৃত্তি হইতে পারে। তাহাকে ঔদাসীন্য বা ইন্ডিফারেন্সের বৃত্তি বলা যাইতে পারে। কাজ করিলাম ত করিলাম, বা হইল ত হইল। ফলের প্রত্যাশা, চিন্তা, আবশ্যকতা, মোহ আদি হয় না। উল্টা, ফল মিলিল ত নিলাম, কর্মের আবশ্যকতা বোধ, দায়িত্বের জ্ঞান নাই। এই বৃত্তি মনের অবস্থা অনুসারে ক্বচিৎ কখনও তিন গুণেই মিলিতে পারে। জ্ঞানশূন্য স্থিতিতে এই বৃত্তি তমোগুণের অধম আর ধ্যানমগ্ন স্থিতিতে সাত্ত্বিক বৃত্তিরও ঊর্ধ্বে।

সমাধান ঃ তোমার চিন্তাধারা ভাল লাগিয়াছে। ত্রিগুণ সম্বন্ধে নানা দিক হইতে বিচার করা হইয়াছে, বিচার করা যাইতে পারে। তমোগুণ

হইতে অধম অথবা সত্ত্বগুণ হইতে উত্তম বৃত্তির কল্পনা করা যায় না। সারা জগত তিন গুণে বিভক্ত করিতে হইবে। তিন গুণ হইতে অলিপ্ত এক অবস্থা আছে। উহাকে গুণাতীত পুরুষের ভূমিকা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। উহাতে কোনরূপ বৃত্তি থাকে না, তাই উহাকে নিবৃত্তি বলা হয়। কিন্তু নিবৃত্তির অর্থ প্রবৃত্তি-বিরোধ নহে। প্রবৃত্তি-বিরোধও এক বৃত্তিই। উহাকে তমোগুণ বলিতে হইবে।

এই প্রাস্তাবিক কথার পরে মূল প্রশ্নে যাইতেছি। তত্ত্বের দৃষ্টিতে ত্রিগুণ প্রকৃতির ঘটক। প্রকৃতিতে তিনের আবশ্যকতা একই সমান। স্থিতি, গতি আর প্রকাশ—তিনে মিলিয়া জীবন। ইহা তাত্ত্বিক দৃষ্টি। উচ্চ নীচ ভেদ ইহাতে কিছু নাই।

ইহা ব্যতীত পৃথক নৈতিক দৃষ্টি রহিয়াছে। এই দৃষ্টিতে তম, রজ, সত্ত্ব ক্রমান্বয়ে একটি হইতে অপরটি শ্রেষ্ঠ গুণ। লোকে সাধারণত এই দৃষ্টিতেই বিচার করে।

সৃষ্টি-তত্ত্ব বিশ্লেষণকারী প্রাকৃতিক বা তাত্ত্বিক আর দ্বিতীয়ত নৈতিক, এই দুই হইতে পৃথক এক সাধনার দৃষ্টি রহিয়াছে। তদনুসারে রজ ও তম একে অন্যের প্রতিক্রিয়ারূপ অথবা পরীক্ষণরূপ অথবা পরিপূরক। দুইয়ে মিলিয়া একই বস্তু। রজোগুণের অবসাদ হইতে তমোগুণ আসে আর তমোগুণের অবসাদ হইতে রজোগুণ। এই দুই হইতে সত্ত্বগুণ পৃথক। আর উহাই সাধকদের সখা। রজোগুণ ও তমোগুণ একত্রে আসুরী সম্পত্তি। সত্ত্বগুণ দৈবী সম্পত্তি। এরূপ সংঘর্ষ চলিতেছে।

গীতায় প্রাকৃতিক, নৈতিক ও সাধনিক তিন প্রকারের বিবেচনা রহিয়াছে। প্রাকৃতিক বিচারে না গিয়া আমি প্রধানত নৈতিক ও সাধনিক দৃষ্টি হইতে বিচার করিয়া থাকি। কখনও নৈতিক, কখনও সাধনিক। যে বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহাতে সাধনিক দৃষ্টি রহিয়াছে। তাই রজোগুণ ও তমোগুণের কল্পনা একত্রে করা হইয়াছে।

ফলত্যাগের বিচারের সমধিক বিচার-বিশ্লেষণ 'স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শনে' ও 'গীতাই-কোষে' করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

(২)

একটি প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গে পূজ্য বিনোবাজী 'গীতা-প্রবচন' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ঃ

'গীতা-প্রবচনে' সকল-জনোপযোগী পরমার্থের সহজ-সুগম বিচার রহিয়াছে। 'স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন' আরও পরের গ্রন্থ। উহাতে ঐ বিষয়ই এক বিশেষ দিক হইতে আলোচনা করা হইয়াছে। 'গীতাঈকোষ'* গীতার সূক্ষ্ম অধ্যয়নকারীদের জন্য লিখিত। গীতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই তিনখানিতে স্বল্পকথায় পুরাপুরি বলা হইয়াছে। পুস্তকগুলি ত লেখা হইয়াছে। আশা করি পরমার্থের জিজ্ঞাসুদের কাজে উহারা লাগিবে। আর কাহারও কাহারও সে লাভ হইয়াছেও। কিন্তু মুখ্যত নিজ প্রয়োজনেই উহা আমি লিখিয়াছি। সংসার-নাটক আমি দেখিতেছি। একস্থানে বসিয়াও দেখিয়াছি আর এখন পথ চলিতে চলিতেও দেখিতেছি। অগণিত জন-সমুদ্র ও তাহাদের নেতাগণ একই প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে, ইহা দেখিয়া মনে হয় কেবল ঈশ্বরের চিন্তা করাতেই সার, অন্য চিন্তা নিরর্থক।

ইহা সহজপ্রবাহে লেখা হইয়াছে। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া 'গীতা-প্রবচন' পরিপাক করা চাই। ইহার লেখন-শৈলী লৌকিক, শাস্ত্রীয় নহে। পুনরুক্তিও আছে। গায়ক যেমন অবান্তর চরণ গাহিতে গাহিতে নিজ প্রিয় ধুয়ায় ফিরিয়া আসে ইহাও তেমনি। ইহা মুদ্রিত হইবে একথা মনে ছিলই না। সানে গুরুজীসদৃশ লংহ্যাণ্ডে শর্টহ্যাণ্ড্ লিখিতে পটু সহৃদয় অনু-লেখক যদি না মিলিত তবে বক্তা ও শ্রোতাতেই ইহার পরিসমাপ্তি হয়ত ঘটিত। আর তদপেক্ষা অধিক আমি আশাও করি নাই। এই প্রবচন হইতে যমুনালালজী লাভবান হন। বস্, আমি মনে করি আশাতীত কাজ হইয়াছে। লক্ষ্য ছিল নিজ লাভ। আপন চিন্তা সুদৃঢ় করার জন্য জপ-ভাবনা হইতে আমি বলিয়া যাইতাম। তাহা হইতে এত বড় ফল মিলিয়াছে। ঈশ্বরেরই তাহা ইচ্ছা, ইহা ছাড়া আর কি বলা যাইবে।

মাণ্ডবী, হায়দরাবাদ,
সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

---

* বিনোবা-কৃত গ্রন্থ।

প্রকরণের সংখ্যানুযায়ী বিষয়ক্রম
